অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (১৯০৬-১৯৪৭)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

খাদিজা খাতুন

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং:-১৬৭/২০১০-২০১১

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাণা রাজ্জাক

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০১৬

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত "পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (১৯০৬–১৯৪৭)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও এম ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য অথবা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দাখিল করিনি এবং আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

খাদিজা খাতুন
এম ফিল গবেষক
রেজি নং– ১৬৭/২০১০-১১
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ
বক্‌শিবাজার, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খাদিজা খাতুন কর্তৃক উপস্থাপিত "পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (১৯০৬-১৯৪৭)" শীর্ষক এম ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করছি।

ড. রাণা রাজ্জাক
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
সার সংক্ষেপ	iii-vi
ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায় : সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণা পর্যালোচনা	৮-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : পশ্চিম বাংলা অঞ্চল ঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	১৪-৫৪
তৃতীয় অধ্যায় : বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল ঃ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	৫৫-৯৭
চতুর্থ অধ্যায় : চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	৯৮-১১৪
পঞ্চম অধ্যায় : বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল :	
ক) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১১৫-১৫৬
খ) আবুল মনসুর আহমদ	১৫৭-১৯৩
গ) হাতেম আলী খান	১৯৪-২২১
ষষ্ঠ অধ্যায়: বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল ঃ মৌলবী তমিজউদ্দিন খান	২২২-২৫৮
সপ্তম অধ্যায়: বৃহত্তর যশোর অঞ্চল ঃ শামসুদ্দিন আহমেদ	২৫৯-২৭৩
উপসংহার	২৭৪-২৮১
গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	২৮২-২৯২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যার অকুণ্ঠ ও সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. রাণা রাজ্জাক। তাঁর সবিশেষ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতার ফলে আমার এ গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জনে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ড. ইফতেখার-উল-আওয়াল, ড. সোনিয়া নিশাত আমীন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রমুখ শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দকে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রদান করেছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার প্রাক্তন কর্মস্থল সরকারি এম এম আলী কলেজ, কাগমারী, টাঙ্গাইল, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব তাহমিনা খানকে, তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং গবেষণা কর্মের ব্যাপারে সুপরামর্শ প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার বর্তমান কর্মস্থল বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, বক্‌শিবাজার, ঢাকা, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের প্রতি যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা কর্মের সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের সাক্ষাৎকার নিতে পারিনি কারণ অনেকে সময় দিতে চান না। তাই এপর্যায়ে হাতেম আলী খানের নাতি জাহিদ খান, নাতনী তাহমিনা খান এবং ভাতিজী জুলফিকার খান তাদের ব্যাস্ততা সত্ত্বেও হাতেম আলী খান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সৈয়দ ইরফানুল বারী যিনি মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর নিকট আত্মীয়দের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মওলানা ভাসানীর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে অংশগ্রহণকারী আলোচক বৃন্দকে যাদের

তথ্যভিত্তিক বক্তৃতা গবেষণা কর্মের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আবুল মনসুর আহমদের ১১৩তম জন্ম বার্ষিকীতে অংশগ্রহণকারী আলোচক বৃন্দের প্রতি যাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করতে পেরেছি।

আমার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরির মাইক্রোফ্লিম শাখা, জার্নাল শাখা, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরি, টাঙ্গাইল জেলা লাইব্রেরি, ময়মনসিংহ জেলা কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, সরকারি এম এম আলী কলেজ গ্রন্থাগার, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ গ্রন্থাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগার সমূহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। জাতীয় আরকাইভস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা বিভিন্ন সময় আমাকে সংরক্ষিত রেকর্ড ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

আমি চিরকৃতজ্ঞতা পোষণ করছি আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোনদের প্রতি। বিশেষ করে আমার ভাই মোঃ কুদ্দুস সালামের প্রতি, যিনি গবেষণা কর্মের সূচনালগ্ন থেকেই আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার জীবন সহযাত্রী মোঃ নাহিদ হাসানকে যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতার মাধ্যমেই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি।

সর্বোপরি আমার এই এম ফিল গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সংশি- ষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা খাদিজা খাতুন

তারিখঃ জুন ২০১৬

সার সংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা তুলে ধরার একটি বিনীত প্রয়াস। এ গবেষণা কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আলোচ্য সময়ে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে শীর্ষ স্থানীয় আঞ্চলিক রাজনীতিবিদদের ভূমিকা পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে পূর্ববাংলার রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ১৯০৬ সালকে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সূচনা কাল হিসেবে ধরা হয়েছে। কেননা অভিসন্দর্ভের প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতা জীবনের কোন এক পর্যায়ে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে পূর্ববাংলার অসংখ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে শীর্ষ স্থানীয় নেতা নির্বাচনে কৃষক-প্রজা আন্দোলনকে মূল প্লাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রান্তিক সীমা হিসেবে ১৯৪৭ সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ ১৯৪৭ সাল পূর্ববাংলার রাজনীতির যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে ধরা যায়। তাছাড়া মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল ছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম তথা ভারত বিভাগ। এ গবেষণা কর্মটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

অভিসন্দর্ভটির ভূমিকায় উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে পূর্ব বাংলার রাজনীতির সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রদত্ত সময়কালে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতাও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত গবেষণা পর্যালোচনা দেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনায় আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন করে কী কী বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি তার একটি পর্যালোচনা দেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে আমার গবেষণা কর্মে নতুন কী বিষয় সংযোজন হয়েছে তারও একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তৎকালীন পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) সামগ্রীক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন পূর্ব বাংলার রাজনীতিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মওলানা আকরম খাঁ পূর্ব বাংলায়

সংঘটিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), প্রজা আন্দোলন (১৯১৪-১৯৩৬), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে (১৯৪০-১৯৪৭) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সুপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি পূর্ব বাংলার রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষক প্রজা নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) কে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মূল্যায়নের সাথে সাথে তাঁকে কেন্দ্রিয় নেতা হিসেবেও মূল্যায়ন করা করা হয়েছে। তিনি কিভাবে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে অধিকার সচেতন করে তুলেছিলেন এবং দরিদ্র কৃষক সমাজকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। মূলত কৃষক প্রজা রাজনীতির একজন সুযোগ্য নেতা হিসেবে ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রগতিশীল নেতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর (১৮৭৫-১৯৫০) রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি,জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসন্ধান করে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে খুব বেশি বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব না হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরবর্তী প্রজা আন্দোলন, খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, মুসলিম লীগে যোগদান, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), আবুল মনসুর আহমদ(১৮৯৮-১৯৭৯) ও হাতেম আলী খানের (১৯০৩-১৯৭৭) রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য উপাত্তভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মওলানা ভাসানীর তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। কৃষকদেরকে জোতদার, মহাজনদের শোষণ ও নির্যাতন থেকে কিভাবে রক্ষা করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আসামে কৃষক-প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মওলানা ভাসানীর জ্ঞানদীপ্ত কার্যক্রমও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কৃষক নেতা হিসেবে খ্যাত আবুল মনসুর আহমদের শৈশবকাল থেকে শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক

সংশ্লিষ্টতা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্র তাঁর নিজ এলাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের রাজনৈতিক চিত্র আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আবার আবুল মনসুর আহমদ একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা থেকে কিভাবে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছেন তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানীর আঞ্চলিক রাজনীতি বর্নণায় তাঁর রাজনৈতিক সহচর খ্যাত হাতেম আলী খানের সামগ্রিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের রাজনীতি আলোচনায় মৌলবী তমিজউদ্দিন খানকে (১৮৮৯-১৯৬৩) একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রিয় নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি রাজনৈতিক মতাদর্শও আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে, বামপন্থী কৃষক নেতা শামসুদ্দিন আহমেদের (১৮৮৯-১৯৬৯) রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের কুষ্টিয়া জেলার চরমপন্থী রাজনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখসহ তাঁর জীবনে এর প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহারে অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময় কালানুযায়ী শীর্ষ স্থানীয় অন্যান্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অবস্থান সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত অধ্যায়গুলিতে তৎকালীন বাংলার অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বতন্ত্র ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯০৫ সালে সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আলোচ্য নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে উল্লিখিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা বোধে হিন্দুদের সাথে সম্পৃক্ত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে এ যৌথ আন্দোলনকে এক জাতীয় রূপদান এবং এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তির ফলে হিন্দু-মুসলমান সর্ম্পকের যে অবনতি ঘটে তার প্রতিবিধানার্থে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় এবং সহায়তা দানের মাধ্যমে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) সম্পাদন এবং এ প্যাক্টকে সর্বজনগ্রাহ্য

ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের পৃথম পৃথক পদক্ষেপ আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্ধারিত সময়কালে প্রজা আন্দোলন (১৯১৪-১৯৩৬) পূর্ব বাংলার রাজনীতির পরিধিতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। তাই প্রজা আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে বিকশিত পর্যায় পর্যন্ত সময়কালে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা ও কার্যক্রম অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা, কার্যক্রম এবং মত পার্থক্যের বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত মতামত আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আবার একই সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের বিরোধী কার্যক্রমও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পলাশী যুদ্ধ (১৭৫৭), বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ক্ষমতা লাভের পর কোম্পানি সরকার শাসন ব্যবস্থা পূণর্গঠনে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার প্রভাবে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান সম্প্রদায় কোন ভাবেই এ শাসন মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সকল দিক দিয়ে তারা এগিয়ে যায়। অবশ্য অনেক দেরিতে হলেও মুসলমানরা নিজেদের পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান করে তাদের অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা তথা সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে ব্যর্থ হওয়ায় এ সময় মুসলমান সম্প্রদায় স্বীয় সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া পূরণ তথা সরকারের সহযোগিতা লাভের প্রয়াসে ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠন করে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতা কংগ্রেসীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করলে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান করলেও বাকী অংশ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। স্বদেশী ও চরমপন্থী আন্দোলনের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজ শাসকরা ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গভঙ্গ রদ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা একত্রিত করে বাংলা নামে নতুন একটি প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলে এর প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলার আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের

মধ্যে পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা তৈরি হলেও ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুর করে।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক তুরস্ককে খ-বিখ করা, ১৯১৯ সালে বিনা বিচারে আটক রাখা সংক্রান্ত কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' জারি করা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের (১৯১৯) হত্যাকা প্রভৃতি ঘটনা এসময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এসময় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ তুরস্কের অখতা, খেলাফত রক্ষা ও ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলো খলিফার হাতে ন্যস্ত করার দাবীতে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে যা ইতিহাসে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে আগমন করেন এবং বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশে-ষণ করে খেলাফত আন্দোলনে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। একই সাথে ব্রিটিশ বিরোধী 'বয়কট কর্মসূচী' তথা অসহযোগের ডাক দেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলনটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। বিশেষ করে গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতিতে হিন্দু-মুসলিম একত্র হয়ে সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিলিত হয়। তবে ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা হত্যাকাের প্রেক্ষাপটে গান্ধী সহিংস রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন, অন্যদিকে তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক ১৯২৪ সালে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করলে উপমহাদেশের উলে- খযোগ্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়।

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে আবার ফাটল ধরে। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষাপটে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরর নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেন।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দুর করার জন্য এই দূরদর্শী বাস্তববাদী নেতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা বাংলা চুক্তির (১৯২৩) সম্পাদন করেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হওয়া, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর (১৯২৫) 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি, লীগ ও কংগ্রেস উভয়ের 'সাইমন কমিশন' বর্জন, মুসলিম লীগের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, কংগ্রেসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নেহের‍ু রিপোর্ট প্রণয়ন ও মুসলমানদের প্রত্যাখান; নেহের‍ু রিপোর্টের বিপরীতে জিন্নাহর চৌদ্দদফা পেশ; মুসলিম লীগের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি ও নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং একই সাথে বাংলার রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া উলে- খযোগ্য ঘটনা।

বাংলার রাজনীতির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি পর্যায় হল কৃষক-প্রজা আন্দোলন। অভিসন্দর্ভের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কৃষক প্রজা আন্দোলনে আঞ্চলিক পর্যায়ে যাদের ভূমিকা অতি ক্ষুদ্র পরিসর থেকে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে আবর্তিত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে উলে- খযোগ্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ফলে কৃষক আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। এরপর ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছরে এই দলের নতুন নামকরণ করা হয় 'কৃষক প্রজা পার্টি'। এ পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস থেকে পৃথক এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কোন দল এককভাবে সরকার গঠন করার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্মিলিত মন্ত্রীসভা পরিপূর্ণভাবে নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ফলে কৃষক প্রজা

পার্টি তার স্বীয় নীতিতে সফল হতেও পারেনি। পরবর্তীতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মত বিরোধের কারণে ১৯৪১ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকায় ঐ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ সালে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎসম্পৃক্ত রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগের পর ১৯৪৩ সালের ১৩ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠন করেন কিন্তু ১৯৪৫ সালেই তাঁর মন্ত্রীসভার পতন হয়। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার সময়কাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন যখন ভারত বিভক্তি সংক্রান্ত আন্দোলন ও ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ায় লিপ্ত।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ১৯০৬ সালে আগা খানের নেতৃত্বে 'সিমলা ডেপুটেশনে' (১৯২৭) মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী, ১৯০৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে দুটি পৃথক সত্তায় পরিণত হয়। লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) অনুসারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল (বাংলা ও আসাম) দিয়ে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে মুসলিম লীগ এ অবস্থান থেকে সরে এসে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দুটি পৃথক সম্প্রদায় ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের যুক্তি তুলে ধরেন যা 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' বা Two Nation Theory নামে পরিচিত। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একক ভারতের পক্ষে মত প্রদান করে। ফলে মহাত্মা গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে মত দ্বৈততার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, এখানে গান্ধী মোটামুটি পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিলেও 'দ্বি-জাতি তত্ত' মেনে না নেওয়ায় এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইংল্যান্ডের

সাধারণ নির্বাচনে (২৬ জুলাই ১৯৪৫) শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে এবং তারা তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়। এ সময় লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশ ভাগের বিষয়ে কংগ্রেসকে নমনীয় করে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত ভারত বিভাগের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন ভারত বিভক্তের পরিকল্পনায় ব্যস্ত তখন ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে মুসলিম লীগ সেক্রেটারি আবুল হাশিম ও ফরোয়ার্ড ব-কের শরৎচন্দ্র বসু বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন। তাদের পরিকল্পনার মূল বিষয় ছিল বাংলা পাকিস্তান বা ভারত ইউনিয়নে যোগ না দিয়ে ‘অখণ্ড ও স্বাধীন’ থাকবে। মূলত ১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে যুক্ত বাংলার পক্ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের এই আন্দোলনে প্রথমে কেন্দ্রিয় লীগও সমর্থন দেয়। সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ৩০ এপ্রিল দিলি-তে এক বক্তৃতায় স্বাধীন অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব দেন যা শরৎ বসু সমর্থন করেন। তারা উভয়ে এই লক্ষ্যে ২০মে বৈঠক শেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা ‘সোহ্‌রাওয়ার্দী-বসু’ চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু কংগ্রেস এ পরিকল্পনা ও চুক্তি প্রত্যাখান করে। কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্য এর বিরোধিতা করে। তাছাড়া বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ এ পরিকল্পনাকে পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখান করেন। অন্যান্য প্রাদেশিক মধ্যে নেতৃবৃন্দের বেশির ভাগ বাংলা বিভক্তির প্রশ্নে মত দ্বৈততা দেখা যায় তবে অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষেও অনেক আঞ্চলিক নেতা তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। মওলানা ভাসানী অবিভক্ত বাংলার পক্ষে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনায় সমর্থন প্রদান করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গকে আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সমতুল্য মনে করতেন। আঞ্চলিক নেতা আবুল মনসুর আহমদও অখণ্ড বাংলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া কৃষক-প্রজা পার্টিও বঙ্গ বিভক্তির বিরোধী ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সাথে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অভাবে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া যখন এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখন ভারত

বিভাগের পরিকল্পনাও চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। কারণ ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত বিভাগের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় এবং ৪ঠা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় গণপরিষদ ও পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। অবশেষে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' তথা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময় কালের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলা অঞ্চলের রাজনীতির ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক আটজন শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করা হয়েছে। বিভাগপূর্ব পশ্চিমবাংলা অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ কে (১৮৬৮-১৯৬৮) গবেষণা অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ কর্মকা পরিচালিত হয়েছে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিম লে। কৃষক প্রজা নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের কৃষক প্রজা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করায় এ অঞ্চল থেকে তাঁকে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে সমগ্র বাংলা অঞ্চলের কৃষক প্রজা ছিল ফজলুল হকের রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। ফজলুল হক আঞ্চলিক রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করে শীর্ষ স্থানীয় কেন্দ্রিয় নেতায় পরিণত হয়।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলার রাজনীতিতে প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে (১৮৭৫-১৯৫০) গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত হয়েছে সমগ্র বাংলা অঞ্চলের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ও হাতেম আলী খানকে (১৯০৪-১৯৭৭) গবেষণা অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করেছেন টাঙ্গাইল, আসামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তবে মওলানা ভাসানী বাংলার সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের

তৃণমূল রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কৃষক নেতা আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিবাহিত করেন ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। তবে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। বৃহত্তর ময়মনসিংহের উল্লেখযোগ্য একজন আঞ্চলিক নেতা ছিলেন হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭)। তিনি তাঁর নিজ এলাকায় জমিদার,মহাজনদের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে কৃষক সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তাছাড়া হাতেম আলী খান মওলানা ভাসানীর বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে ন্যাপের ভাঙ্গন পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেন।

বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের ফরিদপুর জেলার আঞ্চলিক নেতা তমিজউদ্দিন খান(১৮৮৯-১৯৬৩)। তিনি রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তাঁর নিজ এলাকায় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনসহ খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে যোগদান এবং পরবর্তীতে তিনি কেন্দ্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনের পর্যায়ে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের নেতা শামসুদ্দিন আহমেদকে (১৮৮৯-১৯৬৯) গবেষণা অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া কুষ্টিয়া অঞ্চলের মানুষকে তিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপরে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রদত্ত সময়কালে অসংখ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন যারা পূর্ববাংলার রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। অভিসন্দর্ভের গঠনগত সীমাবদ্ধতায় তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও উপসংহার অংশে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকজন নেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যেকে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সগৌরবে সমুজ্জ্বল।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণা পর্যালোচনা

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, "বাংলার মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজসেবা- একটি তুলনামূলক বিশে-ষণ"(২০০৭)। এখানে মওলানা আকরম খাঁ এবং মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীর সমাজসেবা, সাংবাদিকতার উপর বেশি গুর‍ুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের আঞ্চলিক পর্যায়ের ভূমিকাগুলো তেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাদের জীবনালোচনার পর্যায়ে রাজনীতিতে ভূমিকা কী ছিল তা উলে-খ থাকলেও পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতা হিসাবে তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন তেমনভাবে উলে-খ হয়নি।

"বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)",(২০০০) শীর্ষক গবেষণা কর্মে ইমতিয়াজ আহমেদ (১৯০৫–১৯২৫) সাল মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার রাজনীতিতে যারা উদারপন্থী ছিলেন তাদের মধ্যে উলে-খযোগ্য নেতৃবৃন্দের জীবনের উপর সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আমার গবেষণা কর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজনের জীবনের সংক্ষিপ্ত উলে-খ এখানে পাওয়া যায়। এখানে পূর্ব বাংলার রাজনীতির সময়কালের একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের (১৯০৫–১৯২৫) ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার গবেষণা কর্মে আমি পূর্ব বাংলার রাজনীতির সবচেয়ে গুর‍ুত্বপূর্ণ সময়কালে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা প্রতিটি পর্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা এবং বিশে-ষণ করার চেষ্টা করেছি।

মুহম্মদ হায়দার আলী আকন, "মওলানা ইসলামাবাদীর জীবন ও কর্ম "(২০০৯) শীর্ষক গবেষণা কর্মে তিনি গবেষণা প্রস্তাবনায় শুধুমাত্র মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্বতন্ত্র ভূমিকা মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু আমার গবেষণায় পূর্ব বাংলায় শীর্ষস্থানীয় আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ গুর‍ুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

"এ. বি. এম মুস্তাফিজুর রহমান, রবুবিয়াত দর্শনঃ একটি সমীক্ষা",(২০১১) এখানে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রবুবিয়াত দর্শন খুবই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে তবে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ভূমিকা তেমনভাবে উলে-খ করা হয়নি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে পূর্ব বাংলার একজন সফল আঞ্চলিক রাজনীতিবিদ হিসেবে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

Rana Razzaque, "Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947). " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভটি ১৯৯৭ সালে সম্পাদন করা হয়। গবেষণা কর্মটিতে গবেষক Various Trends of Social and Political Thought বিষয়টিকে, Conservative Orthodox, Moderate Liberal এবং Radical-Humanist এই তিনটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। গবেষক তাঁর এই পি এইচ. ডি গবেষণা কর্মে বাংলার উলে- খযোগ্য নেতৃবৃন্দকে তাঁর বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করেছেন, এখানে আলোচ্য ব্যক্তিদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা কর্মটি ১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল নির্ধারিত। তবে আমি আমার গবেষণা কর্মে ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে মোটামুটি ঘটে যাওয়া সকল উলে- খযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণা কর্মে সামাজিক মতাদর্শের চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে আমি আমার গবেষণা কর্মে পূর্ব বাংলার রাজনীতির একটি সুদীর্ঘ পরিক্রমায় (১৯০৬–১৯৪৭) আলোচ্য নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ইয়াসমিন আহমেদ, "কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩–৫৮); একটি রাজনৈতিক বিশে- ষণ।" (২০১১), গবেষক (১৯৫৩–৫৮) সালের রাজনীতির বিশে- ষণের প্রেক্ষাপট আলোচনায় বাংলাদেশের কৃষক-প্রজা রাজনীতির উলে- খ করেছেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির কর্ণধর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনীতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আলোচনা বা মূল্যায়ন করার অবকাশ পান নি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে কৃষক-প্রজা পার্টির উৎপত্তি এবং বিকাশ পর্যায়ে বেশির ভাগ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি।

মোঃ চেঙ্গীশ খান, "আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য, সমাজ জীবন ও রাজনীতি।"(২০১৩), আবুল মনসুর আহমদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা কর্ম এটি, তবে এখানে তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে বেশী মূল্যায়ন করা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের বিস্তৃত রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা গবেষক উলে- খ করেছেন। তবে একজন আঞ্চলিক নেতা কিভাবে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রিয় নেতায় পরিণত হলেন তার ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়াসে আমি আমার গবেষণা কর্মে তাঁকে অন্তর্ভূক্ত করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরিতে

সংরক্ষিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ "বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ভূমিকা: ১৯০৫-১৯৪৭",(১৯৯২) এ টি এম আতিকুর রহমান তাঁর অভিসন্দর্ভে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কর্মময় জীবন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তবে আমার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা কতটা প্রসারিত তা উৎঘাটন করা।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ বর্তমান গবেষণায় অকাট্য দলিলরূপে কাজ করেছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পাদিত গবেষণা কর্ম বিশে- ষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা উপস্থাপনই আমার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ বিশে- ষনের পাশাপাশি বিভিন্ন লেখকের রচিত গ্রন্থ এক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবীদার। যেমন, এ টি এম আতিকুর রহমান রচিত *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ(১৯৯৫)* গ্রন্থটি মওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে রচিত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির ছয়টি অধ্যায়ে মওলানা আকরম খাঁর প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্যন্ত সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া মুহম্মদ জাহাঙ্গীর রচিত বাংলা একাডেমির *জীবনীগ্রন্থমালায়(১৯৮৭)* তাঁর জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষকনেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যায় তবে সিরাজ উদ্দীন আহমেদ ফজলুল হকের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভাস্কর প্রকাশনী থেকে ১৯৯৩ সালে *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক* শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। চব্বিশটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত এই গ্রন্থে লেখক ফজলুল হকের প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, রাজনৈতিক জীবনের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, যা গবেষণা কর্মের পরোক্ষ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ খুব বেশি পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত *মওলানা ইসলামাবাদী* (১৯৮০) গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাছাড়া বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থে ইসলামাবাদী সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা পাওয়া যায়। তবে ড. মুহম্মদ আবদুল-াহ প্রণীত *পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বংগীয় উলামাদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*,(১৯৯৫) শীর্ষক গ্রন্থটিতে তাঁর জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লেখক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে আমজাদ হোসেনের *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি* (২০১৩) গ্রন্থটি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। গ্রন্থটিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সকল দিক বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রণীত *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী* (১৯৯৪),মহসিন শস্ত্রপানি সম্পাদিত স্মারক সংকলন, *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী* (২০১৪),বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী রচিত *মাও সে তুঙ এর দেশে (১৯৭২)* গ্রন্থটি তাঁর জীবন সম্পর্কিত অমর গ্রন্থ।

আবুল মনসুর আহমদ রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (২০০২) এবং *আত্মকথা* নামক দুটি গ্রন্থ সরাসরি উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থটিতে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর জীবনের এমন কোন ঘটনা নেই যা বর্ণনা করেননি। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি ধারাবাহিকভাবে সেখানে তুলে ধরেছেন। আবুল মনসুর আহমদের আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতির সকল বিষয় এখানে পাওয়া যায়। বলা যায় তাঁর জীবনের সামগ্রিক বর্ণনায় গ্রন্থটির কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ* (২০১৫), গ্রন্থটি একটি স্মারক সংকলন। এখানে তাঁর নিকট আত্মীয়সহ কাছের মানুষ ও সমাজের মুক্তমনা ব্যক্তি আবুল মনসুর আহমদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত দিয়েছেন যা তাঁর সম্পর্কে অমূল্য তথ্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। মওলানা ভাসানীর অনুচর খ্যাত হাতেম আলী খান সম্পর্কে বিভুরঞ্জন সম্পাদিত *কৃষক নেতা হাতেম আলী খান* (২০১৩) স্মারক গ্রন্থটি তাঁর সম্পর্কে জানার অমূল্য দলিল।

মওলানা তমিজউদ্দিন খানও তাঁর জীবনের সার্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে *The Test of Time: My Life and Days* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি গ্রন্থটি সমাপ্ত করতে পারেননি। কিন্তু অনুবাদক রাজিয়া খান (*কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি*) (১৯৯৩) গ্রন্থটি সমপন্ন করেছেন। গবেষণা কর্মে তমিজউদ্দিন খানের রচিত গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান কারণ তাঁর জীবনের ছোট বড় অনেক ঘটনা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শামসুদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। Humaira Momen কর্তৃক প্রণীত *A Study of Krishak Praja Party and the Election of*

1937, (১৯৭২) গ্রন্থটিতে শামসুদ্দিন আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া ড. মুহম্মদ আবদুল-াহ প্রণীত *পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বংগীয় উলামাদের ভূমিকা (১৯০৫–১৯৪৭)*,(১৯৯৫) শীর্ষক গ্রন্থটিতে শামসুদ্দিন আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। সর্বোপরি উলি-খিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগের জীবন সম্পর্কে বাংলা একাডেমি প্রণীত জীবনীগ্রন্থমালা সিরিজে (১৯৮৭) খুবই গুর"ত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যা গবেষণার ক্ষেত্রে অমূল্য উপাদান হিসেবে কাজ করে।

"পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (১৯০৬–১৯৪৭)" এম ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে উলে-খযোগ্য এবং শীর্ষ স্থানীয় আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আমার গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরিতে বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কর্ম বিশে-ষণ করে জানতে পারি যে, আমার গবেষণা কর্মে উলি-খিত নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যে কয়টি গবেষণা হয়েছে তার সময়কাল বিবেচনা করে আমি আমার গবেষণা কর্মে গুর"ত্ব দিয়েছি কারণ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকে বঙ্গভঙ্গ(১৯০৫), মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬) এবং বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেকে রাজনৈতিক জীবনের বিকশিত পর্যায়ে পৌঁছায়। গবেষণা পর্যালোচনায় যে কয়টি গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করেছি তার প্রত্যেকটি সময়ের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তাছাড়া এক এক জন গবেষক আলোচ্য নেতৃবৃন্দের জীবনের এক একটি বিষয়ের উপর গুর"ত্ব দিয়েছেন। আবার যে সকল গবেষণা কর্ম পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে সেখানে আলোচ্য নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে উলে-খ পাওয়া যায় এবং প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিকোণ পৃথক।

আমি আমার গবেষণা কর্মে কোন নেতৃবৃন্দের একক মতাদর্শ বা রাজনীতির উপর আলোকপাত না করে ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঘটে যাওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোকে তাদের অবদান স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক জীবনের মোটামুটি সকল আঞ্চলিক ঘটনাবলীর পাশাপাশি বাংলার সার্বিক রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের বৈচিত্রময় জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা অকপটে উলে-খ করা হয়েছে। এছাড়া আমার গবেষণা কর্মে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা যেমন তমিজউদ্দিন খান, হাতেম আলী খান, প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপর লিখিত কোন গবেষণা কর্ম আমার চোখে পড়ে নাই। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আমি আমার গবেষণা কর্মেল স্বতন্ত্রতা প্রদানে বাংলার আঞ্চলিক রাজনীতির প্রাণ বলে খ্যাত কৃষক-প্রজা রাজনীতির শিকড় অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমি প্রতিটি নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করেছি কৃষক-প্রজা

আন্দোলনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। উলি- খিত প্রত্যেক রাজনৈতিক কৃষক-প্রজা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পূর্বে সম্পাদিত আমার গবেষণা ও আনুসঙ্গিক গবেষণা কর্মের সাথে মৌলিক পার্থক্য হল আমার নির্বাচিত আটজন শীর্ষ স্থানীয় আঞ্চলিক এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের প্রত্যেককে কৃষকনেতা হিসেবে তাদের সম্পৃক্ততা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া উলি- খিত নেতৃবৃন্দকে একত্রে একই গবেষণা কর্মে অন্তর্ভূক্ত করে আমার পূর্বে আর কেউ গবেষণা করেনি, এখানেই আমার অভিসন্দর্ভের গুর"ত্বপূর্ণ পার্থক্য।

মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৮)

পাকিস্ড়ন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাজমান নিজ সমাজসহ হিন্দু সমাজ এবং ইংরেজ শক্তির বির"দ্ধে সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫–১৯১১),[১] প্রজা আন্দোলন (১৯১৪–১৯৩৬)[২], খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন [৩] (১৯২০–১৯২২) এবং মুসলমাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্ড়ন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে (১৯৪০–১৯৪৭)[৪] সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। [৫] বাংলার মুসলিম জনগণের অন্যতম দিশারী মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ। একজন সফল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে সংশি- ষ্ট থেকেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। তাঁকে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার পথিকৃৎ এবং জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর সাংবাদিকতা ছিল আসলে তাঁর রাজনৈতিক সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। মূলত মুসলিম জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মৃতপ্রায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মওলানা আকরম খাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়।[৬] বাংলার রাজনীতির অন্যতম এই নেতা ১৮৬৮ সালের ৭ই জুন বর্তমান পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] মওলানা আকরম খাঁর পিতার নাম মওলানা আবদুল বারী খাঁ এবং মাতার নাম রাবেয়া খাতুন।[৮] মওলানা আকরম খাঁর পূর্ব পুর"ষরা যশোর থেকে বিশ মাইলের মত পূর্ব দক্ষিণে যশোর-খুলনা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম পয়গ্রাম কসবাতে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে তারা চব্বিশ পরগণা জেলায় স্থানান্তরিত হন। [৯] হাকিমপুর গ্রামেই মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তিনি গ্রামের মক্তবে শিক্ষা জীবন শুর" করেন। পিতা মাতার সাহচর্যে তিনি জামাতে পাঞ্জাব (পঞ্চম শ্রেণী) পর্যন্ত আরবি ফার্সিসহ অন্যান্য প্রাথমিক পুস্তক

গুলোর পাঠ শেষ করেন।[১০] আকরম খাঁর এগারো বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পিতা-মাতা দুজনেই একই দিনে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর তিনি এবং তাঁর ভাই নিজ গ্রামে মাতামহের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। মাতামহ তাঁকে এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এ বিদ্যালয় থেকেই আকরম খাঁ কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১১] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর তিনি বর্ধমানের কুলশুনা মাদ্রাসায় (ধর্মীয় স্কুল) পড়াশোনা করেন। তারপর তাঁকে কলকাতার জুবিলী ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়।[১২] ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং ইংরেজি শিক্ষা অপছন্দ হেতু আকরম খাঁ ইংরেজি স্কুল ছেড়ে কলকাতা মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন ১৮৯৬ খ্রি: এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা করেন । মওলানা আকরম খাঁ আরবি সাহিত্যেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাছাড়া খেলাধুলা ও ক্লাব সংগঠনেও তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। তিনি কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।[১৩] কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি মাদ্রাসা সিলেবাসের প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করার দাবীতে ছাত্রদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হন এবং আন্দোলন শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নিম্ন শ্রেণিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রাবস্থায় মওলানা আকরম খাঁ সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হন।[১৪] *আহলে হাদিস* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতে খড়ি।[১৫] পরবর্তী জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সাত বছর অন্যের মালিকানায় ও নিজের সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ১৯১০ সালে তিনি সম্পূর্ণ নিজ কর্তৃত্বাধীনে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৬] এরপর থেকে সাংবাদিকতায় তিনি ক্রমাগত সাফল্য লাভ করেন। *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* ছাড়াও তাঁর মালিকানায় এবং সম্পাদনায় একে একে প্রকাশিত হয় *দৈনিক জামান* (১৯২০), *সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক* (১৯২১), *দৈনিক মোহাম্মদী* (১৯২২), *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯২৭), *দৈনিক আজাদ* (১৯৩৬) *সাপ্তাহিক কমরেড* (১৯৪৬) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা।[১৭] ১৯১৫ সালে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার'[১৮] মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত *আল এসলাম*[১৯] নামক মাসিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন[২০]। এ সকল পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে মওলানা

আকরম খাঁ মুসলিম সাংবাদিকতাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। উলে- খ্য প্রথম এবং একমাত্র বাংলা দৈনিক হিসেবে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশ করেন মওলানা আকরম খাঁ যেটি ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ এর দশকে বাংলায় মুসলিম লীগের ব্যাপক সমর্থন তৈরিতে অবদান রাখে।

আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাচর্চার পরিবেশে প্রথম পর্যায়ে মওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে এবং তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী (১৯০৫–১৯১১) আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। [২২] ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গ বিভক্তির পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ করা হলে দলমত নির্বিশেষে হিন্দু নেতৃবৃন্দের ন্যায় মুসলমান নেতৃবৃন্দও এর প্রতিবাদ জানায়। [২৩] তারা বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন জনসভা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখে এবং সরকারের কাছে স্মারক লিপি পাঠিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গ ও আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা কার্যকর করা হলে নওয়াব সলিমুল-াহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান এর পক্ষ নেয়।[২৪] নওয়াব সলিমুল-াহ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে থাকেন। মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ সমর্থন করেছিলেন [২৫]। ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে সমর্থন করার জন্য নওয়াব সলিমুল-াহর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' গঠিত হয়। [২৬] ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সময় তাঁর উদ্যোগেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটি বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়। [২৭] ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মওলানা আকরম খাঁ অংশগ্রহণ করলেও তিনি প্রথম দিকে মুসলিম লীগে যোগদান করেনি কারণ রাজনৈতিক জীবনের শুর–তে তিনি কংগ্রেসের অনুসারী ছিলেন। [২৮] এ সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের রাজনৈতিক

আদর্শে বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিলেন। [২৯] ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার প্রধানত প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের মূল যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেও আবদুর রসুলের ন্যায় মওলানা আকরম খাঁ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রত্যাখান করে এর বির‍ুদ্ধে আন্দোলন শুর‍ু করেন। আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সভায় যোগ দিয়ে তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে পরিচিতি লাভ করেন। [৩০] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদ আকারে ব্যাপকতা লাভ করলে ভারত সরকার আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করে **১৯১১** সালের **১২ই** ডিসেম্বর দিল-ী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। [৩১] বঙ্গভঙ্গ রদে বাংলা তথা ভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে এরূপ ঘোষণাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়। তারা এটাকে সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করে। [৩২] বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ায় **১৯১১** সালের ৩০শে ডিসেম্বর নওয়াব সলিমুল-াহ ঢাকায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় আবদুর রসুলসহ উলে-খযোগ্য সংখ্যক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মুসলমান নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তে অসংখ্য কংগ্রেসপন্থী মুসলিম নেতা মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন [৩৩]। **১৯২২** সালের ২রা মার্চ কলকাতার ডালহৌসী ইন্সটিটিউটে নওয়াব সলিমুল-াহর সভাপতিত্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। [৩৪] মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য পেশ করেন। এখানে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগ রেখে বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দু বঙ্গে মুসলিম লীগকে সংযুক্ত করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। [৩৫] এই সংগঠন গঠনের পর থেকেই মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনে তৎপর হন। তাছাড়া মুসলিম লীগের পরবর্তী কর্মসূচী মওলানা আকরম খাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। **১৯১৫** সালের জানুয়ারিতে নওয়াব সলিমুল-াহ মৃত্যুবরণ করার পর বাংলার নিষ্প্রাণ মুসলিম লীগকে উজ্জীবিত করেন মওলানা আকরম খাঁ এবং মুসলিম লীগের হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা ও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির প্রসারে মনোযোগী হন। [৩৬]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আলাদা আলাদা অধিবেশনে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট একটি যুক্ত পরিকল্পনা পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দু-মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় মিলিত হয়। ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। [৩৭] এই অধিবেশনে বাংলা থেকে এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭), আবুল কাশেম(১৮৭২-১৯৩৬) প্রমুখের সঙ্গে আকরম খাঁও অংশগ্রহণ করেন। [৩৮] আবদুর রসুল এ অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করেন এবং ফজলুল হক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' (১৯১৬) নামে পরিচিত। [৩৯] মওলানা আকরম খাঁ লক্ষ্ণৌ চুক্তির আসন সংখ্যাগত দিকের চেয়ে সম্প্রদায়গত রক্ষাকবচের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সমর্থন করেন। [৪০]

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই মওলানা আকরম খাঁ কৃষক প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রতিকারের লক্ষ্যে মওলানা আকরম খাঁ *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকার মাধ্যমে প্রজাদের দাবী-দাওয়া এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। তাছাড়া প্রজাদের নেতৃত্বে যে সকল জমিদার বিরোধী কার্যক্রম হতো তা তিনি প্রকাশ করতেন। তাঁর এ সাংবাদিক প্রচেষ্টা একদিকে প্রজা আন্দোলনের সংগঠকদের উৎসাহিত করে অন্যদিকে তা প্রজাদের দাবী দাওয়ার প্রতি সচেতন করে তোলে। এভাবে সাংবাদিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মওলানা আকরম খাঁ প্রথমে প্রজা দরদি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং সরাসরি প্রজা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। [৪১] বাংলায় প্রজা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রজাদের দাবী দাওয়া নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। স্থানীয় সমাজ সচেতন ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় আয়োজিত এ সমস্ত সম্মেলনে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ১৯১৪ সালের জামালপুরের কামারের চরে স্থানীয় প্রজা নেতা খান মোহাম্মদ সরকারের (পরে চৌধুরী) উদ্যোগে এক বিরাট প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ কে ফজলুল হক, মৌলবী আবুল কাশেম, খান বাহাদুর

আলীমুজ্জামান চৌধুরী, রাজিবুদ্দীন তরফদার,মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ প্রজাদরদি নেতা অংশগ্রহণ করেন। [৪২] এই সম্মেলনে মওলানা আকরম খাঁ প্রজাদের দাবীর পক্ষে (দাবী গুলোর মধ্যে অতিরিক্ত কর মওকুফ ছিল অন্যতম) জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। [৪৩]

রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নীতি গ্রহণের পাশাপাশি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। [৪৪] ১৯১৪ সালে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যকার যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষাবলম্বন করলে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ তুর্কি খেলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খেলাফত রক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেন। [৪৫] বাংলার অন্যান্য খেলাফত নেতার মত মওলানা আকরম খাঁ খেলাফতের রক্ষার পক্ষে জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ভয়ভীতি ও প্রলোভন আসলেও তিনি আপোসহীনভাবে তুর্কি খেলাফতের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হন। [৪৬] ব্রিটেন জার্মানি যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশরা ভারতের সহযোগিতার প্রত্যাশায় ভারতীয়দের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে কিন্তু পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষাবলম্বন করায় তাদের ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়, ঠিক এসময়ে এক দল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের চেষ্টা করে। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রতি কঠোর আচরণ শুরু করে। এ সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন নির্যাতন ও দমনমূলক আইন তৈরি করে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার প্রচেষ্টা চালায়। ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ২১ শে মার্চ 'রাওলাট আইন' পাস করে। [৪৭] এই আইন পাশ হওয়ার অব্যবহিত পরে ভারতীয়রা তা বাতিলের জন্য জোর আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন পাঞ্জাবে তীব্র আকার ধারণ করলে ১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যার প্রতিবাদে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান, শিখ নর-নারী 'রাওলাট আইন' বিরোধী এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জেনারেল ডায়ার সশস্ত্র বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে এসে শান্তিপূর্ণ জনসভার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। ফলে প্রায় ৪০০ নর-নারী ও শিশু নিহত হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে

জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। [৪৮] জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকান্ডের পর মওলানা আকরম খাঁ পাঞ্জাবে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন এবং দ্রুত সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলায় বিভিন্ন জনসভায় এই নির্মম হত্যাকান্ডের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে ব্রিটিশ নৃশংসতা সম্পর্কে অবহিত করেন। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রেক্ষাপটে মওলানা আব্দুল বারী খেলাফত প্রশ্নে এবং মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির লক্ষে খেলাফত আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। [৪৯] মওলানা বারীর এ প্রচেষ্টার শুরু থেকে মওলানা আকরম খাঁ যুক্ত ছিলেন। [৫০] ইতোমধ্যে সেভার্স চুক্তির (Treaty of Severs) শর্তাবলি প্রকাশিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের মনে এতে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ তুরস্ক খেলাফত তৎকালীন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, একতা ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক রূপে গণ্য ছিল। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভারতীয় মুসলমানদের মনে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। মুসলমানরা খেলাফতের সম্মান ও অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা আবদুল বারী লক্ষ্মৌতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বৈঠক আহবান করেন। এ বৈঠকেই সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতের সকল প্রদেশে এর শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। [৫১] এ সময় মওলানা আকরম খাঁ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর কেন্দ্রিয় খেলাফত কমিটির কর্মসূচী হিসেবে সমগ্র ভারতে খেলাফত দিবস পালিত হয়। একই বছর ২৩ মে ও ২৪ নভেম্বর দিল্লীতে প্রথম খেলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ কে ফজলুল হক। খেলাফত সম্মেলনে দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। [৫২] সভাপতির ভাষণে তিনি খেলাফত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সরকারের সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা বর্জন করার প্রস্তাব করেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা মীরাটে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সে স্বীকৃত হয়।

পরবর্তী মাসে আকরম খাঁ সহ বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় খেলাফত কমিটির নেতৃবৃন্দকে কলকাতায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এ উপলক্ষে কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ৩রা মার্চ ঢাকার আহসান মঞ্জিলে আরও একটি খেলাফত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৫-১৯৫৮), মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০), মওলানা আকরম খাঁ এ সম্মেলনে অংশ নেন এবং তিনি খেলাফত রক্ষার প্রয়োজনে অসহযোগের গুর‍ুত্ব ব্যাখ্যা করে বাংলায় বক্তৃতা করেন। ফলে শ্রোতাম-লীকে তিনি খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। [৫৩] ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল, এশিয়া মাইনর, থ্রেস প্রভৃতি অঞ্চল মিত্রশক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। [৫৪] জুলাই মাসে সিন্ধুতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে খেলাফত আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য মহাত্মা গান্ধী ২৩ কোটি ভারতীয় হিন্দুর প্রতি আহ্বান জানান। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় কংগ্রেস, খেলাফত কমিটি এবং মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে অসহযোগের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তিনি সরকার প্রদত্ত খেতাব, কাচারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনসহ ভারতীয়দের চাকরি থেকে ইস্তফা এবং নব্য ব্যবস্থাপক সভায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা প্রদান করেন। [৫৫] মওলানা আকরম খাঁ নির্বাচিত সম্পাদক হিসেবে তাঁর সকল কর্মসূচী পালন করেন এবং খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের জন্য আর্থিক ফা- তৈরিতে মনোযোগী হন। চূড়ান্তভাবে অসহযোগের কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী মওলানা আকরম খাঁ আন্দোলনের কর্মসূচী জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে সফল হন।[৫৬] তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন নেতা হিসেবে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিলেট শহরে কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশনে যোগ দেন। এ অধিবেশনেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ কে ফজলুল হক অসযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও মওলানা আকরম খাঁ অন্যান্য নেতার সহযোগিতায় স্কুল কলেজ বর্জন আন্দোলন অব্যাহত

রাখেন। মওলানা আকরম খাঁ সংবাদপত্রের মাধ্যমেও অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পাদনায় বাংলায় প্রকাশিত *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকার পাশাপাশি উর্দু ভাষী জনগণের কাছে খেলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য ১৯২০ সালের ২৪ শে মে উর্দু ভাষায় *দৈনিক জামানা* প্রকাশ করেন। এরপর তিনি আন্দোলনের পটভূমিতে *সেবক* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং পরবর্তীতে দৈনিকে পরিণত করেন। মওলানা আকরম খাঁ এ সমস্ত পত্রিকায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে নিয়মিত খবর পরিবেশন করে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। [৫৭] মওলানা আকরম খাঁ *দৈনিক সেবকে* অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে উত্তেজনাকর সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে ১৯২০ সালে গ্রেফতার হন এবং প্রায় এক বছর জেলে থাকেন। [৫৮] দীর্ঘ এক বছরের অধিক সময় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন চলার পর ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরীচৌরা ঘটনার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী খেলাফত কমিটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ না করেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করেন। [৫৯] তাছাড়া ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা মুস্তফা কামাল পাশা মুসলমানদের প্রাচীন ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খেলাফতের বিলোপ সাধন করে খলিফাকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ খেলাফত সম্পর্কে আগ্রহ কমে যায় এবং আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। [৬০]

অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক স্থগিতের সিদ্ধান্তে পূর্ব বাংলাসহ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হয়। এসময় ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ভুলে সাম্প্রদায়িক কলহ কোন্দলে লিপ্ত হয়। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের এরূপ দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নতুন সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। [৬১] চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেও স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে 'স্বরাজদল' গঠন করেন। [৬২] মওলানা আকরম খাঁ চিত্তরঞ্জন দাসের এই প্রচেষ্টায় সমর্থন প্রদান করেন। হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাকে রাজনৈতিক রূপ প্রদানের জন্য শুরুতেই

চিত্তরঞ্জন দাস তাদেরকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) নামে পরিচিত। [৬৩] মওলানা আকরম খাঁ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির লক্ষ্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রণয়নে সহযোগিতা করেন। বেঙ্গল প্যাক্টে সন্নিবেশিত শর্তাবলী ছিল মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে তাই মওলানা আকরম খাঁ ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা এবং প্রচারের ফলে তা সহজেই মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এ প্যাক্টকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদনের জন্য সি আর দাসের উদ্যোগে ১৯২৪ সালের ২রা জুন সিরাজগঞ্জে একসভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আকরম খাঁ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং গুর“ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এই সভায়ই 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদিত হয়। [৬৪]

'স্বরাজদল' এবং 'বেঙ্গল প্যাক্ট' পাশ হওয়ার পর কলকাতা এবং ঢাকায় (১৯২৬–১৯২৭) অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লক্ষ্য করা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে ব্যথিত হন। কারণ তিনি 'বেঙ্গল প্যাক্টের' পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনে অত্যন্ত গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। [৬৫] তবু মওলানা আকরম খাঁ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। ১৯২৬ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করে মওলানা আকরম খাঁ মর্মাহত হয়েও ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল আলোচনার জন্য উত্থাপিত হলে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলসহ সকল হিন্দু সদস্য মুসলিম ও প্রজা স্বার্থের তীব্র বিরোধিতা করায় আকরম খাঁ অধিকতর মর্মাহত হন এবং কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। [৬৬] পরে ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর সম্মেলনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয় এবং ১৯২৮ সালের নেহের“ রিপোর্টের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। [৬৭]

মওলানা আকরম খাঁ কংগ্রেসের সংশ্লিষ্টতা ত্যাগ করে বিপুল উৎসাহের সাথে প্রজা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের পর বিভিন্ন দল ও উপদলের ২৭ জন মুসলমান পরিষদ সদস্য মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জুলাই মাসে কলকাতায় এক সভায় মিলিত হয়ে প্রথমে Bengal Muslim Council Association গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। [৬৮] পরবর্তীতে জামালপুরের শাহ আবদুল হামিদের পরামর্শে এবং এ কে ফজলুল হকের প্রস্তাবক্রমে প্রজাস্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২) নব গঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র সভাপতি এবং মওলানা আকরম খাঁ(১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পাদক নির্বাচিত হন। মৌলবী মুজিবর রহমান(১৮৬৯-১৯৪০), মৌলবী আবদুল করিম (১৮৬১-১৯৪৩) এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২), ড. আবদুল-াহ সোহ্‌রাওয়াদী (১৮৭০-১৯৩৫) এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬) সহ সভাপতি, মৌলবী শামসুদ্দিন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৩) এবং তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯–১৯৬৩) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। [৬৯] এভাবে রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়। সমিতির নেতাদের নিঃস্বার্থ কঠোর পরিশ্রমে অল্প দিনের মধ্যেই প্রজাসমিতি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ সময় প্রজা আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'চাষী' প্রকাশিত হয়। [৭০]

'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র প্রতিষ্ঠালগ্নে সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মওলানা আকরম খাঁ এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩২ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক প্রজা সমিতি গুলো 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র অধীনে সংগঠিত হয়। ফলে প্রজা সমিতি অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতোমধ্যে প্রদেশের কয়েকটি স্থানে কমিউনিস্ট প্রভাবিত কৃষক আন্দোলনের ফলে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় বাংলা সরকার কৃষক, প্রজাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারিসহ নানাবিধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রজা সমিতির কর্মীরা আন্দোলনের প্রশ্নে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মওলানা আকরম খাঁ সহ প্রজা সমিতির সকল নেতাই শান্তিপূর্ণ

উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তারা প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা নেই বলে সরকার পক্ষকে আশ্বস্ত করেন। ফলে প্রজা সমিতি ও প্রজা সম্মেলনের উপর থেকে সরকারি বিধি নিষেধ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং সংগঠনটি ক্রমশ প্রজাদের সংগঠিত করে শক্তিশালী হতে থাকে। [৭১]

১৯৩৪ সালে কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের নির্বাচনে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র সভাপতি স্যার আবদুর রহিম সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হয়ে সমিতির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করায় নতুন সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্নে সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আন্ত:বিরোধের সৃষ্টি হয়। এসময় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নেতা ও কর্মীগণ দুটো উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ প্রজা নেতৃগণ ও খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকে ময়মনসিংহ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করতে চাইলে পূর্ববঙ্গের তরুণ নেতৃবৃন্দ তাতে বাঁধা প্রদান করেন। তারা এ কে ফজলুল হককে সভাপতি করার দাবী করেন। এ অবস্থায় উভয় পক্ষ নির্বাচনী শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়ে সভাপতি মনোনীত করার জন্য স্যার আবদুর রহিমের উপর ভার অর্পণ করেন। স্যার আবদুর রহিম, খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকেই মনোনীত করেন। কিন্তু এ কে ফজলুল হকের অনুসারীগণ এই মনোনয়ন অস্বীকার করেন এবং নির্বাচন দাবী করেন। এ ঘটনার পরপরই প্রজা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত হয় ময়মনসিংহে। এ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব নিয়েও মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের প্রজা নেতৃগণের মনোমালিন্য ঘটে। মওলানা আকরম খাঁ খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকে ময়মনসিংহ অধিবেশনের সভাপতি করতে প্রয়াসী হন এবং তাঁর বিরোধীগণ এ কে ফজলুল হককে সভাপতি করতে চেষ্টা করেন। এ কে ফজলুল হক পূর্বেকার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করায় এ বিষয়ে মওলানা আকরম খাঁর দাবীই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য ছিল। তবু ময়মনসিংহ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮–১৯৭৯) এ কে ফজলুল হককে সভাপতি নির্বাচিত করে হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে সম্মেলনের প্রচার শুরু করেন। [৭২]

মওলানা আকরম খাঁ এ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন এবং সাংগঠনিক নির্দেশের মাধ্যমে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ স্থগিত ঘোষণা ফলপ্রসু হয়নি। কারণ এ ঘোষণা যখন প্রচারিত হয় তখন সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত । তাছাড়া সম্মেলনের সভাপতি এ কে ফজলুল হক এবং অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তার কারণে মওলানা আকরম খাঁ কর্তৃক স্থগিত ঘোষণা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে সাফল্যের সঙ্গেই প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনেই স্থগিতাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে। 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র ময়মনসিংহ সম্মেলনের ঘটনা প্রবাহ মওলানা আকরম খাঁকে সংগঠনের কাজে নিরুৎসাহী করে তোলে। তাছাড়া কলকাতায় *মোহাম্মদী* পত্রিকার কার্যালয়ে প্রজা সমিতির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে আকরম খাঁর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার সদস্যগণের সমর্থনে এ কে ফজলুল হক 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। এর ফলে মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে এ কে ফজলুল হকের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। মূলত কলকাতা কাউন্সিলের পর মওলানা আকরম খাঁ 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আকরম খাঁ অনুপস্থিত থাকায় ফজলুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন। এ অধিবেশনে বাংলার বিভিন্ন স্থানের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে প্রজা সমিতির সংহতি ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাপার্টি' নামকরণ করা হয়। মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর সহযোগীগণ সংগঠনের নাম পরিবর্তনকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' রূপেই সংঠনের কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করেন।[৭৩] এ সময় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টি' মওলানা আকরম খাঁর স্থলে শামসুদ্দিন আহমেদকে সম্পাদক নির্বাচিত করে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করতে শুরু করে। ফলে মওলানা আকরম খাঁ বাংলায় প্রজা আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি নবগঠিত 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'তে যোগদেন।[৭৪] এ দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে এ কে ফজলুল হক ও 'নিখিল বঙ্গ কৃষক' পার্টির বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন।[৭৫]

ইতোমধ্যে ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পূনর্গঠনে তৎপর হন এবং সমগ্র ভারতে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। [৭৬] ১৯৩৬ সালে গঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হলে মওলানা আকরম খাঁ এই বোর্ডে অন্তর্ভূক্ত হন। মোহম্মদ আলী জিন্নাহর প্রচেষ্টায় 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির' নেতৃবৃন্দ তাদের দলীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মুসলিম লীগে যোগ দিতে সম্মত হলে মওলানা আকরম খাঁও এ সময় মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং মুসলিম লীগ প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ফলে আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রাম এ কে ফজলুল হক ও তাঁর 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ ও লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মওলানা আকরম খাঁ এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় তিনশত জন প্রজা নেতাকর্মী সংবাদপত্রে এক আবেদনের মাধ্যমে কৃষক প্রজা পার্টির কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য প্রজা সাধারণের নিকট আহ্বান জানান। বস্তুত কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং কমিউনিজমের প্রতি বির‍ূপ মনোভাবাপন্ন সাধারণ মুসলমানদের কৃষক-প্রজা পার্টির প্রভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল এ আবেদনের মূল উদ্দেশ্য। [৭৭] মওলানা আকরম খাঁ সংগঠনের সমালোচনার সাথে সাথে সংগঠনের সভাপতি ফজলুল হককে ও সমালোচনা করেন। *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ ফজলুল হককে নীতিহীন এবং অস্থির চরিত্রের রাজনীতিবিদ হিসেবে অভিহিত করেন। [৭৮] পালামেন্টারি বোর্ডের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে মওলানা আকরম খাঁ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জনপ্রিয়তা হ্রাসের চেষ্টা করেন। মওলানা আকরম খাঁ আসন্ন নির্বাচন সংগ্রামকে মুসলমানদের জন্য জীবন মরণ সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সচেতন করতে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার মাধ্যমে প্রজা পার্টি এবং এর মূল নেতা ফজলুল হকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টা চালান। [৭৯] কিন্তু মওলানা আকরম খাঁ ও লীগের তীব্র বিরোধী প্রচারণা সত্ত্বেও ফজলুল হক লীগ প্রার্থী খাজা নাজিমুদ্দিনকে দ্বিগুনেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে

স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীগণ সর্বাধিক ৪৩টি, মুসলিম লীগ ৩৯ টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬টি এবং ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫টি আসন লাভ করে।[৮০] মুসলিম লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভে ব্যর্থ হলেও বাংলার নগর ও পল-ীর সকল ধরনের আসনেই কমবেশি সাফল্য লাভ করে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সাফল্য শুধুমাত্র পল-ীর আসন গুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের অনেকেই মুসলিম লীগে যোগ দেয়ায় তাদের সংখ্যা দাড়ায় ৫৯ এ। কৃষক প্রজা পার্টিতে স্বতন্ত্র সদস্য যোগ দেওয়ায় দলীয় আসন সংখ্যা ৫৫ তে উন্নীত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস একক ভাবে ৬০টি আসন লাভ করায় একক সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ফলে সংগত কারণেই একক ভাবে কোন দলের পক্ষে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব ছিল না। অবশেষে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এ কে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলায় প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং ১লা এপ্রিল উক্ত মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৮১]

ইতোমধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁর (১৮৮৪-১৯৫৮) নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মুসলিম লীগের কতিপয় নিয়ম-নীতি ও আদর্শের পরিবর্তন করে সংগঠনকে গণমুখী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করে।[৮২] উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ সালের ২৭শে জুলাই বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের কলকাতাস্থ বাসগৃহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম সদস্যদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলিম সংহতির আবশ্যকতা তুলে ধরেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে পরিষদ সদস্যদের প্রয়োজনে প্রাণপাত করার আহবান জানান।[৮৩] ১৯৩৭ সালের ২২ শে আগস্ট কলকাতা ডেন্টাল কলেজ হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি এবং সৈয়দ বদর-দ্দোজাকে সেক্রেটারি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর মওলানা আকরম খাঁ ২৩শে আগস্ট কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা আহ্বান করেন।

তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মুসলিম লীগকে সংহত করার লক্ষ্যে বাংলার সর্বত্র মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। [৮৪]

১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। [৮৫] এ অবস্থায় তাকে সভাপতি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'অর্গানাইজিং কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে মওলানা আকরম খাঁকে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তিনি এ কমিটি সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগঠন কায়েমের পর ক্রমান্বয়ে মহকুমা জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে তা গঠনের পরামর্শ দেন। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপস্থিতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নবগঠিত অর্গানাইজিং কমিটির এক বিশেষ সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও শাখা লীগ সমূহের জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। এ গঠনতন্ত্রে মওলানা আকরম খাঁর প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পর্যায়ে লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা এবং পর্যায়ক্রমে মহকুমা জেলা ও প্রাদেশিক লীগ গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এ সভায় তাঁকে আহবায়ক নির্বাচিত করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্য পরিচালনার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা হয় এবং অর্গানাইজিং কমিটির যাবতীয় অর্থ সম্পদের দায়িত্ব এই ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর মওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগী হন। এর পাশাপাশি তিনি বাংলায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়নেও সচেষ্ট ছিলেন। [৮৬]

প্রজা-লীগ কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরীক হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত মওলানা আকরম খাঁ হক মন্ত্রীসভার বিভিন্ন কার্যাবলীকে সমালোচনা করেন। তবে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পর মওলানা আকরম খাঁ সরকারের বাইরে এবং ভিতরে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে

বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপনে সক্রিয় থাকেন। ইতোমধ্যে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন দলীয় সদস্য মৌলবী তমিজউদ্দিন, শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমূখ নেতৃবৃন্দ স্বপক্ষ ত্যাগ করায় হক মন্ত্রীসভা সংকটের সম্মুখীন হয়। এ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রীসভাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র বাংলায় জনমত গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। ২০ শে মার্চ কলকাতা মুসলিম লীগ ও খেলাফত কমিটির উদ্যোগে হক মন্ত্রীসভার উপর আস্থা স্থাপনের জন্য কলকাতা টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ২৭ শে মার্চ নিখিল বঙ্গ হক মন্ত্রীত্ব দিবস পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। আকরম খাঁ হক মন্ত্রীত্ব দিবসের কর্মসূচী পালনের সাথে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালের ২৭ শে মার্চ আড়ম্বরের সঙ্গে সমগ্র বাংলায় হক মন্ত্রীত্ব দিবস পালিত হয়। মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে এ দিন কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে মুসলিম লীগ ও খেলাফত কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি সমবেতভাবে দলত্যাগীদের নিন্দা করার জন্য এবং তাঁদের মুসলিম সমাজ থেকে বর্জন করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান। তাছাড়া তিনি *দৈনিক আজাদে* সমগ্র বাংলায় পালিত এ দিবসের খবরা খবর ধারাবাহিকভাবে প্রচার করেন। ফলে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে বাজেট অধিবেশনের সময়ে কোয়ালিশন দলত্যাগীগণ কংগ্রেসের সহযোগে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার উপর যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ব্যর্থ হয়। [৮৭]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে প্রতিনিধিত্বমূলক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য মওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৯ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ওর্য়াকিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। এই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে মওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

"লীগের অর্থ যে যাহাই করুন, আমি মনে করি লীগের প্রকৃত অর্থ জামাত এবং এই জামাত জাতীয় জীবনের সকল দিক হইতে অপরিহার্য্য। জামাত ব্যতীত মুসলমান বাঁচেনা আর মুসলমান না বাঁচলে এছলাম বাঁচেনা। মুছলমান কে বাঁচাইতে হইলে জামাতকে বাঁচাইতে হইবে।" অধিবেশনের প্রথম দিনেই এ কে ফজলুল হককে সভাপতি, আকরম খাঁকে সহ সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সেক্রেটারি নির্বাচিত করেন। এখানে সর্বসম্মতি ক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। [৮৮]

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। [৮৯] মুসলিম কার্যবিবরণীতে কোথাও লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সমস্ত হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোতে একে "পাকিস্তান" প্রস্তাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ফলে এটা ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবে রূপান্তরিত হয়। [৯০] মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর ২৩ শে মার্চ সমগ্র ভারতে পাকিস্তান দিবস পালনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আকরম খাঁর মধ্যে মতবিরোধ ঘটে এবং সম্পর্কেরও অবনতি হয়। কারণ এ কে ফজলুল হক উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তা বাতিলের নির্দেশ দেন। ১৯৪১ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর কলকাতা মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মওলানা আকরম খাঁ পাকিস্তান সম্পর্কে তার আপোসহীন মনোভাব ব্যক্ত করেন। উক্ত সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান "ক্রীড" বা ধর্ম দর্শনকে পূর্ণসমর্থন ও জিন্নাহর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং পাকিস্তানের আদর্শকে ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে পল্লী প্রচার কমিটি গঠন করা হয়। [৯১] ইতোমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে মত পার্থক্যের কারনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও এ কে ফজলুল হকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এ কে ফজলুল হক কে মুসলিম লীগ হতে বহিস্কার করেন এবং মওলানা আকরম খাঁকে অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। [৯২] মওলানা

আকরম খাঁ বাংলায় মুসলিম লীগের পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি ১৯৪২ সালের ১৪ ও ১৫ ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনকে সামনে রেখে তিনি সংগঠনকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। নির্দিষ্ট তারিখে সিরাজগঞ্জে অত্যন্ত সফলভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয় মওলানা আকরম খাঁকে এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে। তাছাড়া এখানে জিন্নাহর নেতৃত্ব ও পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি পূর্ণআস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং যথাশীঘ্র পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সকল ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়। পরে ১৯৪২ সালের ২৩, ২৪ ও ২৫শে আগস্ট আকরম খাঁর সভাপতিত্বে কলকাতায় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিন ব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ এ কে ফজলুল হক সরকারের সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহিত হয়। মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক লীগ এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং হক মন্ত্রীসভার পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। অত:পর ১৯৪৩ সালের ২৮ শে মার্চ এ কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন এবং ১৩ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বাংলায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[৯৩]

১৯৪৩ সালের ৫ই নভেম্বর কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মওলানা আকরম খাঁ পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আবুল হাশিম(১৯০৫-১৯৭৪) সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। প্রথমাবস্থায় উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমান্বয়ে উভয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ আবুল হাশিম এক বক্তৃতায় ঢাকার নওয়াব গোষ্ঠী, ইস্পাহানী পরিবার এবং মওলানা আকরম খাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে অভিহিত করেন। অন্যদিকে মওলানা আকরম খাঁও তাকে কমিউনিস্ট ও কাদিয়ানী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর ফলে প্রাদেশিক লীগ মূলত: দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের যুব নেতা কর্মীদের সিংহভাগ আবুল হাশিমকে সমর্থন করায় তারা বামপন্থী হিসেবে পরিচিতি লাভ

করেন। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন এবং তাঁরা ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৪৪ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব মীমাংসিত হলেও পরবর্তীতে আবার পরস্পরে বিরোধিতা শুরু করেন।[৯৪] ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসন করে স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সিমলায় ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন আহবান করেন।[৯৫] এ সম্মেলনে ভাইসরয় ওয়াভেল ভারতীয় সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলে উক্ত সরকারে মুসলিম লীগই যেন মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে আকরম খাঁ বাংলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের উপর চাপ প্রয়োগে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় অত:পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৫ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ফলে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক লীগ মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে নয় সদস্য বিশিষ্ট্য পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে নির্বাচনী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে মওলানা আকরম খাঁ কংগ্রেস প্রভাবিত ওলামা সংগঠন 'জমিয়ত-ই- ওলামায়ে হিন্দ' এর বিরোধিতা করে কলকাতায় মুসলিম লীগ সমর্থক 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' এবং চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তার দায়িত্ব পালন করেন।[৯৬]

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রিয় পরিষদের নির্বাচনে মওলানা আকরম খাঁ সহ প্রাদেশিক লীগ পালামেন্টারি বোর্ডের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ বাংলার সব কয়টি মুসলিম আসন লাভ করেন। [৯৭] তাছাড়া মওলানা আকরম খাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও দৃঢ় ভূমিকার ফলে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতে বিজয়ী হয়। নির্বাচনের এ ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নামে যে আবেদন করেন তা অনেকাংশেই সফল হয়। এতে আরও উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলার মুসলিমগণ তাঁদের প্রতিনিধিত্বশীল

সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্র করে আকরম খাঁর সাথে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। [৯৮]

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবসকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং সেই দাঙ্গা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। [৯৯] এই অবস্থায় মুসলিমদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য আকরম খাঁ সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং মুসলিমদের পাকিস্তান অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তবে মওলানা আকরম খাঁ ১৯৪৬ সালের ৮ই নভেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেন কিন্তু প্রাদেশিক কাউন্সিলের অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন। এ সময় পাক ভারতের রাজনৈতিক পর্ব পরিবর্তন হয় এবং ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন এবং ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আকরম খাঁ উভয়েই প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার কারণে উভয়েই অবশেষে স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে খণ্ডিত হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। ফলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি সংক্রান্ত মওলানা আকরম খাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সিলেটের পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে সিলেট গণভোট কমিটি গঠিত হলে আকরম খাঁ সভাপতির দায়িত্ব পালন ও সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিশেষ তৎপরতা শুরু করেন। ফলে জুলাই মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত গণভোটে সিলেটবাসী মুসলমানগণ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে ব্যাপকভাবে তাঁদের রায় প্রদান করেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭

সালের ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্ড়ান নামক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে পূর্ব বাংলা ও সিলেট পাকিস্ড়ানের অন্তর্ভূক্ত হয়। [১০০]

দেশ বিভাগের পর মওলানা আকরম খাঁ ঢাকায় চলে আসেন এবং আমৃত্যু এখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকায় আসার পরপরই পূর্ব পাকিস্ড়ান মুসলিম লীগের সভাপতি হন এবং ১৯৫১ সালে এ পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তবে ১৯৪৭ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঢাকায় মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্ড়ানের সরকারি ভাষা করা হবে না। উলে-খ্য তিনি গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসে বহুসংখ্যক ছাত্র শিক্ষক উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে মওলানা আকরম খাঁ তাদের দাবী পূরণের আশ্বাস দিলে তারা বর্ধমান হাউস ত্যাগ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের আশ্বাস দেন যে, পূর্ব পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্ড়ান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাশাপাশি উর্দু এবং ইংরেজি চর্চার উপর গুর"ত্ব আরোপ করেছিলেন। [১০১]

১৯৪৮ সালের ৯ই মার্চ মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে ভাষা কমিটি গঠন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল কাশেমের (১৯২০-১৯৯১) বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তব অসুবিধা দূর করে সরকারি অফিস আদালতে বাংলাকে অফিসিয়াল ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ৯ই মার্চ এক সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে ড. শহীদুল-াহ(১৮৮৫-১৯৬৯), প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ(১৮৯৪-১৯৭৮), ডঃ এনামুল হক(১৯০২-১৯৮২) প্রমুখসহ ১৪ জনের একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষা কমিটি গঠিত হয়। [১০২] পূর্ব পাকিস্ড়ান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে দুটি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। যথা (১) শিক্ষা সংস্কার

কমিটি ও (২) ভাষা সংস্কার কমিটি। উভয় কমিটিতেই মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করা হয়। সভাপতির দায়িত্ব সুচার‍ূপে সম্পাদন করে ভাষা জটিলতার অনেক প্রশ্নের সমাধান করেন।[১০৩]

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মওলানা আকরম খাঁ এবং তাঁর *দৈনিক আজাদের* ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।[১০৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ প্রথম 'বাংলা একাডেমি' কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রস্তাবাকারে জনসম্মুখে সর্ব প্রথম *দৈনিক আজাদ*-ই 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার দাবী উপস্থাপন করে। মওলানা আকরম খাঁ *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয় এবং উপ সম্পাদকীয়তে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবী জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলেন। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ২৬ শে নভেম্বর পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৬০ সালে মওলানা আকরম খাঁ বাংলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৬১ সালের ৩রা আগস্ট একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার মওলানা আকরম খাঁকে বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মনোনীত করেন। ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।[১০৫] ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে মওলানা আকরম খাঁর সংগ্রামময় কর্মজীবনের অবসান ঘটে এবং ঢাকাস্থ বংশালে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[১০৬]

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যে কয়েকজন মুসলমান নেতা বাংলার রাজনীতিতে গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাদের অন্যতম। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের সূত্রে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন এবং এ সময় থেকেই তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। আরবী শিক্ষিত আলেম হয়েও তিনি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নেতা রূপে পরিচিতি পান। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনবোধে মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগে যোগ দেন আবার একই সময়ে পশ্চাৎপদ, চিন্তাচ্ছন্ন হতাশায় মুহ্যমান, সংকীর্ণ মাজহাবী কলহ-কোন্দলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একতাবোধ ও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামক আলেম সমিতি গঠনে তিনি প্রত্যক্ষ ও গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার দৃঢ় ভূমিকায় খেলাফত

ও অসহযোগ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মুসলিম রাজনীতিতে বিশ্বাসী হলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন যার বড় প্রমাণ ১৯২৩ সালের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রণয়নে আকরম খাঁর ভূমিকা। রাজনীতির প্রয়োজন তথা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে কংগ্রেস রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় ছিলেন তবে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। তাছাড়া রাজনৈতিক জীবনের শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রজা আন্দোলন তথা কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সজাগ থেকে প্রজা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তবে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সংশি- ষ্ট হয়ে মওলানা আকরম খাঁ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে মুসলিম লীগ ও সংশি- ষ্ট নেতা কর্মীদের সমালোচনা করেছেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও রাজনৈতিক প্রশ্নে কখনও কখনও দ্বিধান্বিত হয়েছেন। তাই বলা যায় রাজনৈতিক জীবনের শুর“তে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আত্মআস্থা সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী নেতা ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি স্বীয় চারিত্রিক উজ্জ্বল্য অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেন। কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগের পর তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অবস্থানকে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের অবস্থা বিবেচনায় যৌক্তিক হিসেবে মেনে নিলেও জিন্নাহর প্রতি তাঁর অন্ধ অনুগামিতা সমর্থন যোগ্য নয়। তবে তাঁর অনুগামিতা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বুদ্ধি বা লোভের পরিণতি বলে মনে হয় না। কেননা ক্ষমতাসীন সংগঠনের সভাপতি হয়েও তিনি কখনও মন্ত্রীত্বের প্রতি লালায়িত হননি এমনকি মওলানা আকরম খাঁ প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিলেন যে, মন্ত্রী হওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রে ব্যতিক্রমী মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে বিশেষ করে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগ্রামে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান অবিসংবাদিত। কেননা বাংলার রাজনীতির বিভিন্ন সংকট সন্ধিক্ষণে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক প্রচেষ্টাও মুসলমানদের রাজনৈতিক মুক্তির দিক-নির্দেশনা দেয়।

প্রান্তটীকা

১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ প্রশাসনিক অসুবিধা নিরসনের জন্য এবং সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গ দেশকে দুভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গ বিভাগের ফলে বাঙালিদের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে এরূপ চিন্তা করে তৎকালীন হিন্দু নেতৃবৃন্দ যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) প্রমুখ এর বির‍ুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরিশেষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে এটি হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠিত রূপ হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে এই আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়। (গোলাম মুস্তফা, *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, ঢাকা, উৎস প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৫-১৯)

২. প্রজা আন্দোলন ঃ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে চেতনা জাগ্রত হয় প্রধানত তারই ফলে জমিদারি শোষণের কেন্দ্রগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রজা সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। সমিতিগুলো স্থানীয়ভাবে প্রজাদের দাবি দাওয়া নিয়ে জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বাংলায় প্রজা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রজাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। ১৯১৪ সালে জামালপুরের কামারের চরে স্থানীয় প্রজানেতা খোশ মোহাম্মদ সরকারের (পরে চৌধুরী) উদ্যোগে এক বিরাট প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ এবং প্রতিকার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তবে সত্যিকার অর্থে বাংলায় ব্যাপক প্রজা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর থেকে। ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা লগ্নে সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মওলানা আকরম খাঁ এ দায়িত্ব পালন করেন। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা আকরম খাঁ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪১-৪৩)

৩. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ঃ তুরস্কের খলিফাকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ সমগ্র জাহানের খলিফা হিসেবে মান্য করত। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর‍ু হলে তুরস্ক ইংল্যান্ডের বির‍ুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। অপরদিকে, ভারতীয় মুসলমানগণ স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু পূর্ব প্রতিশ্র‍ুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে খন্ড-বিখন্ড করে এবং ভারতীয়দের প্রতি অনমনীয় আচরণ শুর‍ু করলে ব্রিটিশ সরকারের

দমন নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২০ সালে মুসলিম জাহানের 'খেলাফত' এর মর্যাদা রক্ষার জন্য যে আন্দোলন হয় তাকে খেলাফত আন্দোলন বলে। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মওলানা মুহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। অন্যদিকে রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ভারতীয় কংগ্রেস ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে সাথে সাথে খেলাফত আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলে। এভাবেই সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধিতার সংগঠিত রূপ খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে। (মুহাম্মদ ইনাম-উল- হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, (১৭০৭–১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫০-১৫৫)

৪. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ঃ পাকিস্তান আন্দোলন সাধারণভাবে বলা হয় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে শুরু হয়। দার্শনিক, কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে প্রথম বারের মতো ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উলে- খ করেন। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটি না থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ১৫ এপ্রিল মাদ্রাজ অধিবেশনে তথাকথিত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের শাসনতন্ত্রে মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে ১৯৪০ সাল থেকে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার বিতর্কে পাকিস্তান প্রশ্নটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বজনীনতা পেলেও পরবর্তীতে তার হিন্দু-মুসলিম স্বার্থে দ্বিধান্বিত হয়ে মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তা বাস্তবে পরিণত হয়। (আশা ইসলাম,*বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩০৬-৩০৭)

৫. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৬. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী: মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান: ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা একটি তুলনামূলক বিশে- ষণ*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ১০৭

৭. চব্বিশ পরগণা পশ্চিম বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি জেলা। মওলানা আকরম খাঁর জন্মের সময়ও চব্বিশ পরগণা একটি বৃহৎ জেলা ছিল। ১৭৫৭ সালের ২০ শে ডিসেম্বর বাংলার নবাব মীর জাফর ইংরেজদের এ জেলার জমিদারী স্বত্ব প্রদান করে। জমিদারী স্বত্ব লাভ করার অব্যবহিত পরে তখনকার দিল-ী সম্রাটের কাছ থেকে ইংরেজরা এ অঞ্চলের মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। (সুবল চন্দ্র মিত্র (সংকলিত) সরলা বাঙলা অভিধান, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৫২৪)

৮. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *মওলানা আকরম খাঁ*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৯

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

১০. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩

১১. মুহম্মদ আবদুল-াহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৪১২

১২. বর্ধমান তৎকালীন সময়ে বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক বিভাগ এবং জেলা । এ জেলার উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব দিকে নদীয়া, দক্ষিণে হুগলী ও মেদিনীপুর এবং প‍‍িমে বাকুড়া ও মানভূম প্রভৃতি জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। (W.W.Hunter, *A statistical Account of Bengal*; Vol. IV (Reprinted in India, Delhi, 1973, P. 17-18, উদ্ধৃত, এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৯)

১৩. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২, ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, (১৯০৫-৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩২৮

১৪. Rana Razzaque, *Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947*), Unpublished, Ph.D thesis, University of Dhaka, 1997 , p. 114

১৫. *আহলে হাদিস*, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সাংবাদিকতার পথিকৃৎ মওলানা আকরম খাঁ। বিংশ দশকের শুর‍‍তে প্রকাশিত *আহলে হাদিস* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। *আহলে হাদিস* পত্রিকায় কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ১৯১০ সালে সম্পূর্ণ নিজ কর্তৃত্বাধীনে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* পত্রিকা প্রকাশে সক্ষম হয়ে উঠেন। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪)

১৬. *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৯০৩ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ এবং ১৯২২ সালে দৈনিকে পরিণত করা হয়। মোহাম্মদী পত্রিকার

সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) (Rana Razzaque , *Ibid*, p.108)

১৭.*দৈনিক আজাদ* একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা, ১৯৩৬ সালে ৩১ শে অক্টোবর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। আজাদ পত্রিকাই তখন ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান দৈনিক পত্রিকা। ঢাকায় স্থানান্তরের পর আজাদের সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। (মনু ইসলাম,বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১)

দৈনিক জামানা মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত পত্রিকা যেটি ১৯২৩ সালের ১৪ই মে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে লেখনির ক্ষেত্রে *দৈনিক জামানা*র ভূমিকা অপরিহার্য। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪-৫)

মওলানা আকরম খাঁর সাংবাদিকতার অমরকৃত্তি দৈনিক ও সাপ্তাহিক *সেবক*। ১৯২১ সালে তিনি *সেবক* পত্রিকা প্রকাশ করেন। *সেবক* পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন নির্বন্ধ প্রকাশ করা হতো। "অগ্রসর! অগ্রসর!" শিরোনামে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখায় মওলানা আকরম খাঁকে গ্রেফতার করা হয়। (*দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১২ জুলাই, ২০১৪, পৃ. ৭)

মওলানা আকরম খাঁ সাংবাদকিতা শুর╌ করে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় *সাপ্তাহিক কমরেড* প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহাত্মক বক্তব্যের জন্য সমসাময়িককালে *কমরেড* পত্রিকা রাজনীতিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ জুলাই, ২০১৪, পৃ. ৭)

১৮. 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা' ত্রিপলির যুদ্ধ (১৯১১), বলকান যুদ্ধ (১৯২২), কানপুর মসজিদের হাংগামা (১৯১৩), খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ইসলামের উপর তাদের কলংক লেপন ইত্যাদি কারণে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার আলেম সমাজও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেন, স্বজাতির রাজনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মধ্যে দিয়ে ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। মওলানা মনির╌জ্জামান ইসলামাবাদী এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। (ড. সুনীল কান্তি দে, *আনজুমানে ওলামা ও মুসলিম সমাজ*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪)

১৯. *আল এসলাম* মাসিক জার্নালটি ১৯১৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। এটি 'আঞ্জুমান-ই-ওলামায়ে বাংলা'র মুখপত্র হিসাবে কাজ করত। কলকাতা থেকে ছয় বছর প্রকাশিত হয়। *আল এসলামের* সম্পাদক ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এবং খেলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। খেলাফত আন্দোলনের পক্ষের প্রচারণা এই জার্নালে নিয়মিত প্রকাশ হত।(শামসুজ্জামান খান, *মওলানা মনির‍ুজ্জামান এছলামাবাদী*, ঢাকা , ২০০৬, পৃ. ২৩-৩০)

২০. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫, ১৮-১৯, এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪-৫

২১. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬, Rana Razzaque , *Ibid*, P. 116-117

২২. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

২৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল- হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৫

২৪. নওয়াব সলিমুল-াহ (১৮৭১–১৯১৫) মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক। ১৯০৩-০৪ সালে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার ওপর মতামত দিতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গভঙ্গের পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করেন। ১৯০৬ সালে তিনি ' Muslim All India Confederacy' নামে একটি সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনিই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া আজীবন নওয়াব সলিমুল-াহ মুসলিম সম্প্রদায়ের মঙ্গলে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২-৩৩)

২৫. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং ১৯০৬ সালে সিমলা ডেপুটেশনে বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং ১৯১৮ সালে "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" এর সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ সালে 'খান বাহাদুর', ১৯১১ সালে 'নবাব', ১৯২৪ সালে 'নবাব বাহাদুর' এবং ১৯২৭ সালে সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত হন। (Chandiprasad Sarker, *The*

Bengali Muslims: A Study in Their Politicization (1912-1929), Calcutta, 1991, P. 250)

২৬. 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত তৈরীর ক্ষেত্রে নওয়াব সলিমুল্লাহ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন তিনি। এজন্য তিনি ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' গঠন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' আত্মপ্রকাশ করে। (আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭)

২৭. মুনতাসীর মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া* , মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ,১৯৯৯, পৃ ৬২-৭৫, গোলাম মুস্তাফা, *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, উৎস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩-১৬, আবু আল সাঈদ, *মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* ১২০৬-১৯৭৫,আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.৭৪-৭৬

২৮. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

২৯. ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল (১৮২৭ -১৯১৭) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সমৃদ্ধশালী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডন থেকে পড়াশোনা শেষ করে ১৮৯৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালের ৩রা নভেম্বর বেঙ্গল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল । বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বরিশাল ও চট্টগ্রাম সম্মেলনেরও সভাপতি ছিলেন। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্নৌ চুক্তির অন্যতম রূপকার। তাছাড়া ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং একই বছরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

আবদুল হালিম গজনভী (১৮৭৬-১৯৫৩) টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রভাবশালী জমিদার এবং কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তা প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য হলেও ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার বিষয়কে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী অংশের মধ্যে মতভেদের কারণে কংগ্রেস ত্যাগ এবং নির্দলীয় উদারপন্থী হিসেবে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। ১৯২৬-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রূপে দায়িত্ব পালন

করেন। (তাবেদার রসুল বকুল, *ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল জীবন ও কর্ম*, উৎস প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭,৬৭-৮৫)

৩০. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

৩১. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বরোদা রাজ কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৬ সালে বরোদা রাজ কলেজ ছেড়ে কলকাতায় আসেন। তিনি এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ উভয়ে বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলাদেশে এসে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মুখপত্র *যুগান্তর* প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলা ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান কার্যস্থল। বিশেষ করে ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, রাজশাহীতে সন্ত্রাসবাদীরা খুবই তৎপর ছিল। (রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*,আগামী প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০-২১)

৩২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ. বি. এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪১৭, গোলাম মুস্তফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১

৩৩. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal: (1937-1947)*, New Delhi, 1976, P. 44

৩৪. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ: জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, ১৯৮৬ , পৃ. ১৮৩

৩৫. ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের পক্ষে কাজ করতে থাকে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলমানরা বিভিন্নভাবে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২২ সালের ২রা মার্চ কলকাতার ডালহৌসি ইন্সটিটিউটে নবাব সলিমুল-াহর সভাপতিত্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম কনফারেন্স হয়। এখানে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগ রেখে বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দু'বঙ্গে মুসলিম লীগকে সংযুক্ত করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৫)

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫

৩৭. লক্ষ্ণৌ বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ ইউনিয়নের জৌলুসময় এক নগরী। নবাবী শহর, রাজনীতির নগরী, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নগরী, সঙ্গীতের নগরী এবং অপরূপ স্থাপত্য শিল্পের নগরী হিসেবে

খ্যাত। এই শহরের রূপকার ছিলেন নবাব আসফউদ-দৌলা। (*https:/Prokasik. wordpress.com/)*

৩৮. মৌলবী আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রথম সারির পরিচালক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহকর্মীরূপে বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। *The Mussalmans* (১৯০৩) পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০ সালে মওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে প্রেরিত খেলাফত ডেলিগেশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। মুসলিম লীগের সাথেও মৌলবী আবুল কাসেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভা ও পরে ভারতের কেন্দ্রিয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অন্য পরিচয় হল তিনি আবুল হাশিমের পিতা ছিলেন। (ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *বাঙলায় খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮০)

৩৯. লক্ষ্ণৌ চুক্তি: ১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে বোম্বেতে কংগ্রেসেরও অধিবেশন হয়। বোম্বে অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারের নিকট একটি যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে দুই দলের যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব উপস্থিত লীগ প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনুরূপ ভাবে কংগ্রেস অধিবেশনেও একই প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত এ যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই ‘লক্ষ্ণৌ চুক্তি’ নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলমানদের জন্য মোট নির্বাচিত সদস্যের বাংলায় ৪০% (যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৪%) পাঞ্জাবে ৫০% (মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৫%) যুক্তপ্রদেশে ৩০% (মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৪%) মধ্য প্রদেশ ১৫%, বোম্বাইয়ে ৩৩% ও বিহারে ২৯% আসন দেওয়া হয়। এ ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশি- ষ্ট বিল পাশের ক্ষেত্রে ঐ সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজনের কথা বলা হয়। (এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬–১৭৫৭)*,ঢাকা,১৯৮২ পৃ.১৭৯-১৮০। মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস: ১৭৫৭-১৯৪৭*, ঢাকা, ১৯৭৬, ২১৮–২২০)

৪০. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

৪১.*প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১

৪২. রাজিব উদ্‌দীন তরফদার (১৮৯১–১৯৫৯) বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২০ সালে তিনি খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর ন্যায় তিনি 'লাইন প্রথা' ভাঙ্গার জন্য আন্দোলন করেন এবং তা অমান্য করার জন্য বাঙালিদের নির্দেশ দেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৬)

৪৩. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০-১৩

৪৪. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৪৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩

৪৬. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৪৭.'রাওলাট আইন' ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি তদন্তের জন্য ইংরেজ আইনজীবী রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে 'রাওলাট বিল' নামে একটি খসড়া আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। এ আইনে এমন একটি বিশেষ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় যার রায় আপীলের উর্ধ্বে। তাছাড়া গোপন বিচার, থানা তল্লাশী ও গ্রেফতারের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবস্থাও এ আইনে রাখা হয়। (বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮১)

৪৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮১-১৮২, সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৫৭-১৯৪৭*, কলকাতা, ২০০৪ পৃ. ১৫৯-১৬৩

৪৯. খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম একজন নেতা ছিলেন মওলানা শওকত আলী (১৮৭১–১৯৩২) তুর্কি খেলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপিয় শক্তিগুলোর তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। মূলত আলী ভ্রাতার মাধ্যমেই এই আন্দোলন সূচীত হয়। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে খেলাফত কমিটি গঠিত হলে মওলানা শওকত আলী এর সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এক বছর খেলাফত ইশতেহার প্রকাশনায় ও তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত* , পৃ.২৪৪)

মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ এবং অক্সফোর্ড এ অধ্যয়ন শেষে রামপুর শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১১ই জানুয়ারি তিনি *কমরেড* পত্রিকা প্রকাশ করেন। কানপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্দোলন এবং প্যান ইসলামী আন্দোলনে

তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইউরোপ খেলাফত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগ ১৯২০ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯২১-২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী ১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানদেরকে যোগদান না করার আহবান জানান। ১৯৩০-১৯৩১ সালে তিনি গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৩)

৫০. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮

৫১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত* ,পৃ.২১৯

৫২. মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিদের একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া তিনি এ নীতির ভিত্তিতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. ১৫৭-১৭৪)

৫৩. খেলাফত আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। যারা কারও প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের খলিফা বলা হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নবীজী মোহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর পর থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর মৃত্যু পর্যন্ত সময় কালকেই প্রকৃত খেলাফত বা ‘খোলাফায়ে রাশেদীন’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই খেলাফত রক্ষার জন্য সমগ্র উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন-পরিচালনা করা হয়।(*https://www.wordnik.com/words/khilafat)*

৫৪. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৫৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১০

৫৬. Shila Sen, *Ibid*, p. 50

৫৭. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

৫৮. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত* , পৃ.১৯

৫৯. চৌরিচৌরা ঘটনা ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরায় জনতার একটি শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। কিন্তু পুলিশের গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা থানার মধ্যে আশ্রয় নেয়। উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নি সংযোগ করে পুলিশ বাহিনী বাইরে এলে তাদের ২২ জনকে

হত্যা করে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় মর্মাহত হলে একই মাসের ২৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধী বারদৌলী প্রস্তাব অনুসারে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*,বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯৪-৯৫), আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, জে কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

৬০. ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫, ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীর চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬০-১৬১

৬১. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক, রাজনৈতিক নেতা। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন তার রাজনৈতিক মন্ত্রশিষ্য। ত্যাগ ও দানশীলতার জন্য তাকে দেশবন্ধু নামে আখ্যায়িত করা হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে মিলে 'স্বরাজ পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় তিনিই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-১০৬)

৬২. স্বরাজঃ ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের অদ্বিতীয় লক্ষ্য রূপেই স্বরাজ আন্দোলনের উদ্ভব। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী ইউনাইটেড কিংডম বা তার উপনিবেশগুলোর ন্যায় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।(অমলেশ ত্রিপাঠী, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (অনুবাদ নির্মল দত্ত)*, আনন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯১, পৃ. ১২৮।)

৬৩. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে স্যার আব্দুর রহিম, মৌলবী আবদুল করিম ,মৌলবী মুজিবর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ মুসলমান নেতা ও জে এম সেনগুপ্ত, শরৎ চন্দ্র বসু, জে এম দাসগুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ হিন্দু নেতাকে নিয়ে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা হিন্দু-মুসলিম চুক্তি করেন। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪)

৬৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, ৩১-৩৬, ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, পৃ. ৩৩০-৩৩১

৬৫. Rana Razzaque, *Ibid*, p.119

৬৬. ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনার সময় কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যগণ জমিদারদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এ আইনে প্রজাদের জমি বিক্রয়ের অধিকার স্বীকার করা হলেও

জমিদারদের অগ্রিম ক্রয় অধিকার দিয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের দেয় অধিকার হরণ করা হয়। (এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯)

৬৭. ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশে একটি কমিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু এ কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে 'সাদা কমিশন' বলে বিদ্রূপ করে বর্জন করে। অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশের সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জন্য কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এটাই 'নেহেরু রিপোর্ট 'নামে পরিচিতি। এই রিপোর্ট উপমহাদেশের জন্য ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সিন্ধু ও কর্নাটক প্রদেশের সৃষ্টি, বাংলা ও পাঞ্জাবে সংরক্ষিত শাসন প্রথা বিলোপ প্রভৃতির প্রস্তাব করা হয়। (অধ্যাপক সমর কুমার মলি- ক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ ১৮৫৭-১৯৪৭*, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৫২৭-৫২৮)

৬৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১-৪৫, এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫-২৬, Rana Razzaque, *Ibid,* P.119

৬৯.স্যার আব্দুর রহিম (১৮৬৭–১৯৫২) মেদিনীপুর জেলার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। ১৯২৯ সালে গঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হলে তিনি এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি এ দলের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে স্যার আব্দুর রহিম ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সভাপতি হন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। (বাংলাপিডিয়া, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি. ঢাকা, ২০০৩, পৃ .২২৬-২২৮)

শিক্ষাবিদ, লেখক, জাতীয়তাবাদী কর্মী মৌলবী আবদুল করিম (১৮৬৩- ১৯৪৩) সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে জামালপুরে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সহ-সভাপতির দায়িত্ব পান এবং ১৯১৯ সালে মুসলিম ছাত্র সম্মেলন এবং ১৯৩০ সালে 'কলকাতা প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ' সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাছাড়া ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হন। (ওয়াকিল আহমদ, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৮)

কৃষক রাজনীতির বলিষ্ঠ কর্মি খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৬ – ১৯৪৬) বর্ধমান জেলার কাশিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে সিভিল সার্ভিসে সাব ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯২৯ সালে আইনজ্ঞ স্যার আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। সভাপতির সাহায্যকারী পাঁচজন সহ-সভাপতির একজন ছিলেন তিনি। ১৯৩৪ সালে স্যার আবদুর রহিম ভারতীয় আইন সভার স্পিকার হন। ফলে পরবর্তী সভাপতির প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হলে বিদায়ী সভাপতি খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। মূলত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষক রাজনীতির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। (বদরুদ্দিন উমর, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮০-৩৮১

ড. আবদুল-াহ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা ও লন্ডনে অধ্যয়ন শেষ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি 'টেগোর আইন অধ্যাপক' হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লন্ডন প্যান ইসলামিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন। (Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal (1927-1936)*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, P. 200)

মুজিবুর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর *দি মুসলমান* পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রথমে এর ম্যানেজার এবং পরবর্তীতে সম্পাদক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। বাংলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯২১ সালে গ্রেফতার হন। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে নিখিল ভারত সাংবাদিক কমিটির প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (*সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*,ঢাকা, ২০ জানুয়ারি, ২০১২, সম্পাদকীয় পাতা)

৭০. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৭*, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ঢাকা , ১৯৯৭, পৃ. ৬৫

৭১. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪

৭২. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৫৬, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭

৭৩. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৫, Kamruddin Ahmed, *A Social Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh,* Dhaka, 1975, P.30

৭৪. 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' গঠিত হয় ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে যেখানে মওলানা আকরম খাঁ নবগঠিত পার্টির অন্যতম সংগঠন ছিলেন। তিনি খান বাহাদুর আজীজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭), হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), মৌলবী আবুল হোসেন, শামসুদ্দিন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯) প্রমুখের সঙ্গে এ পার্টির গঠনতন্ত্র কমিটির সদস্য হিসেবে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁদের রচিত খসড়া গঠনতন্ত্রই পরবর্তীতে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির গঠনতন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়। (মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ,আষাঢ়, পৃ. ৬৬১-৬২, উদ্ধৃত এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫০)

৭৫. Rana Razzaque, *Ibid* p. 120-121

৭৬. মোহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ২৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর হন এবং আমৃত্যু এ পদেই বহাল থাকেন। তবে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুকডিপো, ঢাকা, পৃ. ১৭৫-১৯৯)

৭৭. কমিউনিজম একটি মতাদর্শের নাম যার রাজনৈতিক রূপ হল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি পৃথিবীর সব দেশেই কমিউনিস্ট দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কমিউনিস্ট দল মূলত কমিউনিজম ভাব ধারার একটি রাজনৈতিক দল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। যার মূল ভিত্তি হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কমিউনিস্ট পার্টিকে বলা হয় শ্রমিক শ্রেণির অগ্রবাহিনী, তার সংগঠক ও পরিচালক। (এম আর চৌধুরী, *আবশ্যকীয় শব্দ পরিচয়* , ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৯)

৭৮. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

৭৯. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০

৮০. *Government of India Home Political File* 129/37; Return Showing the Result of Elections in India 1937, Command Papers (end.5589) উদ্ধৃত Shila Sen, *Ibid*, P. 88-89

৮১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ৮০-৮২, ৯০ A.S.M Abdur Rab, *A.K Fazlul Haq: Life and Achievement*, Barisal, 1966, P. 58-61

৮২. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৮৩. *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ৭ মে, ১৯৩৭, , পৃ. ৫, ২৮ শে জুলাই, ১৯৩৭, পৃ. ৫। উদ্ধৃত এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৮৪. মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬-৩৭

৮৫. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ৯৩-৯৪, *Star of India*, Calcutta, 17 October,1937, উদ্ধৃত Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal: (1937-1947*), New Delhi, 1976, P.100

৮৬. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৮৭. *Bengal Legislative Council Debates*, Vol. 11 29th July-16th August, 1937, P. 181-182, *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ২২-২৯ মার্চ, ১৯৩৮, পৃ. ৩-৫, উদ্ধৃত এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬২

৮৮. *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, কলকাতা, ৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯, পৃ.৭

৮৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

৯০. এ টি এম আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮, ১২৩,

৯১. *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ২৬ - ২৮ শে মার্চ, ১৯৪১, পৃ. ৩-৪, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, পৃ. ৩,৫

৯২. *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২, পৃ. ৩

৯৩. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

৯৪. *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ১৯ শে নভেম্বর, ১৯৪৪, উদ্ধৃত সিরাজ মান্নান, *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৬-১৫৮, ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২-৩৩

৯৫. ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩-১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তার শাসনকালে ভারতীয় স্বরাজের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেন। ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা

হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে সে গুলোর সমাধানে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। (*http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3446500620/wavell-lord.html)*

৯৬. The Vicery broadcast on 14 June 1945 উদ্ধৃত Shila Sen, *Ibid*, P. 201

৯৭. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ–দ্বিতীয় খন্ড*,(ঢাকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫২

৯৮. Shila Sen, *Ibid*, P. 198

৯৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

১০০. *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ১১ জুন, পৃ. ৩, ১৯শে মে-জুন, পৃ. ৩, ২২ শে জুন, পৃ. ২, ৪ঠা জুলাই, পৃ. ২, ২রা জুলাই, পৃ. ৬, ১৫ই জুলাই, পৃ. ২, ১৯৪৭,উদ্ধৃত এ টি এম আতিকুর রহমান , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

১০১. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৩

১০২. রেজওয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩-৫৪,

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার পায়রা মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত বাংলা পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তার গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। এই মহান ব্যক্তি ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ঢাকায় পরলোক গমন করেন। (ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৪২৩-৪২৪*)*

ড. এনামুল হক (১৯০২ – ১৯৮২) ছিলেন বাঙালি শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ও সাহিত্যিক। ১৯৪৮ সালের ৯ই মার্চ এক সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৪ সদস্যের একজন সদস্য হিসেবে ড. এনামুল হক এই কমিটিতে যোগদান করেন। তিনি সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত হয়ে আছেন বাংলা একাডেমীর অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তাছাড়া তিনি ১৯৫৬ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (*দৈনিক আমার দেশ*, ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০)

১৯৪৮ সালের ৯ই মার্চ গঠিত উচ্চ পর্যায়ের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ভাষা কমিটির একজন সদস্য প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮)। উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার অন্তর্গত বিরামদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং একই সালে বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (ময়মনসিংহ-২) নির্বাচিত হন। (মহাম্মদ দানীউল হক,বাংলাপিডিয়া, *বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪২০)

১০৩. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

১০৪. বাংলা একাডেমি ভাষা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫) ঢাকার বর্ধমান হাউসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং এ দেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ ও আত্মপরিচয় বিকাশের প্রেরণায় এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। (বাংলা পিডিয়া, *বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞান কোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৩৩৯-৩৪০)

১০৫. বশীর আল হেলাল, *বাংলা একাডেমীর ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪, ৩৫, ১২৮, ১৪৮, ২১২

১০৬. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৮ই আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ. ১

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২)

পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। তবে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কৃষক রাজনীতির আঞ্চলিক ধারায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। এজন্য পূর্ববাংলার আঞ্চলিক রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা বা তাঁর আঞ্চলিক নেতা হিসেবে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে অবদান বা ভূমিকা মূল্যায়ণ করা আবশ্যক। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মূলত কৃষক রাজনীতির ইতিহাসে বেশি আলোচিত ব্যক্তি কেননা বাংলার অবহেলিত শোষিত কৃষক প্রজাকূলকে তাঁর ডাল-ভাতের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। ফজলুল হক ভারতের ইতিহাসে কৃষক সমাজকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে সমর্থ হন। [১] বাংলার কিংবদন্তী নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সনের ২৬ অক্টোবর, বাংলা ১২৮০ সনের ৯ই কার্তিক বরিশালের রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মা বেগম সৈয়দুন্নেছা এবং বাবা উকিল মুহম্মদ ওয়াজেদ একজন ভূস্বামী ছিলেন। বিত্তশালী পিতার একমাত্র পুত্র হিসেবে প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়েছেন। শৈশবকাল থেকেই ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। বরিশালে ছাত্রজীবনে বাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ফজলুল হক ১৮৮১ সনে ঐতিহ্যবাহী বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে অধ্যয়ন কালে ফজলুল হক বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত ও অঙ্কে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা গমন করেন। ১৮৮৯ সনে ফজলুল হক প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই কৃতিত্বের সাথে এম. এ পাশ করেন। [২] ১৮৯৬ সনে খুরশীদ তালাত বেগমের সাথে ফজলুল হকের বিয়ে হয়। আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৯৭ সনে রিপন কলেজ থেকে বি এল পাস করেন। [৩] তিনি ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর কলকাতায় ছিলেন। এ সময় তিনি লেখাপড়া ও ওকালতির শিক্ষানবীশ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ফজলুল হক ছাত্র জীবন থেকেই সচেতন ছিলেন তাই কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী আন্দোলন, কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড, আলীগড় আন্দোলন, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে মুসলিম পূণর্জাগরণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করে। [৪] ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি পিতা মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজেদ মৃত্যুবরণ করলে

বরিশালে আগমন করে এবং বরিশাল বারে যোগদান করেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। [৫] এ সময় তিনি ফজলুল হককে পৌরসভার কমিশনার পদে প্রার্থী হওয়ার আহ্বান করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জেলা বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সদস্য নির্বাচিত হন। এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে। বরিশালে থাকাকালে তিনি জমিদারদের প্রজাপীড়ন ও মহাজনদের শোষণ দেখেছিলেন। এজন্য তিনি বাংলার ঋণগ্রস্থ কৃষকসমাজকে অর্থনৈতিক মুক্তি দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। [৬]

১৯০৫ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ এবং প‎ি‎মবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠন করেন। [৭] নবাব স্যার সলিমুল-াহ (১৮৭১-১৯১৫) বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। [৮] কংগ্রেস ও মুসলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গের বির‍ুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুর‍ু করে। [৯] ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিক থেকে নানা কারণে উপমহাদেশের মুসলমানরা শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির মূল প্রবাহ থেকে প্রতিবেশী হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলমান সংখ্যাগুর‍ু হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার অসম বিকাশের দর‍ুণ সরকারি চাকরি, রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়। [১০] নতুন প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ববাংলা অঞ্চলের জনগণের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে ভেবে যুবক ফজলুল হক বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হিসেবে বরিশালের খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে নবাব স্যার সলিমুল-াহর পাশে এসে দাঁড়ালেন। [১১] নবাব সলিমুল-াহ লর্ড কার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য ঢাকায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। [১২] বরিশাল থেকে এ কে ফজলুল হক এই সম্মেলনে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ তাঁর মানস গঠনে দার‍ুণভাবে প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন শুর‍ু হয়। [১৩] ফজলুল হকের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ১৯০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গের ফলে নবাব সলিমুল-াহ উপলব্ধি করেন মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সংগঠন দরকার। তিনি ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল

কনফারেন্স আহ্বান করেন। বরিশাল থেকে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে আবুল কাশেম ফজলুল হক ও নুরুল হক চৌধুরী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের কার্যবিবরণী লেখার ভার ছিল ফজলুল হকের ওপর। [১৪] তিনি সম্মেলনে মুসলিম শিক্ষার ওপর বক্তব্য পেশ করেন। এ সম্মেলনে স্যার সলিমুল-াহ মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। [১৫]

চাকুরিকালীন সময়ে তিনি খুব কাছ থেকে কৃষক প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা অবলোকন করেন। আশুতোষ মুখার্জির (১৮৬৪-১৯২৪) পরামর্শে চাকরি ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা ও রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক ১৯১১ সালে ঢাকা ত্যাগ করেন। [১৬] কংগ্রেসের দাবীর প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রিত করে বাংলা প্রদেশ গঠন করেন। কেন্দ্রিয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল-ীতে স্থানান্তর করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভেঙে পড়েন, বিশেষ করে স্যার সলিমুল-াহ খুবই ব্যথিত হন।[১৭] মুসলিম সমাজের এরকম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মূহুর্তে স্যার সলিমুল-াহর একান্ত অনুরোধে ১৯১২ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন। তখন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল-াহ এবং সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার খান বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। [১৮] ১৯১২ সনের ৩১ জানুয়ারি এ কে ফজলুল হক নবাব সলিমুল-াহর নেতৃত্বে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো দাবি উত্থাপন করেন। [১৯] ১৯২২ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের পদ শূণ্য থাকায় নবাব স্যার সলিমুল-াহ ও বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধে ফজলুল হক প্রার্থীতা করে জয়ী হন। ১৯১৩ সালে আইন পরিষদে প্রবেশ করে ফজলুল হক সরকারের বঙ্গভঙ্গ রদ করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানের প্রতি অবিচার ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। [২০] বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হওয়ায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রাজনেতিক চেতনার জোয়ার আসে। বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত সৃষ্টি ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পিছনে ফজলুল হকের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরবর্তীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাথে

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিরোধ বাঁধে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ঢাকায় কয়েকবার মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সলিমুল-াহর নির্দেশে ফজলুল হক ১৯১৪ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। একই দিনে ফজলুল হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসময় তিনি কেন্দ্রিয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কমিটির মতবিরোধ দূর করতে সমর্থ হন। ১৯১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার সলিমুল-াহর মৃত্যুর পর ফজলুল হক কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। [২১]

১৯১৪ সালে ফজলুল হক নিখিল ভারত কংগ্রেস দলে যোগ দেন। পাশাপাশি মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। এসময় তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনে এগিয়ে আসেন। তাঁর এই উদ্যোগের ফলে ১৯১৬ সালে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদিত হয়।[২২] তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌচুক্তি সম্পাদনে বাংলার নেতৃত্ব দেন। এই চুক্তির পর ফজলুল হকের সুখ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলস্বরূপ ১৯১৮ সালে আবুল কাশেম ফজলুল হক নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে দিল-ীর কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি প্রতিবেদন পেশ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। [২৩] ১৯১৬ সালে তিনি প্রেস আইনের বির“দ্ধে অবস্থান নিয়ে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। [২৪]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর“ হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ক স্বীয় স্বার্থে জার্মানির পক্ষ হয়ে মিত্র শক্তি ব্রিটিশ ফ্রান্সের বির“দ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়। সেভার্স চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। [২৫] ভারতীয় মুসলমানদের মনে এতে দার“ণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ তুরস্ক খেলাফত তৎকালীন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, একতা ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক রূপে গণ্য ছিল। সেজন্য ভারতের মুসলমানরাও খেলাফতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং সুলতানকে নিজেদের ধর্মীয় নেতারূপে সম্মান করত। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ পূর্ব প্রতিশ্র“তি

ভঙ্গ করে ভারতীয় মুসলমানদের মনে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে। মুসলমানরা খেলাফতের সম্মান ও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা ও সরকার বিরোধী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ সময়ে বোম্বাইয়ে ড. আনসারীর নেতৃত্বে খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। [২৬] ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর খেলাফত দিবস পালিত হয়। বাংলার আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ফজলুল হক ও মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী পূর্ব বাংলা অঞ্চলে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলেন। [২৭] ১৯১৯ সালে এ কে ফজলুল হক 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র সভাপতি এবং নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির সম্পাদক ছিলেন। [২৮] ১৯২০ সালে ফজলুল হক কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এবং নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। একই বছর ১২ ডিসেম্বর ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অসহযোগ আন্দোলনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং প্রধান বক্তা এ কে ফজলুল হক। [২৯] এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে জনসাধারণকে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। মহাত্মা গান্ধী এ সময় ভারতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার।[৩০] তিনি আমন্ত্রণ পেয়ে দিল-ীতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে খেলাফতের দাবি ও অসহযোগ নীতিকে সমর্থন করেন। [৩১] অসহযোগের নীতির প্রশ্নে ফজলুল হককে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয়। [৩২] খেলাফত আন্দোলন সাফল্যের সাথে চলছিল এবং এর সাথে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করছিল। তবে খুব কম সময়ের ব্যবধানে গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে। [৩৩] উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানার পুলিশ হত্যার মতো সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে খেলাফত আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। অপরদিকে কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) কর্তৃক তুরস্ক থেকে রাজতন্ত্র ও খেলাফতের অবসান ঘোষণা করলে স্বভাবতই ভারতসহ সকল স্থানে খেলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। [৩৪] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (সি আর) দাস ছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার

জন্য দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গালি নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা বাংলা চুক্তির পরিকল্পনা করেন। এই চুক্তি সম্পাদনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। [৩৫] ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মতিলাল নেহের্ র সঙ্গে একযোগে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। [৩৬] ১৯২৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ্য পার্টি' নির্বাচনে সফল হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার সদস্য হন এ কে ফজলুল হক। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। [৩৭] ভারতবাসীর শাসনতান্ত্রিক বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯২৭ সালের ৩ ফেব্র্ য়ারি 'সাইমন কমিশন' ভারতে আগমন করলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'সাইমন কমিশন' সমর্থন করেন। [৩৮] ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা নির্ধারণ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য লন্ডনে ১৯২৯-৩০ সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক এবং ১৯৩১-৩২ সালে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হলে উভয় বৈঠকে এ কে ফজলুল হক অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। [৩৯]

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জীবনের শুরু থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে পূর্ববাংলার রাজনীতির সাথে কতটা সংশি- ষ্ট ছিলেন সেটির বিশে- ষণই এই অভিসন্ধর্ভের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে প্রজা বা কৃষক আন্দোলনই মূল আলোচ্য বিষয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মূলত একজন কেন্দ্রিয় পর্যায়ের নেতা ছিলেন তবে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তাঁর প্রজা আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলনে যে ভূমিকা রয়েছে সেটিই মূখ্য হিসেবে ধরা হয়। ফজলুল হক বরিশালে ওকালতি ও জামালপুরের চাকরি জীবনে কৃষকদের উপর জমিদার মহাজনদের অত্যাচার নির্যাতন খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তিনি প্রথম 'প্রজা আন্দোলন' শুর্ করেন তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তিনি মূলত প্রজাদের ওপর জমিদার মহাজনদের নিপীড়ণ চিরতরে বন্ধ ও তাদের ডাল-ভাতের সংস্থান করার নীতিকে ভিত্তি করে ১৯১৪ সনে 'প্রজা আন্দোলন' শুর্ করেন। [৪০] আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর আহ্বানে গ্রামে গঞ্জে প্রজা সমাবেশ হয়। তাঁর নির্দেশে ১৯১৪ সনে খোশ মুহম্মদ চৌধুরী জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে এক কৃষক প্রজা সম্মলেনের আয়োজন করেন। [৪১] এ সম্মলেনে সভাপতিত্ব করেন এ কে ফজলুল হক। তিনি

তাঁর অভিভাষণে কৃষক প্রজাদের তাদের দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। জামালপুরে চাকরি জীবনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একদিন তিনি প্রজাদের জমিদারদের নিপীড়ণ ও মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করবেন এবং তিনি সেই জামালপুর থেকেই প্রজা আন্দোলনের ডাক দিলেন। [৪২] ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন চালু করার পর ফজলুল হক বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি সংগঠিত করেন। [৪৩] তিনি এবং বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্যান ইসলামী স্লোগান বা সংখ্যালঘুর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন না। [৪৪] তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম মুসলমানদের স্বার্থদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত মনোভাব থেকেও মুক্ত ছিলেন। 'কৃষক প্রজা পার্টি' ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন যা শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফজলুল হকসহ এই দলের নেতারা প্রধানত নব্য উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছিলেন। বস্তুত অনেক হিন্দু জোতদার শ্রেণির লোকও এই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। এই সব নেতারা কৃষক প্রজা পার্টিকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন। মূলত কৃষকদের সমস্যাগুলোকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করার জন্যই তিনি বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশ, সম্মেলন করেছেন। [৪৫] ১৯২১ সালে বরিশালের অগৈলঝরায় তাঁর নির্দেশে কৃষকদের এক স্মরণীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে। [৪৬] ১৯২৪ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রজা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। ইতোপূর্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রজা আন্দোলন চলছিল। তবে তাদের কোন কেন্দ্রিয় সংগঠন ছিল না। ঢাকার সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি যোগ দেন এবং এ সম্মেলনে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করা হয়। ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলার জমিদার ও মহাজনেরা দেনার দায়ে ও চক্রবৃদ্ধি সুদের বিনিময়ে স্থানীয় কৃষকদের খাস জমি প্রায় সবই কেড়ে নিয়েছিল। ফলে কৃষক প্রজা ও জমিদার মহাজনদের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়, শুরু হয় তুমুল প্রজা আন্দোলন। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে আয়োজিত হয় বিরাট 'প্রজা সম্মেলন'। পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের সভাপতি আবুল কাশেম ফজলুল হক, সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন "জমিদারদের নির্দেশ ছাড়া যাতে আপনারা আপনাদের জমি চাষাবাদ করতে পারেন, যাবতীয় মানবিক অধিকার ভোগ করতে পারেন এবং যাবতীয় অতিরিক্ত আদায় বা

আবোয়াব না দিতে হয় আমি সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের আমার একটি কথা শুনতে হবে। আপনাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমার এই ঘোষণা মানতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে বলছি, জমিদারদের কোন জমি আপনারা চাষাবাদ করবেন না। এবার কর্তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নামুন, ফসল বুনুন। যতদিন আপনাদের জমি উদ্ধার না হয় ততদিন আপনারা জমি চাষ করবেন না।" ফজলুল হকের নির্দেশমতো কৃষক, প্রজা, জমিদার ও সাহাদের কোন জমি চাষ করেনি সে বছর। ফলে বাধ্য হয়ে জমিদার, মহাজনেরা কৃষকদের জমি ছেড়ে দেয়। এজন্যই মূলত মানিকগঞ্জ সম্মেলন প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এ আন্দোলনের সাফল্যে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বাংলার বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে আরো বৃদ্ধি পায়। [৪৭] তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য ১৯২৭ সালে প্রজা সমিতি গঠন করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতায় নিখিল বাংলা প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অনেক মুসলমান কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে প্রজা সমিতিতে যোগ দেন। সম্মেলনে স্যার আব্দুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬), আবদুল করিম (১৮৬১-১৯৪৩), মুজিবর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০) সহ-সভাপতি, মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পাদক, শামসুদ্দিন আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৯) ও তমিজউদ্দিন খানকে (১৮৮৯-১৯৬৩) যুগ্মসম্পাদক করে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করা হয়। [৪৮] এভাবে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষ বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পাশে কংগ্রেস এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হয়। [৪৯] ১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলনের গতিশীল পর্যায় শুরুর পর ১৯৩০ সালের মধ্যেই প্রজা সমিতি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলার সকল কৃষক নেতার অসাধারণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। [৫০] ১৯৩৪ সালে ঢাকায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বিরোধী দল নির্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনই পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রজা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ কে ফজলুল হক। ডাঃ আর আহমেদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৮-১৯৭৪), আশরাফ আহম্মদ চৌধুরী, (১৮৯৩-১৯৭৫) শামসুদ্দিন আহমেদ(১৮৮৯-১৯৬৯), আবুল

মনসুর আহমদ(১৮৯৮-১৯৭৯), সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০-১৯৭২) প্রমুখের সমর্থনে এ কে ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি এবং শামসুদ্দীন আহমেদ সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। [৫১]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সম্প্রদায় ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক প্রজা। [৫২] তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলে বঙ্গীয় আইন সভার ২৫০টি আসনের অধিকাংশ আসনে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে কৃষক সমাজ বাস্তবিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এ কে ফজলুল হক কৃষক সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার অবহেলিত শোষিত কৃষক-প্রজা সাধারণ ফজলুল হকের ডাল-ভাতের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় এবং শক্তিশালী সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করে। ফজলুল হক ভারতের ইতিহাসে কৃষক সমাজকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলতে সমর্থ হন। [৫৩] ১৯৩৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র চতুর্থ সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলার সংগ্রামী জননেতা মৌলবী এ কে ফজলুল হক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বিভিন্ন জেলা হতে শত শত মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মীসহ হাজার হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক, ডা. আর আহমদ, আবদুল হামিদ খান ভাসানিসহ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। [৫৪] এ সময় হক সাহেব তাঁর ভাষণে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা, ঋণ সমস্যা, কৃষক আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা ঋণ সালিশী বোর্ডের উপকারিতা, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আয় বৃদ্ধির উপায়, খাজনা সমস্যা, নতুন শাসন সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। [৫৫] তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি মাত্র শ্রেণিতে পরিণত হয়। [৫৬]

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হবার ফলে বাংলার মুসলমান নেতাগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ভারত শাসন আইনের বলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলা প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ও জনগনের অবস্থা উন্নতির সুযোগ দেখতে পান। এসময় বাংলায় মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। তখন স্যার আব্দুর রহিম প্রতিষ্ঠিত

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি একমাত্র সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইতোমধ্যে এই দলের শীর্ষ নেতায় পরিণত হন এ কে ফজলুল হক। 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র নাম এ সময় পরিবর্তন করে কৃষক প্রজা পার্টি রাখা হয়। সংসদীয় ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কৃষকদের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধনই ছিল দলটির প্রধান লক্ষ্য। কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনী কর্মসূচী হিসেবে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে।

কৃষক প্রজা পার্টির ১৪ দফা কর্মসূচী

১। ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি প্রথা বিলোপ,

২। প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন,

৩। খাজনা ও ঋণ মওকুফ,

৪। নজর ও সেলামি এবং আবওয়াব বাতিল,

৫। মহাজনী আইন বাতিল

৬। ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪% হারে কৃষকদের ঋণ প্রদান, পাট চাষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ।

৭। কৃষকদের জন্য সুদ মুক্ত ঋণ চালু,

৮। খাল খননের মাধ্যমে সেবা সুবিধা সৃষ্টি,

৯। প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন

১০। পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন

১১। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু

১২। শাসন ব্যয়হ্রাস

১৩। মন্ত্রীদের বেতন ১০০০ (এক হাজার) টাকায় নির্ধারণ এবং

১৪। সব নিষ্পেষণ মূলক আইন বাতিল ও রাজবন্দির মুক্তি।

১৯৩৭ সালে বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পরিকল্পনা সামনে নিয়ে 'কৃষক প্রজা পার্টি' নির্বাচনে নামে। নির্বাচনের প্রাককালে এ দল জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। ফজলুল হকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও জনসাধারণের জন্য তাঁর অকৃত্রিম দরদবোধ ছিল এ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।[৫৭] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা কার্যত

মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দ কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের নেতা এ কে ফজলুল হকের নাম বাংলার কৃষকদের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হত। তাঁর জনপ্রিয়তাই ছিল প্রজাপার্টির মূলধন। অপরদিকে মুসলিম লীগ ছিল জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এবং এ দলের নেতা মওলানা আকরম খাঁ ছাড়া অন্য কোন লীগ নেতা গ্রামের কোন জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করতে পারতেন না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম লীগ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে। এ সাফল্যের মূলে ছিল প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার কর্মসচিব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা।[৫৮] ১১৯টি সংরক্ষিত মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৮টি, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪১টি আসন পায়। খাজা নাজিমুদ্দিন নিজের জমিদারি পটুয়াখালীতে এ কে ফজলুল হকের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থীদের কেউ কেউ মুসলিম লীগে ও কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেয়। এর ফলে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ৫৯ জন এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ৫৫ জন।[৫৯]

মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে প্রথম থেকেই সমস্যা দেখা দেয়। কারণ পরিষদে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। গভর্নর প্রথমে কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে ডাকেন।[৬০] কিন্তু শরৎ বসু কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে সম্মত হলেন না। তিনি ফজলুল হককে সমর্থনের আশ্বাস দেন। সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে নারাজ ছিল। যদিও মাদ্রাজ, বোম্বে ও যুক্তপ্রদেশে তারা লীগের সঙ্গে আপোস করে নির্বাচন করে। কিন্তু তাদের নিকট বাংলার রাজনীতি ছিল ভারতের রাজনীতি থেকে ভিন্ন ধরনের। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তারা ফজলুল হককেই যোগ্য বিবেচনা করে। ফজলুল হককে সমর্থনের বিনিময়ে কংগ্রেস সন্ত্রাসবাদীসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে। ফজলুল হকের পক্ষে এ শর্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হিন্দু নেতাদের অদূরদর্শিতা ও অনুদারতা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব আরও প্রসারিত করে। কংগ্রেসের

নেতাদের অনমনীয় মনোভাবই শেষ পর্যন্ত ফজলুল হককে সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনে বাধ্য করে। এতে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ প্রাধান্য অর্জনের সুযোগ পায়। [৬১] এভাবেই ফজলুল হকের প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ফজলুল হকের এগার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার সদস্য নিচে প্রদত্ত হলো –

মন্ত্রীদের নাম (নিজ দলের নাম)	দপ্তর
এ কে ফজলুল হক (কৃষক প্রজাপার্টি)	প্রধান মন্ত্রী (শিক্ষা)
খাজা নাজিমুদ্দিন (মুসলিম লীগ)	স্বরাষ্ট্র
হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (মুসলিম লীগ)	বাণিজ্য
নবাব হাবিবুল-াহ (মুসলিম লীগ)	কৃষি, শিল্প
সৈয়দ নওশের আলী (কৃষক প্রজাপার্টি)	স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
নবাব কাজী মোশারফ হোসেন(কৃষক প্রজা সমিতি)	বিচার ও আইন
নলিনীরঞ্জন সরকার, (বর্ণ হিন্দু)	অর্থ
বি পি সিংহ রায় (বর্ণ হিন্দু)	রাজস্ব
মহারাজা শিরীষ চন্দ্র নন্দী	পূর্ত
মুকুন্দ বিহারী মলি-ক (তফসিলি)	সমবায়, কৃষি ঋণ
প্রসন্নদেব রায় (তফসিলি)	বন ও আবগারি

মন্ত্রীসভা গঠন করার পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক নানামুখী ১৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি সরকারি দফতরে ৫০% আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেন। [৬২] এতে হিন্দুদের প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পায়। ফজলুল হক পরিচালিত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বাংলার মুসলমানদের মনে চেতনাবোধ ও আত্মবিশ্বাস আনয়ন করে। তাঁর তিন বছরের শাসনকালে তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার বহু বিপ-বী এ সময়ে ছাড়া পায়। দোকান কর্মচারীদের

স্বার্থে আইন, সালিশী বোর্ড, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন পাশ করেন। এর ফলে বাংলার কৃষক প্রজা ও কৃষি খাতকদের জীবনে শুভ সূচনা হয়। [৬৩] ফজলুল হক 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ও ভূমি রাজস্বের নিরিখ করার ব্যবস্থা করেন। [৬৪] তাঁর মন্ত্রীত্বকালে ঢাকার কৃষি কলেজ ও বরিশালের চাখার কলেজ স্থাপিত হয়। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষক প্রজা সাধারণ বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য এ সময়কে স্বর্ণযুগ বলা যায়। [৬৫] মোহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয় এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানো হয়। [৬৬] ফজলুল হক এই প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় নিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতান্তর ঘটে। তাছাড়া দুই নেতার রাজনৈতিক জীবনের নীতিগত বৈষম্য ছিল। এই সময় মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে পদচ্যুত করার। ১৯৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর 'মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দল' গঠন করে খাজা নাজিমুদ্দিনকে নেতা নির্বাচিত করে। [৬৭] এ সিদ্ধান্তের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফজলুল হক 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ' গঠন করেন। নানা রকম অভিযোগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ১০ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর মুসলিম লীগের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ফজলুল হক ১৭ ডিসেম্বর ৯ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ডা. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি নির্বাচিত হন উপনেতা। [৬৮] শ্যামা-হক দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ নীচে প্রদত্ত ঃ

মন্ত্রীদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর
এ কে ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রী)	স্বরাষ্ট্র ও প্রচার
ডা. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি	অর্থ ও পরিকল্পনা
নবাব হাবিবুল-াহ	কৃষি ও শিল্প
শামসুদ্দিন আহমেদ	যোগাযোগ ও গণপূর্ত

আবদুল করিম	শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম
খান বাহাদুর হাশেম আলী	কৃষি ও পল-ী উন্নয়ন
প্রমথ নাথ ব্যানার্জী	রাজস্ব, বিচার ও সংসদ
সন্তোষ কুমার	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
উপেন্দ্রনাথ বর্মন	বন ও আবগারি

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার বির―দ্ধে মুসলিম জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিত্বশালী ও সাহসী নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সমগ্র বাংলায় সফর করলে দলের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এ সময়ে হক মন্ত্রীসভার কিছু কিছু অদূরদর্শিতাসহ রাজনৈতিক ভুলের কারণে মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা দ্রুত কমতে থাকে। তাই দ্বিতীয় বার মন্ত্রীসভা গঠনের পর অনেক বাঁধার মধ্যে দিয়ে এ কে ফজলুল হককে এগুতে হয়েছে। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তাঁর মন্ত্রীসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা আখ্যা দেয় এবং তাঁর বির―দ্ধে আন্দোলন শুর― করেন। এই সব কাজে মুসলিম লীগ আবেগপ্রবণ ছাত্রদের ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য হলো সরল বিশ্বাসী মুসলমানদের কাছে ফজলুল হককে অপ্রিয় করে তোলা। ফজলুল হক বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রভাব হ্রাস করতে পূর্ণ উদ্যেগে কাজ শুর― করেন। কারণ মুসলমান ও অমুসলমানদের একতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে তাঁকে অন্যায়ভাবে লীগ থেকে বহিস্কার করায় ফজলুল হক জিন্নাহর বির―দ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করেন। এ সময় তাঁর উদ্যোগে কলকাতা টাউন হলে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত জিন্নাহকে বাঁধা দেওয়ার জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই সম্মেলনের আয়োজন করেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থনও প্রদান করেন। [৬৯] তবে তিনি 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ভিত্তিক পাকিস্তান দাবীর বিরোধী ছিলেন। [৭০] ১৯৪২ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়।[৭১] ১৯৪২ সালেই বঙ্গীয় আইন সভায় সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

এদিকে ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় আইন সভায় ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং উলে- খ করেন যে, যেসব স্থানে পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে সেসব স্থানে তদন্ত হওয়া উচিত। গভর্নর স্যার জন হার্বাট ফজলুল হকের বক্তৃতায় খুব ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ফলে স্পিকার সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০-১৯৭২) আইন সভার সভা স্থগিত ঘোষণা করেন। তাছাড়া দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার বির"দ্ধে মুসলিম জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিত্বশালী ও সাহসী নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সমগ্র বাংলায় সফর করলে দলের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। আইন সভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও মুসলিম লীগ বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নানা কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফজলুল হক খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারেনি এবং সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষের বার্তা লক্ষ্য করা যায়। এসময় তিনি মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য জিন্নাহর সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করেন কিন্তু জিন্নাহর অসহযোগিতা তথা শর্তের জন্য সম্ভব হয়নি। ফজলুল হকের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জিন্নাহ প্রদত্ত শর্ত মানাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া নানা ত্র"টি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ধর্মের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। আবার ধর্মের মৌলিক আদর্শ গ্রহণ করেননি, নিজেকে বাঙালি হিসেবেই আবিষ্কার করেছিলেন। [৭২]

দ্বিতীয় বার ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই আইনসভার ভেতরে ও বাইরে মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো এবং লীগের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা। এজন্য তাঁরা ফজলুল হকের সকল কার্যক্রমে অসহযোগিতা শুর" করে এবং তাঁর বির"দ্ধে নানা রকম কুৎসা রটনা করে। গভর্নর হার্বাটও হক মন্ত্রীসভার সাথে অসহযোগিতা শুর" করে। মূলত ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাই হার্বাট এই মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আইনসভার ৬টি আসনের উপনির্বাচনে হকপন্থীরা পরাজিত হন এবং মুসলিম লীগ সকল আসন দখল করে। মুসলিম লীগের ইউরোপিয় সদস্যরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করে। ১৯৪৩ সালের ২৯মে মার্চ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর

পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কি অবস্থায় এবং কেন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা বর্ণনা করে ১৯৪৩ সালের ৫ জুলাই বঙ্গীয় আইনসভায় 'আমি কেন পদত্যাগ করেছি' এই শিরোনামে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এই ভাষণ বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দলিল স্বরূপ। [৭৩]

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভার আমলে বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের রক্ষার জন্য ফজলুল হক এই সময় একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরই ১৯৪৪ সালে বাংলায় বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়। ১৯৪৫ সালের ৮ই মার্চ বাজেট অধিবেশনে কৃষি খাতে টাকা মঞ্জুরী বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে ৯৭ এবং বিরোধীদলের পক্ষে ১০৬ ভোট পড়ে। এ কে ফজলুল হক বিরোধী দলের নেতা হিসেবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আইনসভায় শক্তিশালী দল গঠন করেন। তাঁর বিরোধিতার ফলেই খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন হয়। ফজলুল হক পুনরায় তাঁর রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেন। [৭৪]

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড ওয়াভেল। [৭৫] ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ কে ফজলুল হক তাঁর দলের নিবেদিত কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ ও বাগেরহাট আসন থেকে প্রার্থী হন। মুসলিম লীগ ফজলুল হককে তাঁর নির্বাচনী কাজে বরিশালের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখতে চায়। কারণ তাদের ভয় ছিল ফজলুল হক যদি বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার চালান তাহলে অনেক মুসলিম লীগ নেতা বিপুল ভোটে পরাজিত হবে। তাছাড়া ফজলুল হককে জনসভা করতে বাঁধা প্রদান এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করা হয়। কিন্তু ফজলুল হক তাঁর সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাতে থাকেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৬ মার্চ নির্বাচনে ফজলুল হক ২৫৩৮৩ ভোট পান যেখানে মুসলিম লীগ প্রার্থী পান ৯৫৯৫ ভোট। এভাবে তিনি বাগেরহাট নির্বাচনী এলাকা থেকেও নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাঁর ভক্ত কৃষক সমাজের কাছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ২৫০ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৫, কংগ্রেস ৮৪, ইউরোপিয় ২০, কৃষক প্রজা ৮, স্বতন্ত্র ও

অন্যান্য দল ২০টি আসন দখল করে। কৃষক প্রজাপার্টি থেকে নির্বাচিত সকল সদস্যই মুসলিম লীগে যোগ দেন। এ কে ফজলুল হক যে বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তা পারলেন না। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিরোধী দলের নেতা হলেন কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়।[৭৬] দুই নেতাই ফজলুল হককে আইন সভার স্পিকার নির্বাচিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু মুসলিম লীগের অধীনে স্পিকার পদ গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তবে বাংলার মুসলিম সমাজ, দলীয় নেতা ও কর্মীদের চাপে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালের ১লা ও ৩রা সেপ্টেম্বর শর্তহীন ভাবে মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদান করেন। ফলে ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠিত কৃষক প্রজা সমিতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। [৭৭]

১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা শুর‍ু হলে ফজলুল হক প্রকাশ্যে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভাকে দায়ী করেন। একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশ বিভাগের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তুলছে এই কথা ভেবে ফজলুল হক ঐক্যবদ্ধ ভারত অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে আরও কিছু দিন ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখার কথা বলেন। ভারত ও বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ১৯৪৭ সালের ২৬ জুলাই ফজলুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এসময় তিনি বাংলা বিভক্তেরও নিন্দা করেন। এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিলেও তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন। 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' হিন্দু ও মুসলমানের জন্য ভারত বিভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টির এবং বঙ্গ বিভাগের বিরোধী ছিল। তাঁরা কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার দাবী করেন।[৭৮] ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ ও ১৬ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতা বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করে এবং ১৮ জুলাই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত করে। এ সময় ফজলুল হক বঙ্গ বিভাগ রোধ করতে না পেরে পূর্ব বাংলার সীমানা নির্ধারনে গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ এ কে ফজলুল হককে সদস্য পদ থেকে বাদ দিতে চায় কিন্তু সকলকে তাক লাগিয়ে ফজলুল হক পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭

সালের ১৪ই আগস্ট পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর এবং লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্যার ফ্রেডারিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং খাজা নাজিমুদ্দিন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। [৭৯]

বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে ফজলুল হক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পরই পাকিস্তানী শাসনবৃন্দ বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ভাষার উপর আঘাত হানে। পূর্ববাংলার একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে ফজলুল হক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার চরম বিরোধিতা করেন। ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর অংশ হিসেবে ঢাকার পুরাতন হাইকোর্ট থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এখানে ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। [৮০] পাকিস্তান সৃষ্টির পরই বাংলা ও বাঙালিদের ওপর নেমে আসে মুসলিম লীগ সরকার ও অবাঙালিদের শোষণ ও নিপীড়ন। ফজলুল হক মুসলিম লীগের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। বলা যায় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে শেরে বাংলা ফজলুল হক ছিলেন বিরাট শক্তি। ১৯৪৯ সালে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে মুসলিম লীগ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফজলুল হক। এই সভারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন প্রায় ৩০০ নেতা ও কর্মীর উপস্থিতিতে বশীর হুমায়ুনের রোজ গার্ডেন বাসভবনে কর্মী সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক ও শেখ মুজিবর রহমানকে যুগ্মসম্পাদক করে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' দল গঠন করা হয় এবং ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। [৮১] আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গে প্রথম গঠিত বিরোধী দল। ফজলুল হক সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সতর্কবানী উচ্চারণ করেন এবং সরকারের প্রতি অবিলম্বে উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। [৮২] উলে-খ্য যে ফজলুল হক বাইরে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করলেও এ সময় তিনি

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কেন্দ্রিয় শাসনতন্ত্র পরিষদে নীরব ভূমিকা পালন করেন। কারণ সেখানে তাঁর কোন সমর্থন ছিল না। [৮৩]

মুসলিম লীগ সরকারের দমন নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৫৩ সালের ২২ মার্চ রোববার ফজলুল হক তাঁর কে এম দাস লেনস্থ বাসভবনে সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করেন। সভায় সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে লীগ সরকারের বির“দ্ধে দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মূলত আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ফজলুল হক বিভিন্ন জেলায় জনসভা করে চলেন। তিনি কৃষক প্রজা সমিতির নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৭ শে জুলাই তাঁর বাসভবনে কৃষক প্রজা সমিতির কর্মীদের এক সম্মেলনে ডাকেন এবং ‘প্রজা’ শব্দ বাদ দিয়ে ‘কৃষক শ্রমিক পার্টি’ গঠন করেন। এই দলের সভাপতি হলেন এ কে ফজলুল হক এবং সম্পাদক হলেন আব্দুল লতিফ বিশ্বাস। [৮৪] দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ আয়োজন করেন যার মাধ্যমে বাংলায় গণ জোয়ারের সৃষ্টি হয়। [৮৫] ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে বামপন্থী ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায় যারা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন তাঁরা নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগের বির“দ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য আন্দোলন শুর“ করেন। [৮৬] এই আন্দোলনের ফলেই এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। এখানে কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষে ফজলুল হক প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের বির“দ্ধে নির্বাচন করে। [৮৭] এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের সকল বাঁধা ও অপপ্রচার উপেক্ষা করে ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজাম-ই-ইসলাম ১৯ টি ও গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট ও এ কে ফজলুল হকের এ গৌরবোজ্জ্বল বিজয় উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পত্র-পত্রিকা বাংলার এই রক্তপাতহীন বিজয় কে ‘ব্যালট বিপ- ব’ বলে আখ্যায়িত করে। [৮৮]

সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সদস্যগণ ফজলুল হককে দলীয় নেতা নির্বাচিত করেন। যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত ছিল ফজলুল হক পূর্ববাংলায় এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেবেন। কেন্দ্রিয় সরকার ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনে নানা অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে তাকে বিলম্বিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানান।[৮৯] ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল মন্ত্রীসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সকলের মধ্যস্থতায় ১৫ই মে পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ-

ইাম	দপ্তর
এ কে ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন, ত্রাণ ও পূণর্বাসন স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি
আবু হোসেন সরকার	অর্থ
আতাউর রহমান খান	বেসামরিক সরবরাহ
আবুল মনসুর আহমদ	জনস্বাস্থ্য
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	বিচার ও আইন
সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন
আবদুস সালাম খান	শিল্প ও শ্রম
শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল-ী উন্নয়ন
আবদুল লতিফ বিশ্বাস	রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার
মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন	জমিদারি অধিগ্রহণ
রাজ্জাকুল হায়দার চেন্ধুরী	স্বাস্থ্য ও জেল
ইউসুফ আলী চেন্ধুরী	কৃষি, বন ও পাট
আশরাফ আলী চেন্ধুরী	সড়ক ও গৃহনির্মাণ

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ২১ দফা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী , আমলারা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি, গণতন্ত্রের বিজয়ে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের যোগ সাজশে ও গোপন অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলে আদমজী নগর, চন্দ্রঘোনায় বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে নতুন মন্ত্রীসভাকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হয়। এছাড়া মুসলিম লীগ নেতারা এক নতুন অজুহাত বের করেন। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতার অপব্যাখ্যা করে তাঁকে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৩১শে মে রোববার পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা বাতিল করে এবং ৯২ (ক) ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন।[৯০] মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ও আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবসহ বহু সাধারণ লোক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। ফজলুল হককেও তাঁর নিজ বাসভবনে নজরবন্দী করা হয়। পূর্ববাংলা থেকে ১৯৫৪ সালের ৩রা জুন ৯২ (ক) ধারা উঠে যায়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। এসময় আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বের হয়ে যায়। ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠন করেনি কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি আবু হোসেন সরকার(১৮৯৪-১৯৬৯) ১৯৫৫ সালের ৬ই জুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ই জুন সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ই জুন মারিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সম্পাদিত ‘মারি চুক্তিতে’ ফজলুল হক স্বাক্ষর করেন। [৯১] ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের কারণে যথাসময়ে স্পিকার নির্বাচন হতে পারেনি তাই ১৯৫৫ সালের ৫ই আগস্ট শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১০ই আগস্ট চৌধুরী মুহম্মদ আলী কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৯২] এ কে ফজলুল হক এ মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার পর দীর্ঘ পর্যায় অতিক্রমের পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত

করেন। এ কে ফজলুল হক গণপরিষদে পাকিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা পরিষদে গৃহীত হয়। নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে এ কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি গভর্নর নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে ফজলুল হক আবার আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীপরিষদকে শপথ গ্রহণ করালেন এবং নিজে শপথ পরিচালনা করলেন। এ সময় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্তফ্রন্ট থেকে বের হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য ঘাটতির সময় আওয়ামী লীগ আবু হোসেন সরকারের বির“দ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। খাদ্য সংকট মোকাবেলা করার জন্য গভর্নর ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের ১১ই জুলাই খাদ্য দপ্তরের ভার সেনাবাহিনীর হাতে দেন। কিন্তু সামগ্রীক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৫৬ সালের ১৩ই আগস্ট আইনসভার অভিবেশন আহবান করেন। ফজলুল হক সংকট উত্তরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলে ১৯৫৬ সালের ৩০শে অক্টোবর আবু হোসেন সরকার গভর্নরের কাছে তাঁর মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ১৯৫৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে (১৯০৭-১৯৯১) মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান করলে ৬ সেপ্টেম্বর নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও তাঁর মন্ত্রীসভা এ কে ফজলুল হকের কাছে শপথ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক জটিলতাঁর কারণে গভর্নর এ কে ফজলুল হক আতাউর রহমানকে পদত্যাগ করতে বলেন। আতউর রহমান পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে গভর্নর এ কে ফজলুল হক ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ তাঁর মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষণা করেন। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রীসভা গঠন করেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে (১৮৯৩-১৯৭০) দিয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির বির“দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ রাতে গভর্নর ফজলুল হককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি হামিদ আলী অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। আতাউর রহমান খান ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল পূর্ববাংলার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হন। তারপর তিনি চিরদিনের জন্য রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। দীর্ঘ ৪৬ বছর রাজনীতি করার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরও ফজলুল হক আমৃত্যু পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম বাংলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৫৭ সালে কঠিন করোনারি থ্রোম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল শুক্রবার জননায়ক শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৯৩]

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক পূর্ববাংলার কিংবদন্তির নেতা। তিনি কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতি তথা সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন। ফজলুল হক আমলাদের কাছে দক্ষ শাসক। আবার তিনি কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। ফজলুল হক স্বাধীন বাংলার যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন তা অনুসরণ করে বাঙালি জাতি মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছে। ফজলুল হক কৃষকদের অবস্থা খুব কাছ থেকে অবলোকন করেই কৃষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আমৃত্যু কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছেন কিছু সময় হয়ত রাজনৈতিক মতদ্বৈততার কারণে কৃষক নেতৃত্ব থেকে দূরে ছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলার কৃষক সমাজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করেছেন। বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলার রাজনীতিকে বাংলার জনগণের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন কারণ রাজনীতি ছিল তখনকার ওপর তলার মানুষের একচেটিয়া সম্পত্তি। জমিদার, ধনী এবং অভিজাত শ্রেণির বৈঠক খানায় যে আলোচনার রাজনীতি ছিল ফজলুল হক সেই বৈঠক খানার রাজনীতিকে গ্রাম বাংলার গণমানুষের দ্বারে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, তাদেরকে ঋণমুক্ত করার জন্য, তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করে প্রকৃত জমির মালিক করার জন্য তিনি যে সমস্ত প্রচেষ্টা করে গেছেন, তারই মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজনীতিকে বাংলার মানুষের মনের কাছাকাছি এবং তাদের বাড়ির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফজলুল হক কৃষক প্রজাকে নিয়েই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন এবং এই শ্রেণির জন্য কাজ করে

গেছেন তবে মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ায় কৃষকদের স্বার্থে তিনি একচেটিয়াভাবে কাজ করতে পারেননি। কৌশল ও নীতিগত মতদ্বৈততার কারণে কৃষকদের দেওয়া ফজলুল হকের প্রতিজ্ঞা সর্বাংশে পালন করতে পারেননি। কারণ মুসলিম লীগের সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর ফজলুল হক শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে মন্ত্রীত্ব টিকে থাকল কিন্তু কৃষক সমাজের বিশেষ কোন উন্নতি হলো না। কৃষক প্রজা পার্টির কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মীদের চাপে পড়ে ফজলুল হক মহাজনী আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করলেও সেটা কৃষকদের অবস্থার ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেনি। সমালোচনায় বলা হয় বাংলার কৃষকদের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং শ্রেণিগত রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। বলা হয় ফজলুল হক ব্যক্তি স্বার্থেই কৃষক রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তবে নানা রকম সমালোচনা থাকলেও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই পূর্ব বাংলার গণমানুষের রাজনীতির পট পরিবর্তন করেছিলেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়ে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে কৌশল ও নীতিগতভাবে দ্বিধান্বিত হয়েছেন কিন্তু আঞ্চলিক নেতা হিসেবে কৃষক-প্রজা সম্মেলন তথা কৃষক প্রজা শ্রেণির স্বার্থের রাজনীতিতে তিনি সফল ভূমিকা পালন করেন। তাই পূর্ববাংলার আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ফজলুল হক সফল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলার অবহেলিত কৃষক প্রজার নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সগৌরবে সমুজ্জ্বল।

প্রান্তটীকা

১. ইয়াসমিন আহমেদ, *কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ২২

২. হিন্দু কলেজ থেকে উদ্ভূত কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাবহুল যাত্রা শুরু হয় ১৮৫৫ সালে। কিছু বাধ্যতামূলক ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনার কারণে এর নতুন নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ। স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের আগের সাম্প্রদায়িক বিবাদের অন্ধকার দিন গুলিতে কলেজ তার অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি বজায় রাখে। (রচনা চক্রবর্তী,বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮২-৮৩)

৩. রিপন কলেজ ১৮৮৪ সালে জাতীয়তাবাদী নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এই কলেজের পূর্ব নাম ছিল রিপন কলেজ যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপনের নামানুসারে হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৮-১৯৪৯ শিক্ষাবর্ষে কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত করা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ বহু বাঙালী এই কলেজে পড়ালেখা করেছেন। *(https://en.wikipedia.org/wiki/Surendranath_College)*

৪. কংগ্রেসঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কতিপয় জাতীয় নেতার উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। এটি সম্প্রসারিত হয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বড়লাট রিপনের আমলে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আন্দোলনকালে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে প্রতিনিধিত্বশীল আলোচনার জন্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের। এমন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্যোগ নেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই. সি. এস অফিসার এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী যিনি ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান রাজনীতি পর্যন্ত কংগ্রেস ভারতের একটি অন্যতম বৃহৎ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় ভূমিকা পালন করে এই কংগ্রেস। (অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২১-৩২৩)

আলীগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদ খান উত্তর প্রদেশের

আলীগড়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে খ্যাত। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের পর অনগ্রসর মুসলিম সমাজে কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। হিন্দুদের তুলনায় অনগ্রসর পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদাসীন মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান অবগত ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রগতির যথার্থ সোপান বলে মনে করতেন। তাই তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগী হন। (অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩২৫-৩২৮)

নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৩) উনিশ শতকের বাংলা মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সেবক ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে, বাংলার মুসলিম যুবক শ্রেণির আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের অনীহার দরুণ তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। মুসলমানদের এই আত্মঘাতী কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি সারাজীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এ লক্ষ্যেই তিনি কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উলে- খযোগ্য অবদানের জন্য ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ সরকার 'খান বাহাদুর' ১৮৮০ সালে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৩ সালে সি. আই এবং ১৮৮৭ সালে উচ্চতর সম্মানের প্রতীক 'নওয়াব বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেন। (অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১-৩০৩)

বাংলার মুসলমানদের পূনর্জাগরণের ইতিহাসে সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯–১৯২৮) নাম বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। তিনি ভারতের হুগলী জেলার এক সম্ভ্রান্ত শিয়া মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি, আইনজ্ঞ, সমাজ সংস্কারক এবং লেখক ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে তাদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডাম এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাছাড়া সৈয়দ আমীর আলী অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। (কে এম রইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা* , ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৮৫-৫৯। ড. মোঃ শাহজাহান, *বাংলার ইতিহাস (১৭৬৫-১৯৪৭), আধুনিক যুগ*, চয়নিকা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৩৪-১৩৭)

৫. অশ্বিনী কুমার দত্ত আধুনিক বরিশালের নির্মাতা। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। সাধনা, নিষ্ঠা, মানবপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন পথ

প্রদর্শক। অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ. ৮।)

৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৫৫-৫৫৮

৭. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার আগে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোট নাগপুর নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আলাদা একটি প্রদেশ গঠিত হয়। পরবর্তীতে হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। (মুনতাসীর মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া* ,মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা , ১৯৯৯, পৃ. ১৪-১৬)

৮. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১–১৯১৫) মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক। ১৯০৩-৪ সালে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার ওপর মতামত দিতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গভঙ্গের পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করেন। ১৯০৬ সালে তিনি ‘ Muslim All India Confederacy’ নামে একটি সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনিই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া আজীবন নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায়ের মঙ্গলে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।(ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩-৩৩)

৯. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪০৬-৪০৯। আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩১-৩৩৪। মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৯।

১০. মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১১. খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন (১৮৬০–১৯৪১) ছিলেন বৃহত্তর বরিশাল জেলা তথা বাংলাদেশের শিক্ষা, রাজনীতি ও সমবায় আন্দোলনের অন্যতম দিশারী। ১৯০৬ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকার যে কনফারেন্সে ‘অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ’ গঠিত হয় সেখানে তিনি বরিশালের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৯ সালে সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের আইন পাশ হয়। এ আইন মোতাবেক হেমায়েত উদ্দিন ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে ঢাকা বিভাগের মুসলমান এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এর পরবর্তীতেও তিনি রাজনীতিতে অসামান্য অবদান

রেখে গেছেন। তাছাড়া জনসেবায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৪৬)

১২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩-৩৫, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪১

১৩. জাতীয়তাবাদ বলতে যে আবেগ বা ধারণা বোঝায় এদেশে ইংরেজদের আগমনের আগে সেই আবেগ বা অনুভূতি তেমনভাবে প্রকট হয়নি। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রথম উন্মেষ ঘটে বাংলায় এবং পরে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। মূলত জাতীয়তাবাদের চেতনাকে মনে প্রাণে ধারণ করে ভারতীয় জনগণ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন পরিচালনা করে তাকে 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' বলে। প্রথমত কংগ্রেসের মাধ্যমে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। (সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত (১৮৫৭–১৯৪৭)*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.২১৭-২২৪)

১৪. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৪-৬৫

১৫. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *কিংবদন্তীর শেরে বাংলা*, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৯-৪১। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩, অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭-৩৭৯

১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক দল যা ব্রিটিশ ভারত এবং ভারত উপমহাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ভারত বর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে এই দলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মূলত কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদী কার্যকম শুরু করলে নবাব সলিমুল্লাহ ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠন করেন। এই দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলি খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক অন্যতম। (আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা, ১৯৯৬ পৃ. ৬৪-৬৫)

১৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৫,

স্যার আশুতোষ মুখার্জি ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'বাংলার বাঘ' বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর। সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। ১৯২১ সালে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস- চ্যান্সেলর ছিলেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯)

১৭. কে এম রইছ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৬-৬০৮, আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫, সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, ২০০৪ পৃ. ১২০-১২১

১৮. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ধনবাড়ির জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং ১৯০৬ সালে সিমলা ডেপুটেশনে বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং ১৯১৮ সালে "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" এর সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ সালে খান বাহাদুর, ১৯১১ সালে নবাব, ১৯২৪ সালে নবাব বাহাদুর এবং ১৯২৭ সালে সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত হন। (Chandiprasad Sarker, *The Bengali Muslims: A Study in Their Politicization (1912-1929),* Calcutta, 1991, P. 250)

১৯. মোঃ সোহেল আল বেরুনী, *নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী শিক্ষা ও সমাজ সেবা বিশেষত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গ*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯২, পৃ. ১১১-১১৪

২০. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮-৪১৯, কে এম রইছ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, ৬১০-৬১১

২১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

২২. ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে দুই দলের যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব উপস্থিত লীগ প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে কংগ্রেস অধিবেশনেও একই প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম ও কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত এ যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলমানদের জন্য মোট নির্বাচিত সদস্যের বাংলায় ৪০% (যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৪%) পাঞ্জাবে ৫০% (মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫৫%) যুক্তপ্রদেশে ৩০% (মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৪%) মধ্য

প্রদেশে ১৫%, বোম্বাইয়ে ৩৩% ও বিহারে ২৯% আসন দেওয়া হয়। এ ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশি- ষ্ট বিল পাশের ক্ষেত্রে ঐ সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজনের কথা বলা হয়। (এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬–১৭৫৭) ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ১৭৯-১৮০, মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস: ১৭৫৭-১৯৪৭*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২১৮–২২০)

২৩. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯, সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪৩

২৪. ১৯৭১ সনে ভারতীয় সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য, ‘ভারতীয় প্রেস আইন’ নামে একটি কুখ্যাত আইন চালু করা হয়। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ৪২-৪৪)

২৫. সেভার্স চুক্তিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেভার্স চুক্তি (Treaty of Severs) অনুসারে ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ঈজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেস উসমানী খেলাফতের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গ্রীসকে দেয়া হয়। সেভার্সে যে শুধু তুর্কীর প্রভূত্ব, তুর্কীর সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয় এমন নয়, তাঁর আপন ভদ্রাসন হতে তাকে উৎখাত করা হয়। এক কথায় সেভার্স সন্ধিতে তুর্কীর রাজশক্তিই ধবংস করে নাই বরং সমূলে বিনাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬)

২৬. মওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের প্যান ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি *আল হিলাল* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক এবং ১৯২৪ সালে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ স্বাক্ষরকারি নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। (Chandiprasad Sarkar, *Ibid*, p. 250.)

২৭. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২২, আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

২৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* , পৃ.৩১-৩২

২৯. **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দা**স (১৮৭০ - ১৯২৫) একজন বাঙালি আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি *স্বরাজ্য পার্টি*-র প্রতিষ্ঠাতা। উদার মতবাদ ও দেশের প্রতি দরদের কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন এবং তাঁর এই উদার মতবাদের জন্য জনগণ তাকে *দেশবন্ধু* খেতাবে ভুষিত করেন। (সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ২২৩-২২৪)

৩০. মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিদের একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া তিনি এ নীতির ভিত্তিতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী খেলাফত-অহসযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. ১৫৭-১৭৪)

৩১. ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রথম একটি বৃহত্তম গণআন্দোলন ছিল। সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে ব্যর্থ করে দেওয়াই ছিল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। (ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭-১৭৪)

৩২. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৪৭-৪৮, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৮-৫৫৯

৩৩. মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। এর মাধ্যমে স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অবাধ্যতা ঘোষিত হয়েছিল। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর এবং এটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি, সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। (ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭-১৭৪ ।)

৩৪. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২-৪২৪, ডঃ মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩-২১৬

কামাল পাশার জন্ম ১৯শে মে ১৮৮১ সালে তৎকালীন অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের স্যালোনিকা শহরে। তাঁর উপাধি ছিল আতাতুর্ক বা তুর্কীদের জনক। কামাল পাশা ছিলেন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা, তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া তাঁকে আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। তাঁর মতবাদ কামালবাদ নামে পরিচিত। (ড. কিরণ চন্দ্র রায়, *আধুনিক ইউরোপ*, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ.৩৫৬)

৩৫. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে স্যার আব্দুর রহিম, মৌলবী আবদুল করিম, মৌলভী মুজিবর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ মুসলমান

নেতা ও জে এম সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, জে এম দাসগুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ হিন্দু নেতাকে নিয়ে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা হিন্দু-মুসলিম চুক্তি করেন। (এ টি এম আতিকুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২)

৩৬. মতিলাল নেহেরু ব্রিটিশ ভারতের নামজাদা ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ।তিনি প্রথম সারির কংগ্রেসীনেতা ছিলেন। মতিলাল নেহেরুর সুযোগ্য পুত্র জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। (ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২১৪)

৩৭. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৭, ড. মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪-২২৬, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫১-৫৩

৩৮. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৮, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৯। সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০-২২৭,

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৩৪০ ধারায় প্রতি দশ বছরে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমীক্ষার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ সময়ের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭জন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে (৮ নভেম্বর, **১৯২৭**) যা 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত। **১৯৩০** সনে দুই খণ্ডে রির্পোট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে দ্বৈত সরকার বিলোপ, প্রদেশের হাতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন, ফেডারেল পদ্ধতির কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন, মুসলিম আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, আইনসভা গঠন, আইন সভার সম্প্রসারণ প্রভৃতির সুপারিশ করা হয়। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ প্রায় সব দল এই কমিশন বয়কট করে। (রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।)

৩৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৯, অতুল চন্দ্র রায় , প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৩-৪৯৫, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮,

প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিলঃ উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান না করায় **১৯৩০** সালের **১২** নভেম্বর হতে **১৯৩১** সালের **১৯** জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেননি। এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনও শুরু করে। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে মি. জিন্নাহ, তেজ বাহাদুর সপ্রু, শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, ড. বি আর আম্বেদকার প্রমুখ নেতা অংশগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে **১৯৩১** সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেসের মতৈক্য হয় এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় গোল টেবিল অধিবেশন বসে ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী এই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু উপমহাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গান্ধী-জিন্নাহর মধ্যে কোন আপোস না হওয়ায় এ বৈঠক ব্যর্থ হয়। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর হতে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জণ করে। (মুহাম্মদ ইনাম-উল- হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯-১৮০)

৪০. মহাজন সংস্কৃত শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ মহৎ মানুষ। তবে প্রায়োগিক অর্থে এর মানে বণিক, ডিলার বা দোকানদার, ব্যাংকার, পোদ্দার। উপনিবেশিক ও প্রাক উপনিবেশিক বাংলার প্রেক্ষাপটে কুসীদজীবী বোঝায়। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এর একটি আপেক্ষিক অর্থ আছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার যে ব্যক্তি অধস্তনের ভূমিকা পালন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন উপকরণ বিতরণের মালিক একজন মহাজন। মধ্যযুগে এবং আধুনিক জমিদারদের অধিনস্ত গোষ্ঠীকে প্রজা নামে আখ্যায়িত করা হত। এক কথায় রাষ্ট্রের বা জমিদারির শাসনাধীন লোকজনকে প্রজা বলা হয়। অন্য কথায় জমিদারী ব্যবস্থায় প্রজারা শোষণের হাতিয়ার ছিল। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা পিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩৮-৪৩৯)

৪১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩, মোঃ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০,

৪২.আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩, ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৫

৪৩. ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনঃ ভারত সচিব মি. এডউইন মন্টেগু ভারতীয় জনগণকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, ভারতীয় জনগণকে ক্রমান্বয়ে শাসন কার্যে সম্পৃক্ত করা হবে যাতে করে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান ধারা ছিল- প্রদেশে দ্বৈতশাসন, গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের ক্ষমতা, প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা, ভারত সচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের দ্বারা শাসন সংক্রান্ড় বিষয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করলে কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক প্রশাসনে এই আইনের যথেষ্ঠ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭২)।

৪৪. 'প্যান ইসলামবাদ'–উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ অভ্যন্তরীণ সংকট এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবেলা করার জন্য তার শাসনের পক্ষে

বিশ্বের মুসলমানদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে প্যান ইসলামবাদের কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। *(https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Islamism)*

৪৫. ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৪৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৩, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৪৭. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৪৮. স্যার আবদুল করিম গজনবী (১৮৭২–১৯৩৯) টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারের জমিদার ছিলেন পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আবদুল করিম রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি বঙ্গ বিভক্তির সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান এলাকা থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মুসলমান এলাকা থেকে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। (মুহম্মদ আবদুস সালাম, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৮)

মুজিবুর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর *দি মুসলমান* পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রথমে এর ম্যানেজার এবং পরবর্তীতে সম্পাদক ও পরিচালক নিযুক্ত হন। বাংলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং ১৯২১ সালে গ্রেফতার হন। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে নিখিল ভারত সাংবাদিক কমিটির প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (*সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*,ঢাকা, ২০ জানুয়ারি, ২০১২, সম্পাদকীয় পাতা)

৪৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, কালের ধ্বনি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৬৬, বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৩, ঢাকা, পৃ. ৩২, ৩৪

৫০. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৫১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৫২, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৭।

আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬) কুমিল-া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তিনি কুমিল-া জেলা খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্য করার দায়ে দুই সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তীতে আরও কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসের আহ্বানে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ও ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব-কে যোগদান ও এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের টিকিটে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৬)।

সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০–১৯৭২) ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের বেশি ভাগ সময়ই দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের পক্ষে অবস্থান করেন। ১৯২৮ সালে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সৈয়দ নওশের আলী কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে যশোর অঞ্চলে বিজয়ী হন। তিনি আজীবন কৃষক প্রজার বামপন্থী নেতা হিসেবে কাজ করে গেছেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৬ সালে শরৎ বসুর অখণ্ড বাংলার পক্ষেও কাজ করেন । তিনি অসাম্প্রদায়িক হিসেবে সারা জীবন রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেন। (শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৮১-২৮২)

সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৮-১৯৭৪) ভারতের অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা ছিলেন। খেলাফত ও আইন অমান্য আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তাছাড়া তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি জিন্নাহর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বেঙ্গল মুসলিম লীগের একজন মুসলিম জাতীয়তাবাদী কর্মীতে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর তিনি বেশ কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন।(মোহাম্মদ আলী সৈয়দ,বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮)

৫২. কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে ১৯৩৫ সালের ২৪ জুলাই 'ভারত শাসন আইন' পাস হয় এবং ২ আগস্ট তা রাজকীয় সম্মতি লাভ করে সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এই আইনের দুটি প্রধান বিধান ছিল;

ক) ব্রিটিশ ভারতীয় ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং

খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান। (সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০)।

৫৩. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৮৯।

৫৪. সিরাজ উদ্‌দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৫৫. ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের আওতায় সমগ্র বাংলা প্রদেশে বহুসংখ্যক 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠিত হয়। এই বোর্ড ১৯৪৪ সাল পর্যন্ড় বাংলার কৃষকের ঋণভার লাঘবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১)।

৫৬. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩

৫৭. কে এম রইছ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২০-৬২১, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৫-৯১, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*,বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, *পৃ.* ১৩৬-৩৭,

58. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে বাংলার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এরপর সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগে যোগদেন এবং খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্ড়ানের প্রথম রাজনৈতিক দল "আওয়ামী মুসলিম লীগের" প্রতিষ্ঠায় তার অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (মাহমুদ নূরুল হুদা, *হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কাছ থেকে দেখা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১-১৫)

৫৯. কে এম রইছ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ৭৮-৮২, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫,

খাজা নাজিমুদ্দিন, (১৮৯৪-১৯৬৪) অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। হক-জিন্নাহর মতবিরোধের কারণে তিনি ১৯৪১ সালে ১ ডিসেম্বর জিন্নাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২-৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার সময়ে বিরোধী দলীয় নেতারূপে সংসদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার (পূর্বপাকিস্তান) মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ ইন্তেকাল করলে তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। (*https://bn.wikipedia.org/s/lg1)*,

৬০. শরৎবসু কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতা ছিলেন। তাছাড়া অবিভক্ত বাংলা প্রয়াসের অন্যতম নেতা শরৎচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন ভারত ইউনিয়নের মধ্যেই এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২-৪৩৩)

৬১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৮, কে. এম রইছ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

৬২. ড. আবু মোঃ দোলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪২,

৬৩. ফজলুল হক সরকার ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় মহাজনি আইন পাশ করে। সরকার সকল মহাজনদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা আবশ্যকীয় করে। এছাড়া সুদের হারও নিদিষ্ট করে দেয়া হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব আইন কৃষকদের এক বৃহদাংশকে ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আদায় থেকে মুক্তি দেয়। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৫)।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, পাশ করে জমিদারদের দেয় জমি হস্ত্মান্তর সংক্রান্ত ফি, জমিদারদের জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (Pre-emption), সর্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের আদায় বা ‘আবওয়ার’ প্রভৃতি বাতিল করা হয়। কুঁড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাত্র চার বছরের খাজনা পরিশোধ করে চাষীরা সিকস্তি জমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। বকেয়া খাজনার ওপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% স্থির করা হয়। এই স্বত্বাধিকারীদের ওপর খাজনা বৃদ্ধি, দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অবশ্য এই আইন পাশের পূর্বে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১৪)।

৬৪. ফ্লাউড কমিশনঃ উপমহাদেশে কৃষক সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। চিরস্থায়ী প্রথা উচ্ছেদের জন্য এ কে ফজলুল হকের সরকার ১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর ফ্রান্সিস ফ্লাউড কে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ড় কমিশন নিয়োগ করেন যা 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ কমিশন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার সুপারিশ সহ রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা প্রজাস্বত্ব অধিগ্রহন আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫)

৬৫.আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১৬ সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১৯২,

৬৬. ১৯৪০ সালের ২২ শে মার্চ থেকে লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতম অধিবেশন শুরু হয়। ২৩ শে মার্চ বিকেলে ৩টা ৪৫ মিঃ এ মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক প্রবেশ করলে অধিবেশনে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে শের-ই-বাঙ্গাল, জিন্দাবাদ ধ্বনিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তারপর ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের মূল প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। ২৪ শে মার্চ তারিখে গৃহীত এই প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের কার্য বিবরণীতে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে উলে- খিত এবং তাতে কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটির উলে- খ নেই। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু পত্রিকাগুলোতে বড় বড় শিরোনামায় খবর ছাপা হয় যে, পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত।এই ভাবেই 'লাহোর প্রস্তাব' হয়ে ওঠে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। এই প্রস্তাবের মূল কারণ ছিল উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সমস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্তশাসিত। (রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* তৃতীয় সংস্করণ,আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৭-২৮)

৬৭. ১৯৪১ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় নিয়ে মোহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতান্তর ঘটে। তাছাড়া দুই নেতার রাজনৈতিক জীবনের নীতিগত বৈষম্য ছিল। এই সময় মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে পদচ্যুত করার। ১৯৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দল গঠন করে খাজা নাজিমুদ্দিনকে নেতা নির্বাচিত করে। এ সিদ্ধান্তের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফজলুল হক প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ গঠন করেন। (এনায়েতুর রহিম, *বাংলায় স্বশাসন (১৯৩৭-১৯৪৩)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১,পৃ. ৩৯),

৬৮. ১৯৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৯ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এসময় ডা. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী উপনেতা নির্বাচিত হন। তাছাড়া অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও এই মন্ত্রীসভায় দায়িত্ব পালন করে। তিনি মূলত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে অধিক পরিচিত। (এনায়েতুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯)

৬৯. এনায়েতুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

৭০. লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম সভাপতি মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ২২ মার্চ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে "দ্বি-জাতি তত্ত্ব" (Two Nation Theory) ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ভারতের সমস্যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক ধরণের নয়, দৃশ্যত এ সমস্যা হল আন্তর্জাতিক। তিনি আরও বলেন, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান কখনো একটি জাতি ছিল না, তারা আলাদা দুটি জাতি। কারণ হিসেবে তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি; সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে আগত বলে মন্তব্য করেন। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০)

৭১. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

৭২. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩-২০৩, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৫০, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩- ২৫৬

৭৩. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৫০, ১৯৪৩, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫ই জুলাই, ১৯৪৩,পৃ. ৮

৭৪. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪, তাহমিনা খান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ (১৯৪৭-১৯৫৭)*, ঢাকা , ২০১৪, পৃ. ৭০-৭২, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১-১৮২

৭৫. ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩-১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ওয়াভেল পরিকল্পনার জন্য তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে বিখ্যাত হয়ে আছেন। (*http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3446500620/wavell-lord.html)*

৭৬. জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন কিরণ শঙ্কর রায়। তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির একজন উলে- খযোগ্য নেতা হিসেবে অবদান রেখে গেছেন। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ সময় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কিরণ শঙ্কর রায় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তিনি বাংলা ভাগেরও বিরোধিতা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

(*http://radhikaranjan.blogspot.com/2013/09/151-kiran-sankar-roy-1891-1949.html)*

৭৭. Harun-or-Rashid, *The forshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics (1936-1947),* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, p. 205-207, মোঃ রজমান আলী আকন্দ, *বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন কাল থেকে ১৯৭১),* ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৭৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে গণবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক দলীয় প্রধানমন্ত্রী উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্র"য়ারি মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও এ. ভি আলেকজাণ্ডার) নিয়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন যা 'মন্ত্রীমিশন' নামে পরিচিত। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা বা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদেশগুলো ধর্মের ভিত্তিতে তিনটি গ্র"পে বিভক্ত করণ ইত্যাদি বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ ছিল। তবে এই মিশন নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২৪)

৭৯. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics (1936-1947), Ibid*, p 240-245, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬, ২০৫, ২০৬,

৮০. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৮১. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭-৮০

৮২. মোঃ খলিলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

৮৩. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

৮৪. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯-২৬০

৮৫. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

৮৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬১

৮৭. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করেন। পরবর্তীতে 'নেজাম-ই-ইসলাম', 'খেলাফতে রব্বানী পার্টি', ও 'গণতন্ত্রী দল' যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মসূচীর ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এটি রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন আবুল মনসুর আহমদ। ২১ দফা কর্মসূচী সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

১। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

২। জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা। খাজনার উচ্চহার হ্রাস করা এবং সার্টিফিকেট জারি করে খাজনা আদায়ের প্রথা বন্ধ করা।

৩। পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করে পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা। মুসলিম লীগ সরকার আমলে পাট কেলেঙ্কারীর তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান ও অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪। সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান করা।

৫। দেশকে লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং লবণ কেলেঙ্কারীর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান ও অর্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা।

৬। শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৭। খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করা।

৮। পূর্ব বাংলাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা।

৯। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনভাতা বৃদ্ধি করা।

১০। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ব্যবধান দূর করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা।

১১। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল প্রতিক্রিয়াশীল কলাকানুন বাতিল করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। সবার জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য এবং ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা।

১২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন করে সরকারি কর্মচারীদের বেতনের সামঞ্জস্য বিধান করা এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা।

১৩। ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা। ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সাল পর্যন্ত সকল সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের অর্জিত সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা এবং সকল অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

১৪। সকল নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তিদান। জনগণের বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

১৫। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করণ।

১৬। 'বর্ধমান হাউস'কে আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা।

১৭। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির স্বরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা।

১৮। ২১ ফেব্রুয়ারি কে শহিদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটি পালন করা।

১৯। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ। নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন এবং আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কর্তৃক আইনসভার সময়বৃদ্ধি করা হবে না। সাধারণ নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

২১। আইনসভার কোনো আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করার পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা।

(আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৫২-২৬৬।*দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৫৪, পৃ. ৬)

৮৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯-২৬৬

৮৯. চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) ছিলেন একজন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং ব্রিটিশ ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তার আদিনিবাস ছিল যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ)। খালিকুজ্জামান পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ থেকে ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পর্যন্ত তিনি পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। (*https://en.wikipedia.org/wiki/Chaudhry_Khaliquzzaman)*

৯০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ মাত্র ত্রিশ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ৩১ মে ১৯৩৫ সালের

ভারত শাসন আইনের ৯২ক ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে এবং বাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫০)

৯১. কে এম রইছ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪৩-৬৪৬, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫-৩৮২, আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৫, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫৮

৯২. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩) রাজনীতিক, কূটনীতিক, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী; মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ১৯০৯ সালে বগুড়ার এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন (১৯৪৪-৪৫) তিনি ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভায় অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭) ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। (মুয়ায্‌যম হুসায়ন খান, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৯)

৯৩. তাহমিনা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৫, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৭৫, ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮-৩১০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৮০

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০)

যে সকল মুসলিম ব্যক্তিত্ব উপমহাদেশকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং যাঁদের আবির্ভাবে বাংলার মুসলিমদের জাতীয় জীবন ধন্য হয়েছে, মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০) তাদের অন্যতম।[১] মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদীর জন্ম তারিখ নিয়ে একাধিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ১৮৭৫ সালের ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আগড়িয়া গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ফার্সী শিক্ষিত পিতা মতিউল-াহ প্রাইমারি স্কুলের পন্ডিত ছিলেন। মাতার নাম ছিল রহিমা বিবি। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুর“ হয় নিজ বাড়িতে পিতার কাছেই। আরবী ও ফার্সী শিক্ষার উদ্দেশ্যে অতি অল্প বয়সে পিতা তাঁকে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি করান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি জুনিয়র মাদ্রাসায় পবিত্র কুরআন পাঠ ও মাসলা মাসায়েল শিক্ষা শুর“ করেন এবং ১২ বছর বয়সে তিনি জুনিয়র মাদ্রাসা পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য হুগলী মাদ্রাসায় গমন করেন। হুগলী মাদ্রাসা থেকে অল্পকালের মধ্যে সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং তৎকালীন আরবী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৮৯৫ সালে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। এখান থেকে তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।[২] আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষা শেষে মওলানা ইসলামাবাদী জীবিকার উদ্দেশ্যে রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। একদিকে মোক্তারি পাশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে মাতৃভাষায় (বাংলা) দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনের গতি মোড় নেয়। তিনি রংপুর শহরের মুনশীপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসায় হেড মৌলবী পদে যোগদান করে সেখানে দুই বছর (১৮৯৬-১৮৯৭ খৃঃ) শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময় তিনি রংপুর পীরগঞ্জের অন্তর্গত কুমেদপুর মাদ্রাসায় হেড মৌলবী পদে দুই বছর (১৮৯৮ – ১৯০০ খৃঃ) চাকুরি করেন। মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে গেলে মওলানা ইসলামাবাদী চট্টগ্রাম ফিরে এসে সেখানে মৌলবী আবদুল আজিজ প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বোর্ডিং এ সুপারিন্টেনডেন্ট পদে ছয় মাস কাজ করেন। তারপর সীতাকুন্ড সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক পদে কিছুদিন শিক্ষকতা

করেন। এই মাদ্রাসায় থাকাকালে মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী মিশরের *আল মানার* ও *আল আহ্‌রাম* প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় আরবী প্রবন্ধ লিখতেন। [৩] তারপর মওলানা ইসলামাবাদী সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতা যান এবং মির্জা ইউসুফ আলীর সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে *ছোলতান* নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা পুন:প্রকাশ করেন।[৪] তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় *ছোলতান* পত্রিকা দেশের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।[৫] 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা' ত্রিপলির যুদ্ধ (১৯১১), বলকান যুদ্ধ (১৯১২), কানপুর মসজিদের হাংগামা (১৯১৩), খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ইসলামের উপর তাঁদের কলঙ্ক লেপন ইত্যাদি কারণে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার আলেম সমাজও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেন, স্বজাতির রাজনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণীত হয়ে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আব্দুল্লা হেল বাকী, মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ ১৯১৩ সালের ৫-১৭ মার্চ বগুড়া জেলার বানিয়াপাড়া গ্রামে 'আঞ্জুমান-এ-ওলামা-এ-বাংলা' প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তবে 'আঞ্জুমান-এ- ওলামায়ে-বাংলা'র মুখপত্র *আল এসলাম* এর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলত ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আর এই সাংবাদিকতা তাঁকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।[৬] মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন মানুষের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, স্বাধীনতা, আদর্শ, ঐতিহ্য তথা সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোস করেনি। মূলত ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কারের আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকেই মওলানা ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন কেমন ছিল এবং তিনি পরাধীনতার গ-ানি ও হতভাগ্য মুসলিমদের দুর্দশায় কীভাবে পীড়িত হতেন এবং এর ফলে তিনি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু আলোচনা ছাড়া উপলব্ধি করা যাবেনা কারণ এর ইতিহাস কোথাও স্বার্থকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই বিষয়টি আজ নতুন করে ভাবার ক্ষেত্রে গুর‍ুত্বের দাবী রাখে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক তাঁর জীবনের এ

দিকটি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন এর ঐতিহাসিক গুর“ত্ব বিবেচনা করে এখানে আলোচনা করা হবে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা মুসলিম সমাজের সামগ্রীক পুনর“জ্জীবনের স্বপ্ন ও ধ্যানে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কতটা উদ্ভাসিত ছিল তা তুলে ধরা আবশ্যক।[৭]

১৯০৬ সালে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা তাকে ধর্ম প্রচারে ব্রতী করান এবং পন্ডিত মেরাজ উদ্দিন (১৮৫৯-১৯১৮) ও পন্ডিত রিয়াজ উদ্দীন মাশহাদীই (১৮৬২-১৯৩৩) তাঁকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন।[৮] কার্যত তখন থেকেই তিনি স্বদেশের মুসলিমদের বিশেষ করে কৃষক প্রজার দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী বলেন যে, মওলানা ইসলামাবাদী যখন প্রথম রাজনৈতিক আসরে আসেন তখন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' মৃত প্রায়, মৌলবী মেরাজ উদ্দীন ও পণ্ডিত মাশহাদী তখন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলছেন।[৯] মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদী এ আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। *মিহির ও সুধাকর*-এ এই আন্দোলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হত 'ঘুড়ির সুতো' নামে। কোন হিন্দু পত্রিকাতে এ আন্দোলনের কথা ছাপা হতোনা। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, কৃষক আন্দোলন মাথা চড়া দিয়ে উঠলে জমিদার, গাঁতীদার ও দরগাঁতীদারদের ক্ষতি হবে।[১০] লেখক মুহাম্মদ আব্দুল হাই এর বক্তব্য হতেও প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা ইলাসামাবাদী কৃষক প্রজা আন্দোলনের সাথে সংশি- ষ্ট ছিলেন।[১১] তিনি আজীবন কৃষকদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁদের শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে বিশেষ করে আত্মসচেতন হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি চট্টগ্রামের বরকল গ্রামে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে মওলানা আহমদ আলী ও মৌলবী সৈয়দ নওশের আলী যোগদান করেন।[১২] মওলানা ইসলামাবাদী তাঁর অভিভাষণে কৃষকদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের উপায়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে কুষ্টিয়ায়ও অনুরূপ কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।[১৩] মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলায় কংগ্রেসের সহকারি সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়ে। তিনি

এতেও দমে যাননি বরং কারা মুক্তির পর অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকেন। [১৪]

মওলানা ইসলামাবাদী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগদান করেন। তবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত তেমন কিছু জানা যায় না। ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুর হলে মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী এ আন্দোলনে যোগদান করেন। [১৫] মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ যেন রদ না হয় সেজন্য সেকালের কিছু সংখ্যক বাঙালি মুসলিমের মধ্যে যে একটা সচেতনতা ছিল ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনায় তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। [১৬] উপরের বক্তব্য হতে ধারণা করা যায় যে, তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ আবদুল-াহর বিবরণ হতে জানা যায় যে, তিনি কংগ্রেসী ভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাই তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী পরিচালিত বঙ্গবিভাগ রদ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের সম্পাদিত *ছোলতান* পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ ও মন্তব্য লিখেন।

মওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন প্যান ইসলামবাদী। কি করলে মুসলিম জাতি আবার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। [১৮] ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের (১৯১১-১৩) সময় সমগ্র বাংলাব্যাপী যে প্যান ইসলাম আন্দোলন চলে তাতে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। [১৯] খেলাফতের ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে তিনি তুরস্ক সুলতানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর পত্রিকা *চতুষ্টয়* প্যান ইসলামী ভাবধারা প্রকাশে ভূমিকা রাখেন। [২০] মওলানা মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী জীবনের শুরুতে সাধারণ মানুষ তথা কৃষক প্রজাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভাবতেন যার ফলেই মূলত তাঁর রাজনীতিতে আসা। [২১] সমকালীন সময়ে বেশির ভাগ প্রজা মুসলমান হওয়ায় তাদের নির্যাতনের কথা সবাই জানতে পারতো না। কারণ বেশির ভাগ জমিদার ছিল হিন্দু। তিনিই এই সমস্যার কথা অনুধাবন করে এর বিরদ্ধে প্রতিবাদ শুর করেন। [২২]

পূর্ব বাংলার প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে জামালপুরের প্রজা সম্মিলনী বিশেষ গুরত্ব বহন করে। ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহাকুমার কামারের চরে এক বিশাল প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক(১৮৭৩-১৯৬২),

মৌলবী আবুল কাশেম (১৮৭২-১৯৩৬), খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী, মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মওলানা মনির্জ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ উদারপন্থী মুসলিম রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করেন। [২৩] ঐ সম্মেলনে জমিদারের কাছে প্রজাদের জন্য কতিপয় অধিকার দাবী করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যা পরবর্তীতে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে* প্রকাশ করা হয়। [২৪] বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক সমাজের অধিকার নিশ্চিত করার আগ্রহই মওলানা ইসলামাবাদীকে কৃষকদের অধিকার আদায়ে আন্দোলনমুখী করেছিল। ১৯২৯ সালে 'কৃষক প্রজা সমিতি'র জন্ম বাংলার ইতিহাসে এক উলে-খযোগ্য ঘটনা। স্যার আব্দুর রহিম ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯২৯ সালে দুর্দশাগ্রস্থ দরিদ্র চাষীদের জন্য কল্যাণকর কিছু করার উদ্দেশ্যে এ সমিতি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে জমিদারের হাত থেকে কৃষকদের উদ্ধার করার প্রত্যয় নিয়ে 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠিত হওয়ায় মওলানা ইসলামাবাদী তাতেও অংশগ্রহণ করেন। বাংলার অবহেলিত কৃষক সমাজের মুক্তির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই তাঁর এ দলে যোগদান। তিনি জানতেন সর্বসাধারণের দুর্দশা লাঘব না করা গেলে তাদেরকে ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। তাই তিনি কৃষক প্রজাদের স্বার্থ রক্ষায় 'কৃষক প্রজা পার্টির' সাথে যুক্ত হয়ে আন্দোলন শুর্ করেন। [২৫]

মওলানা মনির্জ্জামান ইসলামাবাদীর একান্ত বন্ধু হাকিম আলতাফুর রহমানও একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেন যে, "বাঙলার কৃষকগণ জমিদারের অত্যাচারের শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত। তিনি আজীবন এ কৃষক-কুলের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে গেছেন এবং তাদের উপর অন্যায় ও জুলুমের বির্দ্ধে আমরণ সংগ্রাম করেছেন। তাদের শিক্ষিত স্বাবলম্বী ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে বিশেষ করে আত্মসচেতন হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।"[২৬] ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির টিকিটে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন করলে তিনি তাতে সন্তুষ্ট হন। [২৭] এ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ব্যারিস্টার আজিম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষকের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কৃষক প্রজাপার্টির কর্মী হিসেবে সক্রিয় অবদান রাখেন। [২৮] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নিয়ে 'মিত্র শক্তি' ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বির্দ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। [২৯] ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তুরস্কের

সুলতানকে বিশ্বমুসলিম জনগণের ‘খলিফা’ হিসেবে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু তুর“স্কের সুলতান মিত্র পক্ষের বির“দ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ভারতীয় মুসলমান এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ একদিকে তুরস্কের সুলতানের প্রতি তাদের ধর্মীয় আনুগত্য ছিল, আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিও তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল। এ সময় চতুর ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে, যুদ্ধের ফলাফলে তুরস্ক খেলাফতের ক্ষতি করবে না অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে। এতে ভারতীয় মুসলমানগণ যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সমর্থন দেয় কিন্তু যুদ্ধাবসানে ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্র শক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার পূর্ব প্রতিশ্র“তি ভঙ্গ করে ভারতীয় মুসলমানদের মনে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। ভারতের মুসলমানরা খেলাফতের সম্মান ও অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকীম আজমল খাঁন প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে ব্রিটিশদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা এবং সরকার বিরোধী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এসময়ই এ দেশে প্যান ইসলামবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। এরই ফলশ্র“তিতে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে লক্ষ্মৌতে কেন্দ্রিয় খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। অবিলম্বে সারা উপমহাদেশে এর শাখা খোলা হয়। খেলাফত কমিটির বাংলা শাখায় প্রতিষ্ঠাতাসহ সভাপতি, সেক্রেটারি ও সহ-সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও সৈয়দ মজীদ বখশ্। এ সময় খেলাফত ও খলিফার সম্মান মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌর ফিরিঙ্গি মহলে এক সভা আয়োজন করে।[৩০] উক্ত উদ্যোগে অন্যান্য মুসলিম নেতার মত মওলানা ইসলামাবাদীও আকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। ১৯১৯ সালে ১৭ অক্টোবর শুক্রবার খেলাফত দিবসটি প্রার্থনা, সভা-সমাবেশ ও হরতাল পালনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।[৩১] ১৯২০ সালের ৩রা মার্চ নওয়াব হাবীবুল-াহর উদ্যোগে ঢাকার আহসান মনযিলে খেলাফতের সমর্থনে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মওলানা শওকত আলী ভাষণ দেন। মওলানা

ইসলামাবাদী এ সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে খেলাফতের ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। *আল এসলাম* পত্রিকায় তিনি খেলাফত-অসহযোগের সমর্থনে *খেলাফত*, *অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য*, *ঈমানের পরীক্ষা*, *সরকারের সাহচর্য ত্যাগ* শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'খেলাফত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন,

"পবিত্র স্থানসমূহ এবং আরব রাজ্য খলিফার হাতছাড়া হইলে, রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল বিজাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে খলিফার মর্যাদা থাকে না। খলিফার পদমর্যাদা না থাকিলে তিনি খলিফারূপে থাকিতে পারেন না। খলিফা না থাকিলে, এমাম নির্দিষ্ট না থাকিলে মোছলমানের মোছলমানি থাকে না। এছলাম কায়েম থাকে না। জুম্মা, জমাআৎ, ঈদ ও হজ্ব ইত্যাদিতে খলিফা বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতি বা অনুমতির প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত সে সকল ধর্মকর্ম কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব, এছলাম রক্ষা করিতে হইলে খলিফার রাজ্য, তাঁহার ক্ষমতা ও পদ মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমানের ফরজ। যাহারা খলিফার পদ-মর্যাদা, এমামের পদ গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিবে না, তাহারা মোছলমান নামে পরিচিত হইতে পারিবে না।" [৩২]

১৯১৯ সালের ২৩ ও ২৪ নভেম্বর দিল-ীতে উলামাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। [৩৩] সে সভায় বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মওলানা মনির"জ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা আকরম খাঁ।[৩৪] এতে উলামাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় সমস্যা সমাধানে উলামা সংগঠন 'জমিয়ত এ উলামা-এ হিন্দ' গঠন করা হয়। মওলানা ইসলামাবাদী এই সংগঠনের টিকিটে ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচনে চট্টগ্রাম থেকে প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁরই বন্ধু মুসলিম লীগ প্রার্থী আলী আহমদ চৌধুরীর নিকট তিনি কয়েক হাজার ভোটে পরাজিত হন। [৩৫]

ইসলামাবাদী মুসলমানদের মর্যাদার প্রতীক তুরস্কের খলিফা ও খেলাফত ঐতিহ্যের এত কঠিন ভক্ত ছিলেন যে তাঁর প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম *ছোলতান* রাখেন। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অর্থ সাহায্যের জন্য কলকাতায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও 'খেলাফত স্টোর' নামে নামকরণ করেছিলেন। খেলাফত আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তিনি *তুরস্কের সুলতান(১৯০৯)*, *কনস্ট্যান্টিনোপল(১৯১২)*, *ভারতে মুসলমান সভ্যতা*

(১৯১৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সারা দেশ সফর করে খেলাফত আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করেন। দখলদার ইংরেজ সরকার মুসলিমগণের এসব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে কর্ণপাত না করায় তা পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের দিকে মোড় নেয়। এ প্রসঙ্গে মওলানা ইসলামাবাদী বলেন,

"খেলাফত রক্ষা ও খলিফার পদমর্যাদা এবং তাহার রাজ্য সংকলন করে মোছলমানগণ সর্বপ্রকার আবেদন, নিবেদন ও আন্দোলন আলোচনায় কোনরূপ ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বলের অস্ত্র বিলাতী বর্জন স্বদেশী গ্রহণ, ব্রিটিশ আদালত বর্জন করিয়া জাতীয় আদালত স্থাপন পূর্বক মামলা-মোকদ্দমার পরস্পর নিষ্পন্ন করা, রাজকীয় উপাধি ও সৈনিকবৃত্তি বর্জন করা, সরকারের কোন বিষয়ে সাহায্য না করা এসকল উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে যে, খেলাফতের প্রতিকার সম্পন্ন হইবে তাহা বলা যায় না; তবে জাতীয় স্বার্থ ও ধর্ম রক্ষার জন্য শেষ অবলম্বন যাহা দুর্বলের পক্ষে সম্ভব তাহাই ধারণা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী খেলাফত স্টোর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায়ও একটি স্বদেশী খেলাফত স্টোর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে।"[৩৬] "অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বলেন,

"এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে দুইটি খেলাফত সমস্যার সমাধান, তুরস্ক ছোলতানের হৃতরাজ্য সমূহের পুনরুদ্ধার, এছলাম জগতের পদ-মর্যাদা রক্ষা করা। ২য়টি ভারতে স্বরাজ লাভ। খেলাফত এছলাম ধর্মের অংগ বিশেষ। খেলাফত রক্ষা না হইলে খলিফার সিংহাসন, তাঁহার রাজত্ব ও পদগৌরব রক্ষা না পাইলে এছলামের মহাক্ষতি এবং মোছলমান জাতির সর্বনাশ।" অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মওলানা ইসলামবাদী ৯ জন পরিচালকের সমবায়ে কলকাতার চিৎপুর রোডে "শাহজাহান স্টোর" নামক স্বদেশী পণ্যের একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। এ মর্মে *আল-এসলাম* পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা হয়। তিনি ছিলেন এ স্টোরের প্রধান পরিচালক। এভাবে মওলানা ইসলামাবাদী অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সভা, সমিতি আহ্বান, যোগদান এবং তাঁর নিজের সম্পাদিত পত্রিকা এবং তৎকালীন প্রকাশিত পত্রিকায় আন্দোলনের পক্ষে জোর প্রচারণা চালাতে থাকেন।[৩৭]

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুর“ হলে খেলাফত আন্দোলনে অনেকের মত মওলানা ইসলামাবাদীও তাতে যোগদান করেন। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কারণে কংগ্রেসের সাথে আন্দোলনে অংশ নিতে অনেক মুসলিম নেতাই অপছন্দ করেন। মুসলিমগণকে বিপদে ফেলে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বনের পুরানো আচরণের আবারো পুনরাবৃত্তি ঘটে। আন্দোলন চাঁঙ্গা হয়ে উঠলে ইংরেজ সরকার দমন অভিযান শুর“ করলে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। অবশ্য গান্ধীজীর মতামত ছিল আন্দোলন অহিংস হবে কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানার পুলিশ হত্যার মতো সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে আন্দোলন স্থগিত হয়ে যায়। অন্যদিকে ১৯২৪ সালে কামাল পাশা কর্তৃক তুরস্ক থেকে রাজতন্ত্র ও খেলাফতের অবসান ঘোষণা করলে স্বভাবতই ভারতসহ সকল স্থানে খেলাফত আন্দোলনসহ অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। [৩৮]

কংগ্রেসে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের অনুপ্রবেশ ঘটায় উদারপন্থী রাজনীতিকগণ তার প্রতি আস্থা হারান। রাজনীতিতে উদার মতে বিশ্বাসী মওলানা মনির“জ্জামান ইসলামাবাদী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। [৩৯] কংগ্রেসের উগ্রবাদী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে আসা উদারপন্থী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গঠন করলেন স্বতন্ত্র দল 'স্বরাজ্য দল'। মওলানা ইসলামাবাদী ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন। কোন উপায় অবলম্বন করলে সিলেটের কাছাড় ও পুর্নিয়া জেলাকে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করা যাবে এস্বপ্নে তিনি দিন রাত বিভোর ছিলেন। তিনি মির্জাপুর পলিটেকনিক্যাল এসোসিয়েশন এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। [৪০] কংগ্রেসের নীতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারানোর কারণেই মওলানা ইসলামাবাদী নেতাজী সুভাষ বসুর ফরওয়ার্ড ব- কের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। [৪১] সৈয়দ মোস্তফা জামাল বলেন,

১৯৪২ সালের কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুভাষ বসু 'আযাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করলে মওলানা ইসলামাবাদী তাতে যোগ দেন এবং ঢাকা চট্টগ্রামে বিপ- বী দল গঠন করেন। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর গ্রেফতার করে। মিঃ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সৈয়দ ছোলতান আহমদ প্রমুখ নেতার সাথে তাঁকে দিল-ীর

লাল কিল-া ও পরে পাঞ্জাবের মিঞাওয়ালী কারাগারে আটক রাখা হয়। ১১ মাস কারাবরণ শেষে ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান। [৪২] অন্যমতে অধ্যাপক মনির‍ুজ্জামান বলেন, জানা যায় ১৯৪২ সাল বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ১৫ নং ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতায় তিনি একটি গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি ১১ মাস কারাবরণ করেন। [৪৩]

আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জেল জুলুম নির্যাতনে যে ভীত ছিলেন না এলক্ষ্যে তিনি সশস্ত্র অভিযান পরিচালনাকে সমর্থন করতেন।[৪৪] মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি দেশের স্বাধীনতার বিষয়টা অনেক বেশী গুর‍ুত্ব দিতেন। তাঁর মন মুসলিম স্বাধীনতা বোধে উজ্জীবিত হলেও তাঁকে কদাচিতও সাম্প্রদায়িকতার বিষ স্পর্শ করতে পারেনি। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে জীবন গড়ে উঠলেও ধর্মান্ধতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। রাজনৈতিক জীবনে এর উজ্জ্বল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে মওলানা ইসলামাবাদী নীতির ব্যাপারে তিনি জীবনে কোনদিন আপোস করেননি। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী বলেন,

“ইসলামাবাদীর এক বিশেষ গুণ ছিল এই যে, তিনি জাতীয়তাবাদী হইলেও কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। এক প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষ মহাশয় ইসলামাবাদীকে বলিয়াছেন, “এই কথা বলিতে আপনার মনে একটু ও দ্বিধা হইল না।” জওয়াবে ইসলামাবাদী বলিয়াছিলেন; “মুসলমান ভয় করে কেবল খোদাকে আর কারো সম্মুখে কথা বলিতে তাঁর বুক কাঁপে না।” [৪৫]

স্বাধীনতার আকাঙ্খা, পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা এবং জাতীয়তাবোধের স্পৃহাই মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীকে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী করেছিল। কংগ্রেসের ইসলাম বিদ্বেষী আচরণ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের আহবানে তাঁকে এক সময় মুসলিম লীগের প্রতি আগ্রহী হতে দেখা যায়। তাই জাতীয় প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইসলামাবাদীর একজন কনিষ্ঠ সহচর মৌলবী সৈয়দ ছোলতান আহমেদ এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য,

"মওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি এবং জনাব নুর আহমেদ চেয়ারম্যান ছিলেন সম্পাদক। ১৯৪৪-৪৫ সালে আমাকেও তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দশমাস কারাবরণ করি।" ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর কঠোর অনুশীলনে বিশ্বাসী মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠা 'পাকিস্তান আন্দোলনের' যৌক্তিকতা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর ক্ষুরধারা যুক্তি ও ভূগোল ইতিহাসের ভাষণ দিয়ে পাকিস্তান দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করে *আনন্দবাজার* পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে নিজের মতের যৌক্তিকতা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন 'দ্বি-জাতি' তত্ত্ব ভারতীয় মুসলিমদের জন্য আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। তিনি বলতেন ভারত দ্বিখণ্ডিত হলে মুসলিমরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা মুসলিমরা সেই অবস্থায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এক অংশ ভারতে, কিছু অংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং অপর অংশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বলে সংহতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে। সেজন্য ১৯৪৭ এ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে তিনি কলকাতাতেই থেকে যান।[৪৬] ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর প্রায় দু বছর কলকাতায় থাকার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে চট্টগ্রামে আসেন এবং শেষ কয়টি দিন প্রিয় মাতৃভূমিতে অবহেলা আর অযত্নে কাটিয়ে অবশেষে ১৯৫০ সালে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।[৪৭]

ইংরেজ শক্তির আগমনে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ কীভাবে সর্বশান্ত হয়েছেন মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শিক্ষা জীবন শেষে কর্মজীবনের সূচনালগ্নে রংপুরে অবস্থান কালে এ বিষয়ে আরো বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তখন থেকেই মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত স্বজাতির মুক্তির ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন। অবশেষে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনাকে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার নির্বাচন করে নিজের সুখ–শান্তি, আরাম-আয়েসের কথা ভুলে গিয়ে তাদেরকে ইতিহাস ঐতিহ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের মহান আন্দোলনে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করেন। তিনি শতাধিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, অভিভাষণ এর মাধ্যমে জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। সমাজের কুসংস্কারাদির অবসান করে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র থেকে সকলকে বাঁচানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলায় প্রয়াসী হন। শুধু সাংবাদিকতা, সাহিত্য সেবা আর সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেই তিনি

সীমাবদ্ধ ছিলেন না। জাতির প্রাণের দাবী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বস্তুত মওলানা ইসলামাবাদী দেশ সেবা ও রাজনীতি চর্চাকে এক ও অভিন্ন মনে করতেন। মুসলিম সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি তথা স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এর আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে তিনি গুর‍ুত্ব দিতেন। এই চেতনাকে ধারণ করেই ইসলামাবাদী জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে নীতি আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি কখনো আপোস করেননি। [৪৮] প্যান ইসলামবাদে অনুপ্রাণীত মওলানা ইসলামাবাদী উপমহাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলার মুসলিমগণের স্বার্থ সংশি- ষ্ট বঙ্গবিভাগ রোধ করার ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট এ দেশীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করলে মওলানা ইসলামাবাদী তাতেও অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে মুসলিম লীগের ‘দ্বি-জাতি তত্ত্বে’ নির‍ুৎসাহিত হয়ে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলন, কৃষক-প্রজা পার্টি, স্বরাজ্য আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং সফলতাও লাভ করেন। তাই বলা যায় মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদী জনমানুষের উদারনৈতিক নেতা হিসেবে আজীবন স্মরণীয়।

প্রান্তটীকা

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামাদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭০।

২। মোশাররফ হোসেন খান, *মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫-১০

৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

৪। মির্জা ইউসুফ আলী রাজশাহীর স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন।। তিনি ইমাম গাযালীর 'কীমিয়া-এ-সাআদাত' গ্রন্থের বংগানুবাদ করেন। অনূদিত বইটির নাম 'সৌভাগ্যের স্পর্শ মনি' তার সাহায্য ও সহযোগিতায় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৯০৩ সালে কোলকাতা থেকে *ছোলতান* পত্রিকা প্রকাশ করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫)

ছোলতান সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে পুনরায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস থেকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবেও প্রকাশিত হয়। (আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *অতীত দিনের স্মৃতি* (*Reminiscence*), ঢাকা, ১৯৮৫,পৃ. ১১৬)

৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩

৬। ড. সুনীল কান্তি দে, *আনজুমানে ওলামায়ে বাংলা ও মুসলিম সমাজ*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪

আল এসলাম মাসিক জার্নালটি ১৯১৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। এটি 'আঞ্জুমান-ই-ওলামা-বাংলা'র মুখপাত্র হিসাবে কাজ করত। কলকাতা থেকে ছয় বছর প্রকাশিত হয়। *আল এসলামে*র সম্পাদক ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এবং খেলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। খেলাফত আন্দোলনের পক্ষের প্রচারণা এই জার্নালে নিয়মিত প্রকাশ হত। (শামসুজ্জামান খান, *মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী*, ঢাকা , ২০০৬, পৃ. ২৩-৩০)

৭। মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান: ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা-* একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ২৪৯-২৫২

৮। পণ্ডিত মেরাজ উদ্দীন (১৮৫৯-১৯১৮) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন এই বিখ্যাত আলেম, সুপণ্ডিত ও লেখক । তিনি কলিকাতায় আলীয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের

অধ্যাপক ছিলেন পরে দেলদুয়ার জমিদার পরিবারের ম্যানেজারের পদে কর্মরত ছিলেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩)

৯। ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি এই এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি পদে কাজ করেন। এর শাখা বিস্তৃত হলে নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' করা হয় । (মুহম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৯৫)

১০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৭২

১১। মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫৩

১২। সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০–১৯৭২) ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ সময়ই দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের পক্ষে অবস্থান করেন। ১৯২৮ সালে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সৈয়দ নওশের আলী 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র প্রার্থী হিসেবে যশোর অঞ্চলে বিজয়ী হন। তিনি আজীবন কৃষক প্রজার বামপন্থী নেতা হিসেবে কাজ করে গেছেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৬ সালে শরৎ বসুর অখ= বাংলার পক্ষে কাজ করেন । তিনি অসাম্প্রদায়িক হিসেবে সারা জীবন রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেন। (Rana Razzaque, *Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947,*Unpublished Ph.D thesis, Dhaka University, 1997,p. 205-219)

১৩। সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত, *মওলানা ইসলামাবাদী*, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ৬১ – ৬২।

১৪। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৬২

১৫। মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

১৬। ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কংগ্রেসে যোগদান এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য দল' গঠিত হলে তাতেও যোগদান করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নব জাগরণ ও দেশ

মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অনল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন। (বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২-৪৪০)

১৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

১৮. Rana Razzaque, *Ibid*, p. 100-101

'প্যান ইসলামবাদ'–উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ অভ্যন্তরীণ সংকট এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবেলা করার জন্য তার শাসনের পক্ষে বিশ্বের মুসলমানদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে প্যান ইসলামবাদের কর্মসূচী প্রবর্তন করেন। (*https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Islamism)*

১৯। বলকান ইস্যু ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের প্রত্যক্ষ কারণ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বসনিয়া সংকটের জন্ম দেয় ১৯০৮-১৯০৯ সালে। ১৮৭৮ সালে অটোমান তুর্কিরা বলকান অঞ্চলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯০৮-০৯ সালে অস্ট্রিয়া,হাঙ্গেরি,বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নেয়। এতে এ দুই রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক প্যান স্যালভিক ও রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৯১২-১৯১৩ সালে প্রথম বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১১–১৩) সমগ্র বাংলাব্যাপী যে প্যান ইসলাম আন্দোলন চলে তাতে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। (*https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Wars)*

২০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩-১৭৬

২১। *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৭৪

২২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০,১৭৫

২৩। ইমতিয়াজ আহমেদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৯৩

২৪। মৌলবী আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রথম সারির পরিচালক ছিলেন। বর্ধমানের পাহাড় হার্টিতে এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। আবুল হাশিম তারই স্বনামধন্য পুত্র। মৌলবী আবুল কাশেম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহকর্মীরূপে বঙ্গভঙ্গ-রদ ও স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। *The Mussalmans* (১৯০৩) পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া *Progress, Muslim Standard, নবযুগ, মোসলেম বানী* প্রভৃতি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯২০ সালে মওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে প্রেরিত খেলাফত ডেলিগেশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মুসলিম লীগের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার ও পরে ভারতের কেন্দ্রিয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ ১৯৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮০)

২৫। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১২-১৩, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৬-৪৭,

২৬। সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

২৭। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

২৮। মুহম্মদ হায়দার আলী আকন, *মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর জীবন ও কর্ম*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ২৯১-৯২

২৯। 'মিত্র শক্তি' ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহ 'মিত্রশক্তি জোট' ও 'কেন্দ্রিয় শক্তি জোট, এ দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিত্র শক্তি জোটে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, জাপান ও ইটালি এবং কেন্দ্রিয় শক্তি জোটে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। তারা পরস্পর বিরোধী শক্তি হয়ে যুদ্ধ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই মিত্র শক্তি জোট জয়লাভ করে। (অতুল চন্দ্র রায়, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১১৭)

৩০। মওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের প্যান ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি *আল হিলাল* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক এবং ১৯২৪ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরকারী নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। (ইমতিয়াজ আহমেদ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৮৫)

সৈয়দ মজীদ বখ্‌শ যশোর জেলার অধিবাসী এবং ভারতীয় কংগ্রেসের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। লেখক মুহম্মদ আবদুল্লাহ সৈয়দ মজীদ বখ্‌শকে তাঁর গ্রন্থের একস্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সহ-সম্পাদক বলে উলে- খ করলেও একই গ্রন্থের অন্যত্র ঐ একই সংগঠনের সেক্রেটারি বলে উলে- খ করেছেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭)

৩১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৩-৭

৩২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

৩৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৩

৩৪। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ২০-২৩

৩৫। মুহম্মদ হায়দার আলী আকন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭-৩১৮

আলী আহমদ চৌধুরী (১৮৯০-১৯৩৮) চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার পাঠানটুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের কাজে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি *সাপ্তাহিক ছোলতানে*র সম্পাদক ছিলেন। তিনি মওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীর ভাবশিষ্যও ছিলেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১১৪-১১৫)

৩৬। মুহাম্মদ হায়দার আলী আকন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-৩২০

৩৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৩৮। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-৩০, আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭-৩৪০, ড. মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-২২১

৩৯। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৩৩) বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২-২৩ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এরপর দেশবন্ধুর স্বারাজ্য পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহের, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের উত্থাপিত পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের পাশাপাশি গান্ধীজী, মতিলাল নেহের প্রভৃতি নেতা কর্তৃক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রাখা হলে যতীন্দ্র মোহনের প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পাশ হয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬)

৪০। মুহাম্মদ হায়দার আলী আকন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯-৩২২।

৪১। সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭ -১৯৪৫) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি নেতাজি নামে সমধিক পরিচিত। সুভাষচন্দ্র পরপর দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত এবং কংগ্রেসের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিণ নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করার জন্য তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন গান্ধীজীর অহিংসার নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই কারণে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন। (প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৪৭)*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫১-৫৬)

৪২। সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫ Rana Razzaque, *Ibid*, P. 104-105

৪৩। মুহাম্মদ হায়দার আলী আকন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০-৩২২

৪৪। মোহাম্মদ ওয়ালী উল-াহ, *যুগ বিচিত্রা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

৪৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২

৪৬। মোহাম্মদ ওয়ালী উল-াহ, *যুগ বিচিত্রা*, ঢাকা,১৯৬৭, পৃ. ২৭৫

৪৭। সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৩৫

৪৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১, Rana Razzaque, *Ibid*, P. 109-110

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬ খ্রিঃ)

বিংশ শতকে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ ও গণআন্দোলনের নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। অল্প বয়সে মাতা-পিতা মারা যাওয়ায় সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে মওলানা ভাসানীর সর্বশেষ পাসপোর্টে উল্লেখ অনুযায়ী তিনি ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা হাজী শারাফাত আলী ও মাতা বেগম শারাফাত। অল্প বয়সে মাতা-পিতা হারিয়ে তিনি কিছুদিন চাচা ইব্রাহিমের আশ্রয়ে থাকেন এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন। চাচার আশ্রয় ত্যাগ করার পর মওলানা ভাসানীর দিনগুলো ছিল অত্যন্ড় করুণ। এ সময় শাহ নাসিরউদ্দীন বাগদাদী নামে এক ইরাকি পীর সিরাজগঞ্জে আগমন করেন। পীর সাহেব তাঁকে ১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইলের বল্লা গ্রামে তাঁর আশ্রয়ে প্রতিপালন করেন।[২] মওলানা ভাসানী পীর সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৩] লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা, কুস্তিড় ও কবিগানে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।[৪] মওলানা ভাসানী কবিগান করার পাশাপাশি যাত্রা দলে যাত্রাপালা করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন।[৫] তিনি বাঁধাধরা জীবন পছন্দ করতেন না। কখনও মুটে, কখনও কামলা, কখনও বাসার চাকর আবার কাজের লোক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। মাদ্রাসা ছাড়লেও মওলানা ভাসানী মাদ্রাসার প্রধান মওলানা বাকীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাঁর প্রভাবে ও পীর নাসির উদ্দীনের নির্দেশে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন[৬]।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ড় দেওবন্দে ছিলেন। সেখানে তিনি মওলানা হোসেইন আহমদ মাদানীর নিকট কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালে দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসা ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র থাকার ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিষয়টি তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।[৭] দেওবন্দে মওলানা ভাসানী অনেক প্রগতিশীল ইসলামী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রগতিশীল চিন্ড়া চেতনায় সিক্ত হন। এই দেওবন্দেই তিনি স্থির করেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

সে লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং নিপীড়িত নির্যাতিত তথা মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা।[৮] দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে আবদুল হামিদ কিছুদিন টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এ সময় কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সন্তোষের জমিদারের নায়েব, গোমস্তার সাথে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। জমিদার ভাসানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সকলের পরামর্শে তিনি আত্মগোপণ করে ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে কলাগ্রামে আশ্রয় নেন। এখানে কিছুদিন আত্মগোপণ করার পর তিনি আসামের জলেস্বরে পীর নাসির উদ্দীনের আস্তানায় চলে যান। তাঁর সান্নিধ্যে তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন। তিনি পীরের মুরিদ হন।[৯] পরবর্তীতে তিনি লাখ লাখ মানুষের পীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[১০]

১৯০৫ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। বাংলার ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী এবং সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলা ছিল রাজনৈতিকভাবে সচেতন অঞ্চল। তাই স্বদেশী আন্দোলনকারীরা বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করে।[১১] ১৯০৯ সালে যখন আসামে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান সারা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছে। আবদুল হামিদ খানের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বা বিপক্ষে কি ভূমিকা ছিল তিনি কখনও প্রকাশ করেননি।[১২] এসময় তিনি আসামের জলেস্বর থেকে কলকাতায় গমন করেন। এখানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জনৈক মুখলেস নামক ব্যক্তি তাঁকে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করে অস্ত্র ও লাঠি চালনা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া কবিগান ও যাত্রা পালা তাঁকে একজন প্রতিবাদী স্বদেশীতে পরিণত করেছিল। লাঠিখেলা ও কবিগানের আসরে কৃষক, মজুর, তাঁতী, জেলে, কামার-কুমার এইসব সাধারণ মানুষের

সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনের বঞ্চণার কথা শুনতে শুরুতেই তিনি তাদের পক্ষে লড়াই করার মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। বলা যায় ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা আবদুল হামিদ খান প্রভাবিত হন এবং সশস্ত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন। স্বদেশী আন্দোলন কালে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি চরমপন্থীদের সাথে যুক্ত ছিলেন।[১৩] উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি অত্যাচারী মহাজনদের গোলাঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং শেরপুর জেলায় কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতি পরিচালনায় জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। তবে নিজে কোন ডাকাতি বা হত্যাকান্ডে অংশ নেননি। ১৯১৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় চরমপন্থী রাজনীতি পরিত্যাগ করেন।[১৪] উল্লেখ্য এসময় অনুশীলন ও যুগান্তর দলে মুসলমান যুবকের সংখ্যা অত্যন্ড় কম ছিল।[১৫] সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে তরুণ বয়সে আবদুল হামিদ খান সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোসহীন।[১৬] টাঙ্গাইলের কাগমারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় তিনি এ অঞ্চলের জমিদার ও মহাজনদের নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। টাঙ্গাইলে দুই বছর থেকে তিনি বগুড়ার পাঁচবিবিতে গমন করেন। পাঁচ বিবির জমিদার শামসুদ্দীন চৌধুরী মওলানা ভাসানীর সাহস, সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর সহকারি নিয়োগ করেন। মওলানা ভাসানী জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক ও খাজনা পরিচালনা করতেন এ উপলক্ষে তাঁকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হতো। কলকাতায় তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সাথে পরিচিত হন। তিনি জমিদারের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি জমিদার শামসুদ্দিন চৌধুরীর সাথে মক্কায় গমন করেন এবং হজ্জ ব্রত পালন করেন। জমিদারের সহকারি হিসেবে কাজ করার সময় কৃষকদের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেন। কৃষকদের দুরবস্থা, মানবেতর জীবন যাপন আর তাদের উপর জমিদারের শোষণ ও নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে তিনি ক্ষুব্ধ হন।[১৭] তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মুখ সারিতে ছিলেন

চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বাঙালি। এসব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সভা সমিতিতে বক্তৃতা শুনে তিনি রাজনীতিতে অনুপ্রাণীত হন। অবশ্য এসময়ে ভারতীয় রাজনীতি পরিচালিত হত উচ্চবিত্তদের দ্বারা এখানে বিত্তহীনদের বিশেষ করে গরিব কৃষক বা গরিব মানুষের রাজনীতিতে কোন স্থান ছিল না। উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল মুসলিম লীগ। তাছাড়া কংগ্রেসেও সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার ছিল না।[১৮] তাই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগে মওলানা ভাসানীর কোন আস্থা ছিল না। আবার সর্ব কংগ্রেসের রাজনীতিও তাঁকে আকর্ষণ করেনি।[১৯]

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা শুনে মওলানা ভাসানী বিশেষভাবে প্রভাবিত হন কিন্তু সিরাজীর মতের সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। কারণ ইসমাইল হোসেন সিরাজী শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আস্তাশীল ছিলেন। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল গরিবদের শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করেন।[২০] ১৯১৫ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় তিনি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকার ফলে এবং সুবক্তা হওয়ার কারণে মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল অনেক তবে তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি ধর্মান্তরিত করণেও বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের খ্রিস্টান করার যেমন বিরোধিতা করেছেন তেমনি বিরোধিতা করেছেন হিন্দু থেকে মুসলমান করার। মওলানা ভাসানী ছিলেন উদারপ্রাণ মুসলমান।[২১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) পরবর্তী এক দশক কাল মওলানা ভাসানীর জীবনে অতি গুর“ত্বপূর্ণ সময় বলে ধরা হয়। এই সময়কালে তিনি পাক ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন ইসলামী চিন্‌্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। তাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, আল-ামা আজাদ সোবহানী, মওলানা হযরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল-াহ সিন্ধি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য।[২২]

তাদের বিপ্লবী ও ইসলামী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন।[২৩] সে প্রভাব তাঁর মধ্যে আজীবন সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল।[২৪] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯১৭ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এর পূর্বে তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হন চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতি দ্বারা। তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন। তিনি কংগ্রেস দলে কাজ করে চিত্তরঞ্জন দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে দর্শক হিসেবে তিনি যোগ দেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহে কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন। এ সময় আবদুল হামিদ চিত্তরঞ্জন দাসের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি যুবক আবদুল হামিদের মধ্যে অগ্নিশিখা আবিষ্কার করেন। মওলানা ভাসানী এমন একজন মুসলমান, একদিকে ধার্মিক অন্যদিকে কৃষকদের আপন এমন লোককেই খুঁজছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। ১৯১৯ সাল থেকে মওলানা ভাসানী সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[২৫] মওলানা মুহম্মদ আলী ও চিত্তরঞ্জন দাসের উপদেশে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে মওলানা ভাসানী গ্রেফতার হন এবং সাত মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। এ সময় তিনি অনেক নির্যাতিত নেতা কর্মীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে আসার সুযোগ হয় মওলানা ভাসানীর । সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৭৪) ও তাঁর কন্যা এসেছিলেন । এ সময় চিত্তরঞ্জন দাসের দেশপ্রেম ও জনসেবায় মুগ্ধ হন মওলানা ভাসানী এবং চিত্তরঞ্জন দাসের স্নেহভাজনকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৯) তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নিয়ে মিত্র শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম জনগণের খলিফা হিসেবে মান্য করতো। কূটকৌশলী ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন

লাভের জন্য অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে, যুদ্ধের ফলাফলে তুরস্ক খেলাফতের কোন প্রকার ক্ষতি করা হবে না অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে মিত্রশক্তি কর্তৃক পরাজিত তুরস্কের খন্ডি-বিখন্ডি মুসলমানদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্য বাংলাসহ সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে যা 'খেলাফত আন্দোলন' নামে খ্যাত। অন্যদিকে খেলাফত আন্দোলন দমন করার জন্য ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার 'রাওলাট আইন' পাশ করে। ভারতীয় কংগ্রেস এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায় যাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সকলেই যোগ দেয়। ফলে খেলাফত আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২০ সালে ভারতে খেলাফত আন্দোলন শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, হাকীম আজমল খাঁ প্রমুখ কংগ্রেসে যোগদান করলেও মওলানা ভাসানী খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং উভয় সংগঠনে কাজ করে যাচ্ছিলেন।[২৭] ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে খেলাফত বিষয়ক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[২৮] উভয় সম্মেলনে মওলানা ভাসানী প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।[২৯] ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে লালা লাজপাত রায়ের সভাপতিত্বে সেখানে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[৩০] ১৯২১ সালে সারা বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। এ আন্দোলনে আবদুল হামিদ সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এই সময় আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন ও এক সপ্তাহ জেলে কাটান।[৩১]

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ও মহামারী দেখা দিলে চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র বসু ও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ দেশ বরেণ্য নেতৃবৃন্দ এই এলাকায়

আসেন।[৩২] তাঁদের সঙ্গে মওলানা ভাসানী বন্যাপীড়িতদের মাঝে ত্রাণকাজে অংশ নেন। একাজ পরিচালনায় মওলানা ভাসানীর সততা, পরার্থপরতা ও পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে তুষ্ট হয়ে দেশ বন্ধু তাঁকে ময়মনসিংহ ত্রাণ শিবিরের উপনেতা নিযুক্ত করেন। ত্রাণকার্য মওলানা ভাসানীর জীবনে যে প্রভাব রেখেছিল তা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"১৯২২ সনের বন্যা আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। উত্তর বঙ্গে এক অভাবনীয় বন্যা হইয়াছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অতিবৃষ্টির দরুন শান্তাহার জংশনে কোমর সমান পানি হয়ে গিয়েছিল। রিলিফের কাজে আমরা কয়েকজন সেখানে পৌঁছিয়া কিভাবে কি করা যায় ভাবিতেছিলাম। একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসিয়া হাজির, সঙ্গে ছিলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তান সুভাষ বসু। দেশ বন্ধুর হাতে দশ সের চিড়ার একটি পোটলা ছিল। উহা লইয়া তিনি যখন পানিতে নামিয়া পড়িলেন তখন আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি নাই। এই স্মৃতিচারণ আমি কতদিন করিয়াছি। ভাবিয়াছি এই বুঝি আমার রাজনৈতিক জীবনে খুবই একটি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" [৩৩]

মহাত্মা গান্ধী খেলাফত আন্দোলন সমর্থনের পাশাপাশি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধী আন্দোলনকে অহিংস নীতির উপর পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এক উত্তেজিত জনতা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানায় অগ্নিসংযোগ করলে একুশজন সিপাহী ও একজন সাব-ইনস্পেক্টর জীবন্ত দগ্ধ হয়। [৩৪] গান্ধী তাঁর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের এরূপ সহিংস পরিণতি দেখে মর্মাহত হন এবং ১৯২২ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ করেই আন্দোলন বন্ধ করার ঘোষণা দেন। অন্যদিকে তুরস্কের কামাল পাশা খেলাফতের অবসান করলে খেলাফত আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে সারা দেশে একটি রাজনৈতিক শুণ্যতার সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী চিত্তরঞ্জন দাসসহ অনেক নেতাই তখন কারারুদ্ধ থাকায় রাজনীতিতে ঘোরতর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।[৩৫] মানুষ এ সময় ছিল

আন্দোলনমুখী এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবধান যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত নেতা উদারতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনকল্পে আলোচনা শুর" করেন এবং একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। এসব নেতাদের মতো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎ চন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মুজিবুর রহমান, মওলানা মনির"জ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁর নাম বিশেষ উলে-খযোগ্য।[৩৬] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন কংগ্রেসের একজন জনপ্রিয় নেতা। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে আইন পরিষদে যোগ দেয়ার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈততার তৈরি হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে অবস্থান করেন চিত্তরঞ্জন দাস, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী বিপক্ষে অবস্থান করেন। ফলে মহাত্মা গান্ধীর সাথে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং তিনি কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁর সমর্থকদের নিয়ে গঠন করেন 'স্বরাজ্য দল'(১৯২৩)। চিত্তরঞ্জন দাস এই দলের সভাপতি এবং মতিলাল নেহের" সম্পাদক হন।[৩৭] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষ চন্দ্র বসুর তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মওলানা ভাসানী বাংলায় বিশেষকরে উত্তরবঙ্গে গ্রাম গ্রামান্ড়রে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের পক্ষে যুগপৎ কাজ করতে থাকেন। কারণ তাঁর রাজনৈতিক পথিকৃৎ হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ বসু দুজনকেই শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বরাজ্য দলে কাজ করার সময় আবদুল হামিদ খান জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও নির্যাতনের সমস্যা অনুধাবন করে সমাধান করার জন্য স্বরাজ্য দলের নেতাদের কাছে দাবী উপস্থাপন করেন।[৩৮]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় মওলানা ভাসানী কর্মহীন হয়ে পড়লে তিনি জামালপুরের বাহাদুরাবাদ স্টিমারঘাট মসজিদে ইমামের চাকরি গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি

স্থানীয় লোকদের সংগঠিত করেন এবং তারা পরবর্তীকালে ভাসানীর মুরিদ ও কর্মী হন। উত্তর বাংলা বন্যায় প-াবিত হলে তিনি ক্ষতিগ্রস্থদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে মওলানা ভাসানীর পরিচয় হন। এসময় মওলানা ভাসানী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আসেন এবং রাজনীতি ও দেশের আজাদী বিষয়ক আলোচনার সুযোগ লাভ করেন।[৩৯] ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আবদুল হামিদ খান যোগদান করেন।[৪০] চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের সমর্থন ও হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনের জন্য ১৯২৪ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদন করেন।[৪১] হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মূর্ত প্রতীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৫ সালে ১৬ জুন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২] ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পর কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুটা আন্দোলনমুখর হয়ে উঠলে ষড়যন্ত্রের মুখে উপায়ান্ড়র না পেয়ে মওলানা ভাসানী আসামের ধুবড়ীতে চলে যান। তিনি স্থির করেন যে, সমাজের সর্বহারা, আধা-সর্বহারা ও পদানত মানুষের মুক্তির যে রাজনীতি বিশেষ করে সমস্ড় জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণের কবল থেকে বাঙ্গালি দরিদ্র কৃষকদের মুক্তির যে দীক্ষা তিনি নিয়েছেন তাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।[৪৩] উত্তর বাংলা থেকে গরীব জনগোষ্ঠি আসামে জঙ্গল পরিস্কার করে বসতি শুর“ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলা থেকে কয়েক লাখ লোক আসামে বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে আসাম সরকার বহিরাগত কৃষকদের স্বাগত জানায় কিন্তু পরে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আবদুল হামিদ খান তাদের সংগঠিত করে ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসানচরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। স্মরণকালে এতবড় কৃষক সম্মেলন এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়নি। সম্মেলনের সাফল্য দেখে লোকে আবদুল হামিদকে ভাসানীর মওলানা ডাকতে শুর“ করে এবং পরবর্তীতে এই নামেই তিনি দেশে বিদেশে পরিচিতি পান। এভাবেই ত্রিশের দশকে তিনি আসামের কিংবদন্ড়ীতে পরিণত হন।[৪৪] ১৯২৫ সালে বগুড়ার পাঁচবিবির জমিদার

শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর কন্যা আলেমা খাতুনকে বিবাহ করেন এবং তাকেও আসামে নিয়ে যান। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এসময়ে তিনি উত্তর বঙ্গ ও আসামে ছিলেন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচারই ছিল তাঁর গুর–ত্বপুর্ণ কাজ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে অসাম্প্রদায়িকতার দীক্ষা লাভ করেন। মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু-মুসলিমের সংমিশ্রণেই দেশগঠন হয়েছে। হিন্দু কৃষকের যে অবস্থা, মুসলমান কৃষকের সেই একই অবস্থা। কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিন ভাসানীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মুল্যায়ণে বলেছেন- তাঁর ভাষায়,

"মওলানা ভাসানী ছিলেন মতবাদবাদী, ধর্ম ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে বাঙ্গালী জাতির ঐক্যের কথা বলতেন। জাতি সম্পর্কে এরকম চিন্‌ড়ার অধিকারী ব্যক্তি কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর আদর্শ স্থানীয়, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ... ভাসানী জামায়াতে ইসলামীর ইসলামের নামে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্‌ড়বাদকে সেবা করার ও গণতন্ত্র এবং বাঙালি জাতিসত্তা ও জনগণের বিরোধিতার রাজনীতির মূলে আঘাত করেছিলেন; তিনি তাদের সাথে কোনো প্রকার, কোন ক্ষেত্রে আপোস করেননি, তাদের কোনদিন কোন বিষয়ে প্রশ্রয় দেননি, তবু যারা আজও মওলানা ভাসানী সাম্প্রদায়িক কিনা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন তারাও দেশের গণতন্ত্র ও জাতিসত্তার ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্ত এবং উদাসীন"।[৪৫]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক পরিসীমা ছিল নির্যাতিত-নিপীড়িত কৃষক সমাজ। তাই বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে মওলানা ভাসানী বাংলা ও আসামে জমিদার ও মহাজনী প্রথার বির–দ্ধে কৃষক-প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি বেশ কয়েকটি কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে অকল্পনীয় সাড়া জাগিয়ে এবং এ অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট কিংবদন্‌ড়ীর কৃষক নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৪৬] তার পূর্বে যারা কৃষক আন্দোলন করেছেন তারা কৃষক প্রতিনিধি বা কৃষকদের কাছের মানুষ ছিলেন না। ১৯১৪ সালে এ কে

ফজলুল হকের নির্দেশে শেখ মুহাম্মদ চৌধুরী জামালপুর জেলার কুমারচরে এক কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে কৃষক নেতা স্যার আব্দুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৮-১৯৬৮), এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এ সকল নেতারা যদিও জমিদারদের বির—দ্ধে ছিলেন কিন্তু তারা নিজেরা কৃষক বা তাদের কাছের লোক ছিলেন না।[৪৭] মওলানা ভাসানী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। আর তিনিই ছিলেন প্রকৃত কৃষক নেতা ; তিনি নিজে কৃষক এবং তাদের অতি নিকট লোক ছিলেন। ১৯২৮ সালে মওলানা ভাসানী কলকাতায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী যোগদান করেন। একই সময়ে কংগ্রেসেরও অধিবেশন বসে। মওলানা ভাসানী এই সম্মেলনেও যোগদান করেন। এই অধিবেশনে নবীন-প্রবীণ সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদল চায় ডোমিনিয়ান স্টেটাস; তর—ণরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। মওলানা ভাসানী পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন। এ সময় উচ্চবিত্ত শ্রেণির রাজনীতির প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। রাজশাহী জেলার ধূপঘাটের জমিদারের সঙ্গে মওলানা ভাসানী ও তাঁর লোকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ফলে তাঁর উপর অত্যাচার শুর— হলে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে চলে যান এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। এখানেও জমিদার মহাজনের অত্যাচার শুর— হলে পাবনায় চলে যান। তারপর পাবনা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। তিনি এ সময় চলে যান রংপুর ও দিনাজপুরে। কৃষকদের পক্ষে কাজ করার সময় এভাবেই তিনি নানা রকম নিপীড়নের স্বীকার হন এবং হয়ে ওঠেন কৃষক নেতা।[৪৮] ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিমকে সভাপতি; এ কে ফজলুল হক, আবদুল মোমেন ও আবদুল করিমকে সহ-সভাপতি এবং মওলানা আকরম খাঁকে সম্পাদক করে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'(১৯২৯) গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী বঙ্গীয় প্রজা সমিতির নেতা ছিলেন।[৪৯] সরকারের পক্ষ থেকে কৃষক সম্মেলন আহবান করা মওলানা ভাসানীর জন্য নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও

তিনি ১৯৩০ সালে টাঙ্গাইলে ঈদের দিনে এক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ঈদের জামাতকে কৃষক সম্মেলনে রূপদান করেন। টাঙ্গাইলের কৃষক সম্মেলন বানচাল করতে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি কারণ এ ছিল ঈদের জামাত। এভাবে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কৃষক আন্দোলন গতিশীল রাখেন।[৫০]

১৯৩১ সালে বন্যায় উত্তর বাংলা ভেসে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের ত্রাণ কাজে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দিনরাত কাজ করেন। এ সময় মওলানা ভাসানী প্রথম বারের মতো হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পরিচিত হন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে টাঙ্গাইলের চাড়াবাড়ি ঘাটে মওলানা ভাসানী কৃষক–খাতক সম্মেলন করেছিলেন যেখানে সভাপতিত্ব করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনে অনেক হিন্দু-মুসলমান নেতা যোগ দিয়েছিলেন।[৫১] ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাওয়াখোলা নামক গ্রামে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক ঐতিহাসিক আসাম-বাংলা কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের পরে তাঁর নাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রজা সমিতি থেকে আলাদা ছিল। সিরাজগঞ্জ কৃষক সম্মেলন সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর লেখা *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থে লিখেছেন, “ময়মনসিংহ জিলার সর্বত্র যখন প্রজা আন্দোলনের বিস্তৃতি ও শক্তি ক্রমশ বাড়িয়াছিল, এমন সময় আরেকটি ঘটনায় প্রজা সমিতির আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব এসময় (১৯৩২ সালের ডিসেম্বর) সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সম্মেলন ডাকলেন। মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্মেলনী উদ্বোধন করিবেন এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সভাপতি। এই সম্মেলনী নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির উদ্যোগে হয় নাই। মওলানা ভাসানী নিজ দায়িত্বেই ডাকিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা একটি জিলা প্রজা সম্মিলনীতেই পর্যবসিত হইত। কিন্তু একটা বিশেষ ঘটনায় এই সম্মেলনী সারা দেশীয় গুরুত্ব লাভ করিল। সিরাজগঞ্জের এস ডি ও মওলানা ভাসানী ও সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরদের উপর ১৪৪ ধারা জারি করিলেন।

শহীদ সাহেব মোমিন সাহেব এই লইয়া গভর্নরের সহিত দরবার করেন। শেষ পর্যন্ড় গভর্নর এস ডি ওর আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলায় প্রায় সকল জিলা হইতে প্রজা কর্মীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সম্মিলনীতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ময়মনসিংহ জিলার বহু কর্মী লইয়া আমিও এই সম্মিলনীতে যোগদান করি। গিয়া দেখি এলাহী কারখানা, সম্মিলনি ত নয় একেবারে কুম্ভমেলা। জনতাকে জনতা লোকের মাথা খায়, হয়তোবা লক্ষ লোকই হইবে। সদ্য ধানকাটা ধানক্ষেত সমূহের সীমাহীন ব্যাপ্তি যতদূর নযর যায় কেবল লোকের অরণ্য। এই বিশাল মাঠের মাঝখানে প্যান্ডাল করা হইয়াছিল। প্যাণ্ডেল মানে একটি চারিদিক খোলা মঞ্চ। উপরে একটি শামিয়ানা। সেই বিশাল জনতার মাথার সে শামিয়ানাটা যেন একটা টুপিও নয়, টিকি মাত্র।

সম্মিলনীর কাজ শুর“ হইবার অনেক দেরী ছিল। মনে হইল একবার ডেলিগেট ক্যাম্পটা ঘুরিয়া আসি। আমার জিলার সহকর্মী ডেলিগেটরা সেখানে ছিলেন। আমি নিজে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে মেহমান হইয়াছিলাম। কাজেই সহকর্মীদের তত্ত্ব-তালাস লওয়া কর্তব্য। ডেলিগেট ক্যাম্পে দেখিলাম স্বয়ং মওলানা সাহেবই ডেলিগেটদের খোঁজ খবর করিতেছেন। মওলানা ভাসানী সাহেবের সহিত এই আমার প্রথম পরিচয়। মওলানাকে ভাবিয়াছিলাম ইয়া বড় বুড়া পীর। দেখা পাইলাম এক উৎসাহী যুবকের। আমার সমবয়স্কই হইবেন। দাড়ী মোচে একটু বেশী বয়সের দেখায় আর কি? আলাপ করিয়া খুশী হইলাম। হাসি খুশী মেজাজ । কর্মচঞ্চল। অস্থিরতার মধ্যেও একটা বুদ্ধির দীপ্তি ও ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাইলাম।

...সম্মিলনীর কাজ সাফল্যের সহিত সমাধা হইল। খান বাহাদুর মোমিনের ডিক্টেশনে আমার হাতের লেখা অনেকগুলি ও গুর“ত্বপূর্ণ প্রস্ড়াব সম্মিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সব প্রস্ড়াবের মধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নযরসেলামী বাতিল, জমিদারের প্রিয়েমশনাধিকার রদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, চক্রবৃদ্ধি সুদ বেআইনী ঘোষণা ইত্যাদি কৃষক খাতকদের স্বার্থের মামুলী দাবীসমূহ ত ছিলই। তার উপরে ছিল দুইটি নয়া প্রস্ড়াব।

কয়েক মাস আগেই ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড নামে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাহির হইয়াছিল। সকল দলের হিন্দুরা উহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজেই আমাদের নেতারা মনে করিলেন, আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার অতএব রোয়েদাদের সমর্থনে প্রস্ড়াব পাশ হইল। অপরটি ছিল কৃষি খাতকদের ঋণ আদায়ের উপর মরেটরিয়ম প্রয়োগের দাবী। তারই উপদেশ মত এই প্রস্ড়াবটি কৃষি খাতক ঋণের উপর দস্ড়রমত একটা থিসিস লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রস্ড়াবে বলা হইয়াছিল বাংলার কৃষিখাতকের ঋণের বোঝার প্রায় সবটুকুই চক্রবৃদ্ধি সুতরাং অন্যায়। উহা শোধ করার সাধ্য কৃষকদের নেই। মূলতঃ ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালের বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাশ হইয়াছিল এবং ১৯৩৭ সালে সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। এই দিক হইতে সিরাজগঞ্জের এই কনফারেন্সের ঐতিহাসিক গুর"ত্ব রহিয়াছে। এই সম্মিলনীর ফলে মওলানা ভাসানী, মোমিন সাহেব ও শহীদ সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল।”[৫২]

এই সম্মেলন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী লিখেছেন, “... ১৯৩৭ সালে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে তিনদিন ব্যাপী বঙ্গ-আসাম প্রজা-সম্মেলনে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। ...উক্ত সম্মেলনে কৃষকদের ঋণের তালিকার যে কাগজ সংগ্রহ করা হয় তাহার ওজন ২০ সের হইয়াছিল। তিনদিনের সম্মেলনে ১৮ হাজার মন চাউল, ৮৩২টি গর", ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি খরচ হইয়াছিল। ইহা আরব্য উপন্যাসের গল্পে নহে অতি বাস্ড়ব ঘটনা।”[৫৩]

এ সম্মেলনের পর ইংরেজ সরকার মওলানা আবদুল হামিদ খান সম্পর্কে সতর্ক হয়। সম্মেলনে মূল প্রস্ড়াব ছিল কৃষকদের ঋণের আসল ও সুদের সমুদয় টাকা মওকুফ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস ও সালামী বন্ধ প্রভৃতি। ১৯৩৮ সালে ভাসানীর আহবানে রংপুর জেলার গাইবান্ধায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন করে জমিদারদের বির"দ্ধে কৃষকদের উত্তেজিত করার অভিযোগে তাঁকে পুনর্বার বাংলা থেকে বহিস্কার করা হয়।

তিনি স্থায়ীভাবে আসামে বসবাস শুর― করেন এবং আসামে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী করেন।[৫৪]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আসামে কৃষক আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের চরম বিকাশ ঘটে। কেননা হাজার হাজার উদ্বাস্তু নিয়ে তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলেন। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, রংপুর, পাবনা, নোয়াখালী, কুমিল-া জেলা হতে কয়েক লাখ গরিব কৃষক আসাম আগমন করে এবং তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে জনপদ গড়ে তোলে। আসাম সরকার প্রথমে তাদের কৃষি জমি বরাদ্দ করে উৎসাহিত করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে 'লাইন প্রথা' চালু করেন।[৫৫] ১৯৩৩ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ড় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'লাইন প্রথা'র বির―দ্ধে আন্দোলন চলে। আসামের বাঙালি কৃষকগণ 'লাইন প্রথা' ভঙ্গ করে বসতি বৃদ্ধি করে। 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে ভাসানী অসংখ্য সম্মেলন করে বাঙালি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন। তিনি আসাম সরকারের 'লাইন প্রথা'র বির―দ্ধে তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন।[৫৬] ১৯৩৬ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ভাসানচরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ফলে সারা আসামে আলোড়ন তৈরি হয়। ফলে মওলানা ভাসানী আসাম প্রদেশে শক্তিশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ১৯৩৭ সালে তাঁকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। একই বছর তিনি আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যও নির্বাচিত হন।[৫৭] ফলে আসামে ভাসানীর প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং লাখ লাখ বাস্তুহারা বাঙালি স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সরকারি দলের সদস্য হয়ে আসামের মুখ্য মন্ত্রী মুহাম্মদ আবদুল-াহর সাথে বাস্তুহারাদের নিয়ে প্রায়ই মতবিরোধ হতো। ১৯৩৭ সালে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহুত কামরূপ জেলার বড় পেটায় অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন। কেন্দ্রিয় নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। কৃষক মজুরদের সংগঠিত করে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে

১৯৩৭ সালে ভারতের সকল প্রদেশের মতো আসামেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয় লাভের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী আসামের সর্বত্র জনসভা করেন। তিনি অসহায় বাঙালি কৃষক মজুরদের রক্ষার জন্য মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন আবার একই কারণেই নির্বাচনে প্রার্থীতা করেন। মওলানা ভাসানী দক্ষিণ ধুবড়ী থেকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী রূপে জয় লাভ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ড় আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আসাম আইন সভায় প্রথম তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরবর্তীকালে আসাম বিধান সভায় বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায়। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় তিনি একজন সমাজ সচেতন ও জ্ঞানময়ী বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৫৮]

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা থেকে প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক, আসাম থেকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও আইন সভার সদস্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লাহোর অধিবেশনে যোগদান করেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক এই লাহোর অধিবেশনে 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব'(১৯৪০) উপস্থাপন করেন।[৫৯] মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা ভাসানী লাহোর প্রস্ড়াব সমর্থন করেন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের ৩০-৩১ তারিখ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা ভাসানী আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার দাবী জানান।[৬০]

১৯৪৪ সালের ৭-৮ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বড়পেটায় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই ভাসানী সম্মেলন আহবান করেন। তাঁর অক্লান্ড় শ্রমে শহরে, গ্রামে মুসলিম লীগের শাখা গঠন করা হয় এবং আসামের সকল মুসলমান মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' অর্থাৎ বাঙালি বিতাড়ন আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।[৬১] আসামের হিন্দু সংগঠন অহম জাতীয় মহাসভার উদ্যোগে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন

চলে। শুধুমাত্র অসমীয়াদের স্বার্থের জন্য সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বির"দ্ধে মওলানা ভাসানী কঠোর অবস্থান নেন এবং সর্বাত্মক চেষ্টা শুর" করেন যাতে আসাম পাকিস্ড়ানের সাথে যুক্ত হয়।[৬২] ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন মওলানা ভাসানী আসামের মঙ্গলদইয়ের করোনেশন ময়দানে 'প্রজা মজুর সমিতি'র এক বিশাল সম্মেলন আয়োজন করেন। হাজার হাজার বহিরাগত কৃষক লাঠি-সোটা নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেয় এবং পাকিস্ড়ানের পক্ষে শে-াগান দেয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন *দৈনিক আজাদের* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।[৬৩] তিনি ভাসানীর আহবানে সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় তিনি 'লাইন প্রথা' উচ্ছেদের জন্য মুসলিম লীগকে আপোসহীন ভূমিকা পালনের আহবান জানান।[৬৪] 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলন যতই জোরদার হয় ততই আসাম সরকার কঠোর হচ্ছিল বাঙ্গালি কৃষকদের উচ্ছেদ অভিযানে। ১৯৪৬ সালের ৭ নভেম্বর ভাসানীর সভাপতিত্বে আসাম মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পরে মওলানা ভাসানীর নির্দেশে আসাম মুসলিম লীগ বহিরাগত চাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন শুর" করে।[৬৫] এসময় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ আইন অমান্য আন্দোলনে সর্বাত্মক সাহায্য দানের প্রতিশ্র"তি দেয়।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আসাম ও বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বয়ের যৌথ এক জর"রী সভা মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহের বাহাদুরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটিশের দু'শ বছরের নির্যাতন নিপীড়নের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আসাম সরকার কর্তৃক জনসাধারণের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য তিনি বিপ্লবের ডাক দেন। একদা অনুন্নত আসামের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাঙালি কৃষকদের অবদানের বিস্ড়ারিত বিবরণ দেন। ১৯৪৭ সালে ফেব্র"য়ারি মাসে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা সিলেটের মৌলভীবাজার শহরে মঈনুদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাসানীর নেতৃত্বে একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয় এবং সভায় আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।[৬৬] ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৭ সালের

৬-৭জুলাই অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটে মওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দেন। অনেকটা তাঁরই নির্দেশে সিলেট পাকিস্ড়ানের পক্ষে বিজয় অর্জন করে। মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট প্রদানে একটি অসাম্প্রদায়িক বিবৃতি দেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন,

"... গণভোটের সময় সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি। অনেকেই পাকিস্তান সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের মনে ভুল ধারণা জন্মাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। আমি প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তাহারা পাকিস্তানে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।" ১৯৪৭ সালে ভাসানী আসামে ৩রা, ৪ঠা মার্চ পর পর 'বেঙ্গল-আসাম মুজাহিদ সম্মেলন' 'ন্যাশনাল গার্ডস সম্মেলন' 'নওজোয়ান সম্মেলন' ও 'লিটারারি সম্মেলন' আয়োজন করেন এবং পুনরায় কারাগারে আটক হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যখন পাকিস্ড়ান সৃষ্টি হয় তখনও তিনি আসামের জেলে অন্ড়রীন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামের বরদুলাই সরকার তাঁকে সিলেট সীমান্ড়ে এসে মুক্তি দেয় এই শর্তে যে, তিনি আর আসামে প্রবেশ করবেন না। তাই মুক্তি লাভ করে তিনি ধুবড়ী থেকে স্বপরিবারে টাঙ্গাইলের সন্ড়োষে চলে আসেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ড় ১৯/২০ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে মওলানা ভাসানী আসামে ছিলেন না। মাঝে মাঝেই তিনি পূর্ব বাংলায় এসেছেন এবং এখানকার কৃষক প্রজাদের জমিদার বিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা ব্যাপারে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের আহবানে মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় যেতেন। তবে আসামের নেতৃত্বাধীন বহিরাগতদের একা ফেলে তিনি অন্যত্র যাবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। এভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে আসামে স্থায়ী হন।[৬৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সরকারি দল মুসলিম লীগকে কার্যত একটি পকেট সংগঠনে পরিণত করে। মুসলিম লীগের জ্ঞানী পরীক্ষিত নেতাদের সরকার ও দলে কোন স্থান হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাঙালিদের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ ভুলে গিয়ে উর্দু

ভাষী পশ্চিম পাকিস্ড়নী নেতৃবৃন্দ চরম বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাব দেখায়। তাছাড়া মুসলিম লীগ শুর্ থেকেই দেশ পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক পথকে বেছে নেয়। এককথায় মুসলিম লীগ সরকার ও দল হিসেবে দেশ পরিচালনায় চরম বৈষম্য, ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার, দমননীতি অনুসরণ করে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিম লীগের একদল আত্মসচেতন, উদারপন্থী ও অসাম্প্রদায়িক তর্ণ রাজনৈতিক কর্মী স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম থেকেই পরিষদ ও পরিষদের বাইরে মুসলিম লীগের বির্দ্ধে অভিযোগ তুলেন এবং নতুন দল গঠনকে সমর্থন দেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার স্বামীবাগে কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়ুনের রোজ গার্ডেন বাসভবনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। এখানে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং ইয়ার মোহাম্মদকে সম্পাদক করে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।[৬৮] ৩০০ প্রতিনিধি এতে অংশ নেয় এবং শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মওলানা ভাসানী, কামর্দ্দীন আহমেদ, মওলানা রাগীব আহমেদ, খান সাহেব ওসমান আলী, অলি আহাদ, শেখ আবদুল আজিজ, কাজী গোলাম মাহবুব, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোস্ড়াক আহমেদ, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ যোগ দেন।[৬৯] সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।[৭০] এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি উচ্চবিত্ত ও একক পরিবার থেকে ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তদের কাছে চলে আসে। নব গঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ক্রমান্বয়ে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়।[৭১] মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সাল হতে ১৯৫৭ সালের ২০ মার্চ পর্যন্ড় পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।[৭২] সভাপতি থাকাকালীন পূর্ববাংলা সফর

করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করেন। মওলানা ভাসানী ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের লেখায়।

"... ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া নিজ জেলা ময়মনসিংহ আসি। বেশ কিছুদিন ধরিয়া দুরন্ত আমাশয়ে ভুগিতেছিলাম। শরীরটা খুবই খারাপ যাইতেছিল। নিজের জন্মভূমি হইলেও মোহাজের কাজেই রোজগারের জন্যই ওকালতিতে মনোযোগ দেওয়া দরকার। এ অবস্থায় স্থির করিয়াছিলাম সক্রিয় রাজনীতি হইতে কিছুদিন দুরে থাকিয়া অখণ্ড মনোযোগে ওকালতি করিব। শুর ও করিয়াছিলাম সেইভাবে। কিন্তু কপাল দোষে তা হইয়া উঠিল না। ঢেকি স্বর্গে গেলেও ভাড়া বানে। আমারও হইল তাই। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সাহেব কয়েক দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ আসিয়া আওয়ামী লীগ মহকুমা কমিটি করিলেন আমাকে তার সভাপতির দায়িত্ব গছাইলেন। বগা ফাঁদে পড়িল।" ৭৩

মওলানা ভাসানী জনগণের নেতা ছিলেন। তাই জনগণের মতামত প্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। কারণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল পত্রিকা সরকারের কথা প্রকাশ করত। এসময় দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ড় হয় *ইত্তেফাক* নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হবে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে এক ঘরোয়া সভায় মওলানা ভাসানী পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত লোকদের কাছে পত্রিকার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালে তৎক্ষণাৎ শ'চারেক টাকা পাওয়া যায়। পরে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে তিনি ও আওয়ামী নেতা কর্মীগণ চাঁদা তোলেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* প্রকাশিত হয়।[৭৪] এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন মওলানা ভাসানী। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। মওলানা জানতেন পত্রিকা ছাড়া জনমত গঠন করা সম্ভব নয় তাই পরবর্তীতে আরও পত্রিকা তার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।[৭৫] ১৯৪৯ সালের শেষে পূর্ববাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক না খেয়ে মারা যায়। পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান

পূর্ববাংলা সফরে এলে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এলে ভাসানীর নেতৃত্বে ভূখা মিছিল বের হয়। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকা জেলে আটক করা হয়।[৭৬] ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্ড়ান সরকার সংবিধানের মূলনীতি রিপোর্ট পেশ করে। পাকিস্ড়ানের সংবিধান রচনার এই মূলনীতিতে ছিল- একমাত্র উর্দু ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় পরিষদ হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ইত্যাদি। এটা ছিল অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক। মওলানা ভাসানী মূলনীতি রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্ড়াব প্রত্যাখ্যান করেন।[৭৭]

মুসলিম লীগ সরকার 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নেতাদের উপর দমন নিপীড়ন দিন দিন বাড়াতে থাকে। সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে ভাসানী ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুর" করেন। তাছাড়া জেলে থাকা অবস্থায় মওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট সম্পর্কে অবহিত হন। হাজী দানেশ, মোহাম্মদ তোহয়া প্রমুখের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার পর তিনি কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।[৭৮] কমিউনিস্টরাও এই সময়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কাজ করার ও তাঁকে সামনে রাখার কথা ভাবেন। এই সময় 'ইস্ট পাকিস্ড়ান রেলওয়েজ এমপ-য়িজ' এর সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব আয়োজিত সমাবেশ হয় ১৯৫৪ সালের ১লা মে ঢাকার পল্টন ময়দানে। মওলানা ভাসানী আন্ড়র্জাতিক শ্রমিক সংহতির এই জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। একই দিনে নারায়ণগঞ্জের বিশাল শ্রমিক জনতার সমাবেশেও বক্তৃতা করেন মওলানা ভাসানী। এভাবেই মওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।[৭৯] কারামুক্তির পর কালবিলম্ব না করে মওলানা ভাসানী গণতান্ত্রিক

আন্দোলন শুর করেন। ১৯৫০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর আরমানিটোলা মাঠে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আয়োজিত এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন ভাসানী। একই দিনে পল্টন ময়দানে পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বক্তৃতা দেন। মওলানা ভাসানী এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় লিয়াকত আলী খানের মার্কিন তোষণনীতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, লিয়াকত আলী খান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারী করে চলেছেন। তিনি লিয়াকত আলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, শ্রোতারা তা সমর্থন করেন। এরপর তিনি সারাদেশে বক্তৃতা করে জনমত তৈরির চেষ্টা চালান।[৮০] ১৯৫১ সালের মার্চে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলায়ও নির্বাচনের দাবী ওঠে। নির্বাচনের দাবী উপস্থাপন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। এই সময়ে দেশের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়টিও তিনি লক্ষ্য করেন। মার্চ মাসে প্রদেশেও কেন্দ্র বার্ষিক বাজেট পেশ করা হলে ভাসানী বৈষম্যের দিকটি আরো প্রকটভাবে তুলে ধরেন। তিনি পূর্ববাংলায় সামরিক বিদ্যালয় এবং নৌঘাঁটি স্থাপনের দাবী করেন। তিনি বলেন, "পূর্ববঙ্গে পাকিস্ড়ানের মোট আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জনের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ইহার ন্যায্য অংশ লাভ করিতেছে না।" [৮১]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভাষা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংলা ভাষা অবহেলিত হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী মাতৃভাষা বাংলার পক্ষেই ছিলেন। সর্বস্ড়রের বাঙালিদের দাবী ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সুধিসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গঠিত হয় ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। অলী আহাদ, মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বলেছেন, ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রয়ারি ভাষার দাবীতে

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের হলে সেই মিছিলে গুলি করলে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ শহীদ হন। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেফতার করা হয়। তিনি জেলে থেকেও নানা ভাবে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে এপ্রিল মওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তি পান। মওলানা ভাসানী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন দাবী করেন অনেক আগেই, তবে জেল থেকে বের হয়ে তিনি সে দাবীর পুনর্উল্লেখ করেন এবং কেন্দ্রিয় কারাগারে সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করেন। এসময় তিনি কঠোর আন্দোলনেরও হুমকি দেন। অবশেষে সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভাসানী প্রচেষ্টা নেন এবং এসময় তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা ভাবেন। ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র সভাপতি মওলানা ভাসানী ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি ফজলুল হক 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র আশ্বাসে আলাপ আলোচনা চালানোর পরে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য এক যুক্ত বিবৃতি দেন। এর ফলশ্রুতিতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' 'নেজামে ইসলাম' 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' 'খেলাফতে রাব্বানী পার্টি' ও 'গণতন্ত্রী দল' যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মওলানা ভাসানী সারাদেশে সভা করে জনমত গঠন করেন। মুসলিম লীগ সরকার হক, ভাসানীসহ যুক্তফ্রন্টের হাজার হাজার নেতা কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার করে । ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুল বিজয় অর্জন করে।[৮২] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরেই ভাসানী সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'কে একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন যাতে হিন্দুরাও সর্বান্তকরণে এই দলে কাজ করতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।[৮৩]

১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্র“য়ারি ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্ড়র স্থাপন করেন যৌথভাবে মওলানা ভাসানী, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ও ভাষা আন্দোলনে শহীদ বরকতের মা। ১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে ১২ সেপ্টেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্ড়ানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পূরণ হয়নি, তবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সোহ্‌রাওয়ার্দীর গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো বিধায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দেন যে, পূর্ব পাকিস্ড়ানের ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়েছে। মওলানা ভাসানী সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে জনমত গঠনে জোর আন্দোলন ও দেশব্যাপী জনসভা করে বেড়ান। মূলত কেন্দ্রিয় সরকারের মার্কিনপ্রীতি ও দেশের শাসন কার্য পরিচালনা নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর চরম বিরোধ হয়।[৮৪] ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্র“য়ারি ভাসানী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। এই অধিবেশনে সমগ্র উপমহাদেশ থেকে বহু গুণী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, পশ্চিম পাকিস্ড়ান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্ড়ানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্ড়ান পশ্চিম পাকিস্ড়ানকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ জানাবে।এরপর মওলানা ভাসানীর সাথে প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর এক পর্যায়ে ‘সীমান্ড় গান্ধী’ গাফফার খান, আবদুল মজিদ সিদ্ধি, মিয়া ইফতেখারকে নিয়ে একটি প্রগতিশীল পার্টি গঠন করেন।[৮৫] এই পার্টির নাম ‘পাকিস্ড়ান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’। তাঁর নেতৃত্বে ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সর্বপ্রকার শোষণ বিরোধী একটি সমাজবাদী দলে পরিণত হয়।[৮৬] মওলানা ভাসানীর ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ গঠনের পর এই দলের রাজনীতি পাকিস্ড়ানে মার্কিনী প্রভাবের বির“দ্ধে জনমত গড়ে

তুলেছিল। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই মওলানা ভাসানীকে পাকিস্ড়্রানের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে গ্রেফতার করে। মওলানা ভাসানী একজন কমিউনিস্ট এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাস্ড়িকদের দল হিসেবে প্রচার ও নিপীড়ণ শুর“ করে। মওলানা ভাসানীর বিপরীতে জনগণের মধ্যে ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য ১৯৬১ সালের ৩১শে জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় ফলে ঢাকায় বিক্ষোভ শুর“ হয়ে যায়। সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯ আগস্ট মুক্তি পেয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এন ডি এফ) গঠন করেন। মওলানা ভাসানী ২৬ অক্টোবর জেলে অনশন শুর“ করেন। এরপর পরিস্থিতির চাপে আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ড় বিরোধের কারণে ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর যুদ্ধ বেঁধে গেলে উপমহাদেশের রাজনীতি পাল্টে যায়। এক রাজনৈতিক মের“ করণের প্রক্রিয়ায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে মৈত্রী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এসময় আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৬৩ সালের ২২ আগস্ট ভাসানী-আইয়ুব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।[৮৭] এরপর গণচীনের জাতীয় দিবসে যোগদানের জন্য চীন গমন করেন এবং সেখানে চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৮৮] প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' (১৯৫৯) প্রবর্তন করলে মওলানা ভাসানী তার তীব্র বিরোধিতা করে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানান।[৮৯] ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'পূর্ব পাকিস্ড়্রান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির' গঠন করেন। ১৯শে জানুয়ারি সার্বজনীন ভোটাধিকার দিবস পালনের আহবান জানান। এই বছর জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান করে পুনরায় চীনে গমন করেন। মওলানা ভাসানীর আহবানে সর্বদলীয় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১৮ মার্চ প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মওলানা ভাসানী আইয়ুব খানের বির“দ্ধে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সম্মিলিত বিরোধী দলের

প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে সারা দেশে প্রচার আন্দোলন চালান।[৯০] ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে যায়। [৯১] এই যুদ্ধের ফলে জনগণের মধ্যে আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। [৯২] ১৯৬৫ সালের ফেব্র"য়ারি মাসে লাহোরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক সভায় শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবী পেশ করেন। [৯৩] ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' চীনপন্থী ও সোভিয়েত পন্থীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী চীনপন্থী গ্র"পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [৯৪] ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবকে পুনরায় গ্রেফতার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এসময় মওলানা ভাসানী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালে পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর আহ্বানে দেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর এক বিশাল জনসভায় সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বর্তমান শাসক শোষকদের বির"দ্ধে গণআন্দোলনের ডাক দেন ভাসানী। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বই ছিলো শীর্ষে। ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্র"য়ারি পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দান কালে শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে 'ফরাসী বিপ-ব' করার হুমকি দেন। এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের প্রশাসন শেখ মুজিবুর রহমানকে ২২ ফেব্র"য়ারি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। [৯৫]

১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও বিপন্ন হয়। মওলানা ভাসানী উপদ্র"ত এলাকায় বিপন্ন মানুষের প্রতি সরকারের চরম উদাসীনতা দেখতে পান। তিনি ঢাকা ফিরে এসে ২৩ নভেম্বর পল্টনের এক জনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে স্বাধীন পূর্ব

পাকিস্তান ঘোষণা করেন। [৯৬] এই ঘোষণার পর পরই ভাসানী 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। তবে 'পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'কে সজীব রাখেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে স্বাধীনতার স্বপক্ষের নেতা কর্মীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকেন। তাঁর বিবৃতিতে ভাসানী লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা আদায়ের জন্য নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সন্তোষে জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের আহবান জানান। তাছাড়া ১৯৭০ সালের ১৯ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সন্তোষে কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আরেক 'লালটুপি' সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেকসিং এ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আহূত এক কৃষক সম্মেলনে পাকিস্তানী শাসকদের কৃষক দমন পীড়ণের চিত্র তুলে ধরে জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সভা-সমাবেশ আন্দোলন পরিচালনা করে তবে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা শুর“ করলে ১৬ এপ্রিল তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গমন করেন। [৯৭] ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং দেশে ফিরেই মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে জাতীয় সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করেন।

১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্র“য়ারি *হক কথা* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ২৬ ফেব্র“য়ারি সন্তোষে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সরকারের বির“দ্ধে সর্ব প্রথম সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৭৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্মেলন আহবান করেন। ১৯৭৪ সালে সকল প্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বির“দ্ধে আন্দোলন করার জন্য 'হুকুমতে রব্বানিয়া' সমিতি গঠন করেন। এরপর তিনি

ভারতীয় পণ্য বর্জন আন্দোলনের ডাক দেন। এ সময় ভাসানীর নেতৃত্বে খাদ্যের দাবিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। [৯৮]

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৬ দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ঐক্যফ্রন্ট ৩০ জুন এর মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাতিল এবং সর্ব প্রকার দমননীতি প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে চরমপত্র দেয়। ফলে ৩০ জুন তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে টাঙ্গাইলের সন্তোষে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় আসেন এবং পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর মওলানা ভাসানী একটু সুস্থ হয়েই সীমান্ত সফর করেন। তিনি যশোর সীমান্ত সফর কালে ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার তদন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি সমন্বয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৭৬ সালে তিনি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ভারত ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার বন্ধ না করলে এবং আপোস মীমাংসায় রাজি না হলে ভারতের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন শুরু করা হবে। ১৯৭৬ সালের ১৬মে ভাসানীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজশাহী শহরে এসে সমবেত হয়। ফারাক্কা লং মার্চ শুরু করার আগে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে এক জনসমুদ্রে তিনি ঘোষণা দেন যে, "গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। সৈন্য মোতায়েন করেছে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি।" মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই প্রতিকী প্রতিবাদ দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার পায়। ভাসানীর উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের এই গুরুতর সমস্যাটির প্রতি দেশের জনগণ, ভারতের জনগণ ও সরকার এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ফারাক্কা লং মার্চের পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। [৯৯]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। তবে তাঁর জীবনের একটা উলে- খযোগ্য সময় আসামে কেটেছে বাঙালি কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুর“ করে জাতীয় রাজনীতির মহান ধারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময় কালানুযায়ী (১৯০৬-১৯৪৭) তাঁর আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজনীতির সকল বিষয় খুবই সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী কর্মজীবনের গোড়া থেকে আমৃত্যু ছিলেন কৃষক প্রজা, গরিব ও দুঃখী মানুষের দরদী এবং জমিদার মহাজনদের সুপরিকল্পিত শোষণের দুশমন। মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত কৃষক প্রজার হাতেই নিহিত। তাই তিনি রাজনীতিকে উপরতলা থেকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশদের দালাল জমিদার নিষ্ঠুর নির্যাতনে জর্জরিত এ দেশের ভুখানাঙ্গা, গরিব কৃষক ও মেহনতি মানুষই ছিল মওলানা ভাসানীর আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তাই তিনি কৃষক সম্মেলন ডেকে এই বঞ্চিত কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা ছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলায় তাঁর অসামান্য অবদান ছিলো। ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রধান কৃতিত্ব মওলানা ভাসানীর। বলা যায় বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তারই প্রতীক হিসেবে মজলুম জননেতা হিসেবে পরিগণিত হয়ে উঠেছিলেন মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী তাঁর বিশাল কর্মজীবনে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এবং তিনি কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হননি। তারপরও বৈশ্বিক ইস্যুতে তিনি যতটুকু ভূমিকা রেখেছিলেন তা একজন সংগ্রামী রাজনৈতিক

নেতার ভূমিকা, কোন রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা নয়। মওলানা ভাসানী তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা অক্ষুন্ন রেখেছেন আমৃত্যু। জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর রাজনৈতিক পদচারণা কোন সংগঠিত শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলো না কারণ তাঁর ত্যাগ, সংগ্রাম ও মেহনতি মানুষের প্রতি দরদ তাঁকে এ দেশের জনগণের কাছে এতো প্রিয় ও প্রভাবশালী করেছিলো যে, মওলানা একাই সকল অবস্থায় দেশের রাজনীতিতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন। রাজনৈতিক বিশে- ষণে ভাসানী সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, আবার মওলানা বলে সাম্প্রদায়িকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান এবং একজন নির্ভেজাল বাঙালি। তিনি কাগমারীতে মহাসম্মেলনে সুভাষ বোস আর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তোরণ তৈরীতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। চিন্তা চেতনা আর কর্মে ইসলামের শাশ্বত বাণী মানুষকে ভালোবাসার মহান আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সে কারণে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এক অসাধারণ নেতা; যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে নির্যাতিত মানুষের নেতা হতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি বলা যায়, মওলানা ভাসানী এ দেশের রাজনীতিতে যে সদর্থক ভূমিকা রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য সঠিক পথধারার প্রেরণা যোগাতে পারে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুস্থ রাজনীতির বিচারে এবং প্রয়োজনে তা সত্য। [১০০]

প্রান্তটীকা

১। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ,১৯৯৪, পৃ. ১১

২। পীর শব্দটি ফার্সি। আরবীতে বলা হয় মুরশীদ। মুরশীদ শব্দের অর্থ হল পথ প্রদর্শক। যিনি আল-াহর আদেশ নিষেধ আল-াহ তাআলা যেভাবে চান যেভাবে পালন করার প্রশিক্ষণ দেন তার নাম মুরশীদ বা পথ প্রদর্শক যাকে ফার্সিতে বলে পীর। (*www. islamicambit. com/archives /2015)*

৩। আমজাদ হোসেন, *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*, পড়ুয়া প্রকাশনী ,ঢাকা , ২০১৩, পৃ. ১১

৪। কবিগান বাংলা লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা। এ ধারায় লোক কবিরা প্রতিযোগিতামূলক গানের আসরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গায়ককে কবি হতে হয়। তিনি মুখে মুখে পদ রচনা করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সুরারোপ করে গেয়ে থাকেন। কবিগান পরিবেশন কারীদের বলা হয় কবিয়াল। কবিগান সাধারণত দুটি দলের দ্বারা গীত হয়। (স্বরোচিষ সরকার, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩)

৫। গ্রাম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাত্রাপালা। এ সময় যাত্রাপালা গ্রাম বাংলার একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল। গভীর রাতে আরম্ভ হয়ে ভোর রাত অবধি গ্রামের সবাই উপভোগ করত গানের নাচের মাধ্যমে তুলে ধরা নানান কাহিনী। বর্তমানেও কিছু কিছু অঞ্চলে যাত্রাপালা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।(*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৮)

৬। শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৬-১৭

দেওবন্দ মাদ্রাসা হল ভারতের একটি মাদ্রাসা। এখান থেকে দেওবন্দি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উত্তর প্রদেশের শাহানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে এই মাদ্রাসার অবস্থান। ১৮৬৬ সালে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামী প¨িত দার“ল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি তাদের প্রধান ছিলেন।

(উইকিপিডিয়া, https://en.wikipedia.org/wiki/Darul_Uloom_Deoband)

৭। মওলানা ভাসানীর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী সাময়িকী প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, ২০১৫

৮। সোসাইটি ফর মওলানা ভাসানী স্টাডিজ ভাসানী সাংস্কৃতিক ফোরাম, *গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির পথে*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৭

৯। মুরিদ আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা পোষণকারী, সংকল্পকারী, আনুগত্য পোষণকারী। *(উইকিপিডিয়া, https://en.wikipedia.org/wiki/Murid)*

১০। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১-২২

১১। মুনতাসীর মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া*, মওলা ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা , ১৯৯৯ পৃ. ২৪-২৬, গোলাম মুস্তফা, *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, উৎস প্রকাশনী, ২০১০, ঢাকা (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ১৩

১২। শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৩। সাক্ষাৎকার, ১৫.০৫.১০১৫, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক

১৪। মওলানা ভাসানীর অভিভাষণ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৬৭, রংপুর উদ্ধৃত সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪

১৫। যে নিয়মতান্ত্রিক পথে বাঙলায় ব্রিটিশদের বির‍ুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন চলেছিলো সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সেদিন অনেক যুবককেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই বিক্ষুদ্ধ যুবদল শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জন নীতিতে সমর্থন করতেন না। তারা মূলত সেদিন মনে প্রাণে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন। এই ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তারা র‍ুশ বিপ-বের মত সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন অনুশীলন সমিতি। (হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)* প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্র‍ুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৭৯) সুমিত সরকার আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৪-১০৬, স্বদেশী আন্দোলনের তথা বিপ-বের আদর্শ প্রচার করার জন্য *যুগান্তর* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯০৭ সালে এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা দাড়িয়েছিল সাত হাজার। (হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ*, প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮০)

১৬। সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *বাংলাদেশ গড়লেন যারা*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৬৬

১৭। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১২-১৩

১৮। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪

১৯। শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

২০। অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ, জননেতা মওলানা ভাসানী*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৩

২১। সাক্ষাৎকার, ১৫.০৫.২০১৫, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক

২২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৩। শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

২৪। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) স্মারক গ্রন্থ, *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০১৪, পৃ. ১২২

২৫। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

২৬। সাক্ষাৎকার, ১৫.০৫.১০১৫, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯৪৭) ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী ১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে এবং তাঁর অর্জিত সম্পদ দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি দেশবন্ধুর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং নিজেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং দেশবন্ধুর কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। ১৯২৫ সালে স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বামীর প্রতিটি রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩)

২৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *বাংলায় খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৬-৯

২৮। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১

৩০। লালা লাজপত রায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাকে 'পাঞ্জাব কেশরি' নামেও জানা যায়। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাঞ্জাব অঞ্চলের চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা। (অমলেশ ত্রিপাঠী, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (অনুবাদ নির্মল দত্ত)*, আনন্দ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৪২।)

৩১। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৩২। বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল- চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, দার্শনিক এবং কবি ছিলেন। ১৯২২ সালে মওলানা ভাসানী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন উত্তর বঙ্গ ভয়াবহ বন্যা ও মহামারী পরিদর্শনের সময়। (সাইদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮)

৩৩। সংকলন ও সম্পাদনা সাইদুর রহমান, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৮-৫৯

৩৪। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। এর মাধ্যমে স্বৈর শাসনের বির‍ুদ্ধে জনসাধারণের অবাধ্যতা ঘোষিত হয়েছিল। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর এবং এটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি, সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। (বিপল চন্দ্র দাস, *উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে মহাত্মা গান্ধী*, অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২,পৃ. ৩৩-৪৫।)

৩৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৭

৩৬। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২০১

৩৭। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০২। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০২

৩৮। আমজাদ হোসেন, *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৩৯। সিরাজ-উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৪০। আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাবিস্তান, দশম সংস্করণ পূর্নমুদ্রন, ২০১০, ঢাকা পৃ. ৩৭

৪১। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৪২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৪৩। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত), স্মারক গ্রন্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯

৪৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

৪৫। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

৪৬। সিরাজ-উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৪৭। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩

৪৮। নাজমুল হক নান্নু , *ইতিহাসের ধারায় মওলানা ভাসানী*, ঢাকা , ২০১১, পৃ. ৩৯-৪১

৪৯। সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা –ভাসানী- ভারত*, ঢাকা , ১৯৮৭ , পৃ. ৩৩

৫০। শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৫১। সাক্ষাৎকার, ১২.১০.২০১৫, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক

৫২। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬৩

৫৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৫৪। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৩৮

৫৫।'লাইন প্রথা' ছিল মূলত আসাম রাষ্ট্রের স্বদেশীয় সম্প্রদায়কে অভিবাসী মুসলমান বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রাখার বিশেষ এক ব্যবস্থা। আদিবাসী ও বাঙ্গালি অভিবাসীদের মধ্যে নানা কারণে যেন কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লাইন প্রথা প্রবর্তিত হয়। অবিভক্ত ভারত বর্ষের আসাম প্রদেশের একটি কুখ্যাত আইন 'লাইন প্রথা' নামে পরিচিত। মূলত আসামে বাঙালি নির্যাতন ও বাঙালিদের বিতাড়নের জন্য এ আইন করা হয়েছিল। এ আইনের ফলে আসামে বসবাসকারী বাঙালিরা একটা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারত না, কাজকর্ম করতে পারত না। এ আইনের ফলে বাঙালিরা রাতারাতি ভূমিহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষে পরিণত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯৪৫ সালে 'লাইন প্রথা' বাতিল ঘোষণা করা হয়। (সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

৫৬। সাইফুল ইসলাম, *আসাম ও মওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা-বাঙালখেদা*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭-১৯

৫৭। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৫৮। সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৪০-৪৩

৫৯। অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২২৩-২২৪

৬০। সৈয়দ আবুল মকসুদ , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৬১।'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের (১৯৪৫-৪৭) অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী। ১৯৪৭ সালে আসাম সরকার 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযান শুরু করলে তিনি এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং জারিকৃত ১৪৪ ধারা অমান্য করে শীলচরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা ভাসানী বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম, অসমীয়া বাঙালি নির্বিশেষে সকল কৃষক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। (মহসিন শস্ত্রপাণি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯)

৬২। *দি লাইন সিস্টেম অফ আসাম*, জার্নাল অব দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, খন্ড ২৩, ১৯৭৮, উদ্ধৃত সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৬৩। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০–২২) যোগদান করে কংগ্রেসের আহবানে বি.এ পরীক্ষা বর্জন

করেন। কলকাতার *দৈনিক মোহাম্মদী*, সাপ্তাহিক *দি মুসলমান*, এবং মওলানা আকরাম খাঁর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সহকারি সম্পাদক এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনের সময় পাকিস্থান সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে 'সিতারা এ খেদমত' ও 'সিতারা এ ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেন। (শহিদুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৭)

৬৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৬৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫২

৬৬। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

৬৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল- াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

৬৮। ইয়ার মোহাম্মদ (১৯২০–১৯৮১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাছাড়া *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।(*দৈনিক ইত্তেফাক* , ঢাকা, ১লা জুন, ২০১৬, পৃ. ২১-১৩)

৬৯। আতাউর রহমান (১৯০৭-১৯৯১) প্রজা সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি ঢাকা জেলা প্রজা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আতাউর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে উলে- খযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী , পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য, পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ১৯৬৯ সালে তিনি জাতীয় লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। (মুয়ায্‌যম হুমায়ন খান, বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮)

আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) পাবনা জেলার উল- াপাড়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইস্কুলে এন্ট্রান্স পড়ার সময় কংগ্রেস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি (১৯২২–২৩) এক বছর কারাবরণ করেন। ১৯২৭ সালে তর্কবাগীশ কংগ্রেসের রাজনীতি শুর“ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। লীগের রাজনীতিতে তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুসারি ও সহযোগী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি এ দলে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগের টিকেটে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য

নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯৫৫-১৯৬৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৪৮)

কামর‍ুদ্দিন আহমদ (১৯১২-১৯৮২) রাজনৈতিক জীবনের শুর‍ুতে মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন ১৯৪৭ সালে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। ১৯৫৪ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। তাছাড়া তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির (ঢাকা) সভাপতি (১৯৭৬–১৯৭৮) ছিলেন। রাজনীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর উলে-খযোগ্য অবদান সত্ত্বেও তিনি লেখক হিসেবেই সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। (মোঃ সেলিম, বাংলাপিডিয়া , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫১-৩৫২)

মওলানা রাগীব আহমদ (১৯০৪– ১৯৭৫) প্যান ইসলামবাদী রাজনীতিক, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। ১৯১৮ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯)

খান সাহেব ওসমান আলী (১৯০০-১৯৭১) কুমিল-ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসিত *সবুজ বাংলা* পত্রিকার সম্পাদক এবং ভাষা আন্দোলনেও অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। (*দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ১৮ মার্চ, ২০১৫, পৃ. ৭)

অলি আহাদ (১৯২৭/২৮-২০১২) ভাষা সৈনিক, সংগঠক ও রাজনীতিবিদ। তিনি কৈশোর বয়স থেকেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছাত্রাবস্থায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বাসভূমি পাকিস্তান দাবীর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক লীগ গঠনে অলি আহাদ গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫১ সালের ২৭-২৮ মার্চ যুব সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠিত হলে অলি আহাদ এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে গঠিত সর্ব দলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনীতির বিভিন্ন গুর‍ুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অবদান রেখে গেছেন। (গাজী মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৯)

শেখ আবদুল আজিজ ১৮৮১ সালে বগুড়া সদর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে তিনি ধুনট থানা খেলাফত কমিটি

ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। আসামের লাইনপ্রথা উচ্ছেদকল্পে এবং বাঙালি খেদা আইনের প্রতিবাদে তিনি আসাম গিয়ে রাজিব উদ্দিন তরফদারের পাশাপাশি কাজ করেন (ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *বাঙলায় খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. (১৫৬-৫৭)

কাজী গোলাম মাহবুব (১৯২৭-২০০৬) ভাষা আন্দোলনের নেতা, রাজনীতিবিদ। বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছাত্র জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হন। তিনি ১৯৪২ সাল থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পাকিস্তান 'তমুদ্দিন মজলিশ' সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। (এম, আর মাহবুব, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৩-১০৪)

এম মনসুর আলী (১৯১৯-১৯৭৫) ১৯৫১ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদেন। ১৯৫২ সালে তিনি পাবনায় ভাষা আন্দোলন সংগঠন কালে গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাংলা আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলনে মনসুর আলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এম মনসুর আলী স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রীসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। (মোঃ আজম বেগ, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০০)

খন্দকার মোস্তাক আহমদ (১৯১৮–১৯৯৬) ১৯৪২ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব নগর সরকারে তিনি পররাষ্ট্র আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হলে মোশতাক আহমদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। (*উইকিপিডিয়া*, *https://bn.wikipedia.org/s/24fe)*

আনোয়ারা খাতুন ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ সালে যখন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারাবন্দী ছিলেন তখন তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি আওয়ামী

লীগের সংসদ সদস্যও ছিলেন। (The Daily Observer, Dhaka, 21 February , 2016, Editorial Page)

৭০। শামসুল হক (১৯১৮–১৯৬৫) টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিভাগপূর্ব রাজনীতিতে যোগদানের পর ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি পাকিস্তানের গণ পরিষদের সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার বিরোধী রাজনীতিতেও তিনি প্রথম সারির নেতা ছিলেন। (খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২৬-১২৭)

৭১। আবু আল সাইদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ, ২২, ২৬, ৩১ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৯

৭২। সিরাজ উদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৭৩। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৭৪। *ইত্তেফাক* সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার অনুষ্ঠানিক সম্পাদক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকার বিলুপ্তির পর দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর এর সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন, (যিনি মানিক মিয়া নামে সমধিক পরিচিত)। মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে দৈনিক *ইত্তেফাক* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যকার বৈষম্য ও কেন্দ্রিয় শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেন। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে পত্রিকাটির সম্পাদক আনোয়ার হোসেন *দৈনিক ইত্তেফাক* , ঢাকা, ১লা জুন, ২০১৬, পৃ. ২১-১৩)

৭৫। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯) পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। একই বছর এই রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে আর্বিভাব ঘটে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাকে*র আবদুল হামিদ খান পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে মানিক মিয়া এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকে* রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটা

পর্যায়ে তিনি এবং তার পত্রিকা অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন। (*দৈনিক ইত্তেফাক* , ঢাকা, ১লা জুন, ২০১৬ , পৃ. ২১-১৩)

৭৬। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৪৬

৭৭। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

৭৮। হাজী দানেশ (১৯০০-১৯৮৬) কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কৃষক নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন কৃষক সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং উত্তরবঙ্গে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। বর্গা চাষীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে গণতন্ত্রী দল নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে দিনাজপুর থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল আওয়ামী লীগে' যোগদান করেন। তাছাড়া ১৯৭৫ সালে (বাক্‌শাল) কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে যোগ দান করেন। তবে হাজী দানেশ তেভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবেই সমধিক পরিচিত। (মাহফুজুর রহমান সরকার, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৭-৩৯৮)

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৮৮২–১৯৮৭) ১৯৪৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন " পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই তিনি সমাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্যাডার 'কমরেড' পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তিনি অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। (আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪)

৭৯। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭, আরেফিন বাদল সম্পাদিত, *মওলানা ভাসানী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

৮০। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

৮১। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০

৮২। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫৩

৮৩। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

আবদুল হাই শিকদার, *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৮-১৯

৮৪। সম্পাদনা ও প্রকাশনা, মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টার, ‘জ্যোতিষ্ক’ মজলুম জননেতার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ, টাঙ্গাইল,২০১২,পৃ. ২৬-২৭

৮৫। গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮৮) ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী অহিংস আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। পশতুন বংশোদ্ভূত ভারতীয় রাজনৈতিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। তাছাড়া তিনি সীমান্তগান্ধী হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত ‘ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ’ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। (আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১)

আবদুল মজিদ সিন্ধি ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ‘ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ’ গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ প্রতিষ্ঠা কালীন অন্যতম একজন নেতা হিসেবে মিয়া ইফতেখারের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য, (আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১)

৮৬। সম্পাদনা ও প্রকাশনা, মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টার, ‘জ্যোতিষ্ক’ মজলুম জননেতার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের, শ্রদ্ধার্ঘ, টাঙ্গাইল,২০১২,পৃ. ২৮-২৯

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ সংক্ষেপে ন্যাপের প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দিলে ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তা প্রকাশ্য বিদ্রোহ রূপ নেয়। এরপর ২৫-২৬ জুলাই ভাসানীর আহবানে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ গঠন করেন মওলানা ভাসানী। (সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৭৮)

৮৭। সোসাইটি ফর মওলানা ভাসানী স্টাডিজ ভাসানী সাংস্কৃতিক ফোরাম, *গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির পথে*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৭

শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৮৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩, আবদুল হাই শিকদার, *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৪৬-৪৭ , মওলানা ভাসানী, *মাও সে তুঙ এর দেশে*, মওলানা ভাসানী , পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৭২ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭-১৮।

৮৯। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই পাকিস্তানে একটি নতুন ধরনের নির্বাচন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবল কিছু নির্দিষ্ট লোকের অধিকারে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫)

৯০। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৯১। জেনারেল আইয়ুব খান পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই প্রথমে তিনি কচ্ছে রানে সেনা প্রেরণ এবং ঐ সংঘর্ষের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কাশ্মীর জয়ের জন্য মুজাহিদের ছদ্মবেশে কাশ্মীরে পাকিস্তান নিয়মিত বাহিনী প্রেরণ করেন, ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এক সর্বাত্মক যুদ্ধ বেঁধে যায়। ১৭ দিন চলার পর জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়। (রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা , ১৯৮১, পৃ. ৭৪-৭৫)

৯২। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) স্মারক সংকলন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

৯৩। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪

৯৪। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

৯৫। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৩৪২

৯৬। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) স্মারক সংকলন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮

৯৭। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-৬৩। আবদুল হাই শিকদার, *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, ঢাকা , ২০০২, পৃ. ১৬

৯৮। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) স্মারক সংকলন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৭-৩৩৯

৯৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩ , সৈয়দ অবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৮৭-৪৮৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ.৭। *দৈনিক বার্তা*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৪

১০০। মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) স্মারক সংকলন, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৬৭-৫৪০।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও আইনবিদ আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯ ভাদ্র, শনিবার) ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রহিম ফরাজি, মাতা মীর জাহান খাতুন।[১] আবুল মনসুর আহমদের শিক্ষা জীবনের শুর— তাঁর চাচা মুনশি ছমির—দ্দিন ফরাজির মক্তবে। ১৯০৬ সালে তিনি ধানিখোলা জমিদার-কাচারিতে স্থাপিত পাঠশালায় ভর্তি হন এবং বাংলা, অংক, ইংরেজি প্রভৃতি শিখতে থাকেন।[২] মক্তব ও পাঠশালার শিক্ষার পর তিনি ১৯০৯ সালে দরিরামপুর মাইনর স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ড় পড়াশুনা করেন। ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯১৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইন এবং ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করে আইন পাশ করেন যা তৎকালীন মুসলমানদের জন্য ছিল বিরল ঘটনা। আর এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৩] আইনশাস্ত্র পড়ার জন্য কলকাতায় এসে ১৯২৩ সালেই আবুল মনসুর আহমদ সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশি- ষ্ট হয়ে পড়েন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ড় তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন।[৪] আবুল মনসুর আহমদ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আইনবিদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। তবে এই অভিসন্দর্ভের বিষয় শিরোনামে তাঁকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক হিসেবে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হবে।

আবুল মনসুর আহমদ এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী। কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় দুটো ধারা তাঁর জীবনের সঙ্গে প্রবাহমান ছিলো; তা হলো সাহিত্য ও রাজনীতি। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত

ছিলেন।[৫] আবুল মনসুর আহমদ যখন রাজনীতি কী এ কথাটা বোঝেননি তখন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর জীবনে আঘাত করে প্রচন্ড এক রাজনৈতিক ঢেউ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদের শিশু মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। বড়লাট কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে ময়মনসিংহ সফরে গিয়েছিলেন তখন আবুল মনসুর আহমদ মুরুব্বিদের সঙ্গে কার্জনের জনসভায় গিয়েছিলেন বড়লাটকে দেখতে। তাঁর ভাষায়-

> "১৯০৫ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে আসেন। মুরুব্বিদের সাথে লাট দর্শনে যায়। রাস্তার গাছে গাছে; বাড়ী ঘরের দেওয়াল-দেওয়ালে ইংরেজিতে লেখা দেখি : ডিভাইড আস নট। মুরুব্বিদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব স্বদেশী হিন্দুদের কান্ড। মুসলমানদের খেলাফে দুশমনি। এই দুশমনিটা কি, ঘরে ফিরিয়া পরে, চাচাজির কাছে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি ব্যাপারটা আমাদের বুঝাইবার জন্য যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তার কিছুই তৎকালে বুঝি নাই, তবে সেসব কথার মধ্যে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকা রাজধানী, বাংলা ও আসাম এই কয়টা শব্দই শুধু আমার মনে ছিল। স্বদেশীরা তবে মুসলমানদের দুশমন? ভাবনায় পড়িলাম।"

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন আবুল মনসুর আহমদের শিশু মনে যে প্রভাব ফেলেছিল এবং এ সম্পর্কিত মুরুব্বিদের যে চিন্তা-চেতনা থেকে তৃণমূল পর্যায়ের মুসলমানদের মানসিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন-

> "১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার উপলক্ষে স্কুলের সবচেয়ে ভালছাত্র হিসেবে আমাকে অনেকগুলি ইংরেজি ও খান কতক বাংলা বই প্রাইজ দেওয়া হয়। সেকালের তুলনায় এক স্তুপ বই। বইগুলি দুই বগলে লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম তখন আতিকুল্লা নামে আমার এক বয়োজ্যৈষ্ট মাদ্রাসার ছাত্র

বন্ধু আমার প্রতি চোখ রাগাইয়া বলিয়াছিলেন, আজ মুসলমানদের মাতমের দিন। ফিরিঙ্গিরা আমাদের গলা কাটিয়াছে। তুমি কিনা সেই ফিরিঙ্গির দেওয়া প্রাইজ লইয়া হাসি-মুখে বাড়ী ফিরিতেছে"? [৬]

বলা যায় আবুল মনসুর আহমদের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ পড়েনা কিন্তু বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক যে রাজনীতি বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের ভাগ্যকে পরিচালিত করেছিল তার প্রভাব আবুল মনসুর আহমদের চিন্তা চেতনাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক চিন্ড়া চেতনায় বঙ্গভঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, "১৯০৫ সনে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি ও ১৯১১ সালে তা বাতিল আমার দেখা রাজনীতিতে পড়ে না। কিন্তু আমার দেখা রাজনীতির উপর তার বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ ইমপ্যাক্ট হইয়াছিল, তৎকালীন মুসলিম সমাজের মনোভাব হইতে তা স্পষ্ট বুঝা যাইত। তাদের চিন্ড়ার প্রভাব আমার নিজের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্ড়ায়ও কম পড়ে নাই। সেটা অবশ্য বুঝিয়াছিলাম অনেক পরে।[৭]

প্রজা আন্দোলনের বীজ বপনের পর্বে তাঁকে দেখা যায় এক সংগঠক হিসেবে। ময়মনসিংহের ধাণিখোলায় প্রজা সাধারণের জনসভায় ভূমিকা পালন করেন এবং নয় বছর বয়সে প্রথম জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় যোগদানের মাধ্যমে আবুল মনসুর আহমদ জমিদারদের অত্যাচার, জুলুমের অনেক কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রজার দাবীর পক্ষে কাজ শুর" করেন। ১৯১৪ সনে জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে প্রজাসম্মিলনী হয় যখন আবুল মনসুর আহমদের বয়স ১৬ বছর। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া মনসুর আহমদ *মোহাম্মদী* ও *মোসলেম হিতৈষী* পত্রিকার মাধ্যমে সম্মেলন সম্পর্কে জানতে পেরে উৎসাহিত হয়েছিলেন।[৮] এই প্রজা সম্মেলনে উপস্থিত উলে- খযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী, মওলানা খন্দকার আহমদ আলী আকালুবী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মনির"জ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ ব্যক্তি।[৯] সাধারণ গরিবের পক্ষে থেকে আন্দোলন করেন, এ বিষয়টা তাঁকে রাজনীতিতে

উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। নিয়মতান্ত্রিক প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে কামারিয়ার চর প্রজা সম্মিলনী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রজা সম্মিলনী ছিলো।

মূলত এই প্রজা সম্মিলনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে আবুল মনসুর আহমদের হাতে খড়ি। [১০] এরপর থেকে ইংরেজদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদী হয়ে যেতেন। যেমন স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে ইংরেজদের সমর্থক হয়ে উঠেন। আবার ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার দায়ে আবুল মনসুর আহমদের সুপরিচিত কয়েকজন ছাত্র গ্রেফতার হওয়ায় বিরাজমান রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল।[১১]

১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌচুক্তির' মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হওয়ায় স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। এর সঙ্গে ১৯১৮ সনের ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করা, ১৯১৯ সালে বিনা বিচারে আটক রাখা সংক্রান্ত কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' জারী করা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা যুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অগ্নিরূপ ধারণ করে।[১২] ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মিত্রশক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তুরস্ক (জার্মানির পক্ষে) যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতীয় মুসলমানরা বিপাকে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের তুরস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ করার আহবান জানালে মুসলমানরা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে তাদের খলিফা হিসেবে মান্য করতো। ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খেলাফত সংরক্ষণ ও তার অখণ্ডতা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করলে মুসলমানরা ব্রিটিশদের পক্ষে এ যুদ্ধে যোগ দেন কিন্তু যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে দেখা যায় ব্রিটিশ সরকার তার পূর্বের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করে মিত্রশক্তির মাধ্যমে তার বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে এবং তুরস্কের সুলতানকে একজন সাধারণ কয়েদির ন্যায় ফেলে রেখেছে। ফলে ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের অখণ্ডতা, খেলাফত রক্ষা ও ধর্মীয় পবিত্র স্থান গুলো খলিফার হাতে ন্যস্ত করার দাবীতে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে যা ইতিহাসে

খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।[১৩] মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে খেলাফত কমিটি ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগের নীতি গ্রহণ করে। এসময় মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বয়কট কর্মসূচী তথা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতিতে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করলে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং গান্ধীজীর নির্দেশে অহিংসনীতি পালন করা হলেও তা ক্রমে হিংস্রতায় রূপ নেয়।

১৯২২ সালের ৫ই মার্চ ফেব্রুয়ারি যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরায় জনতার হাতে ২২জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলে গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের ঘোষণা দেন। ফলে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। অপর দিকে ১৯২২ সালে তুরস্কের সুলতান চতুর্থ মোহাম্মদ পদচ্যুত হলে তুর্কি সালতানাত বিলুপ্ত হয় এবং ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক খেলাফত ও রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলে খেলাফত আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবুল মনসুর আহমদ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তখন (১৯২০ সন) ঢাকা কলেজে দর্শন বিষয়ে অর্নাসের ছাত্র। এসময় ল' কলেজের ছাত্র মৌলবী ইব্রাহিম সাহেবের নেতৃত্বে তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দেন। বিশেষ করে ১৯২০ সালে আহসান মঞ্জিলে খেলাফতের জনসভায় মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল, এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী মুজিবর রহমান, আবুল কাসেম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আগমন ও তাদের বক্তৃতা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১৫] আহসান মঞ্জিলের খেলাফত কনফারেন্সে তিনি ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ভাষায়-

"ঢাকায় দেশ-বিখ্যাত বহু নেতার শুভাগমন হয়। তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা শওকত আলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল, মৌঃ ফযলুল হক, মিঃ আবুল কাসেম, মৌঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। সেকালে আরমানিটোলা ময়দান ছাড়া করোনেশন পার্ক ও কুমারটুলির ময়দানেই মাত্র বড় বড় জনসভা করিবার জায়গা ছিল। আমরা ছাত্ররা দলে দলে এই সব সভায় যোগদান করিলাম। এই সব সভার কথা যা আবছা আবছা মনে আছে তাতে বলা যায় যে, একদিক মহাত্মা গান্ধী ও মওলানা শওকত আলী অসহযোগের আন্দোলনের পক্ষে, অপরদিকে বাবু বিপিন চন্দ্র পাল ও মৌঃ ফযলুল হক অসহযোগের বিপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে খিলাফত ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার জন্য জনমত অসহযোগের পক্ষে এমন ক্ষিপ্ত ছিল যে বিরোধী বক্তারা কথায় কথায় শ্রোতাদের দ্বারা বাঁধা পাইতেন...। ইতিমধ্যে আমি মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ংইন্ডিয়া'র গ্রাহক হইয়াছিলাম। গভীর মনোযোগে ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ইহা পড়িতাম। তার লেখা আমার চিন্ড়্র ধারায় বিপুল প্রভাব বিস্ড়্র করিয়াছিল। পরবর্তী জীবনেও এই প্রভাব আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই"। [১৬]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রভাবে আবুল মনসুর আহমদ এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বি এ পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ড় নেন। পরবর্তীতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। কংগ্রেস খেলাফত কমিটির 'ব্যাক টু ভিলেজ' নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে তিনি গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে গিয়ে পল-ী সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। গ্রামে তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার প্রধান শিক্ষক হন। এছাড়া তিনি গ্রামে হাই স্কুল, তাঁতের স্কুল, চরকা স্কুল, বেসরকারি সালিশী পঞ্চায়েত, পল-ী সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মনে প্রাণে জড়িয়ে পড়েন। তুরস্কের যুদ্ধে কামাল পাশাকে সাহায্যের জন্য 'আংকারা তহবিলে' ফেতরার মতো শিশুবৃদ্ধ নর-নারী নির্বিশেষে মাথাপিছু দুই পয়সা করে চাঁদা তুলে দুই গ্রামের মোট ত্রিশ হাজার অধিবাসীর কাছ থেকে প্রায় এক হাজার টাকা চাঁদা তোলেন এবং এ টাকার বোঝা মাথায় বহন করে জেলা

খেলাফত কমিটিতে জমা দেন। মোটামুটি খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের (১৯১৯-১৯২২ সালে) কেন্দ্রিয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের একটি সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল আবুল মনসুর আহমদ পরিচালিত পল্লী সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ড। শুধু আন্দোলনের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বিলাতি কাপড় বয়কট করে দেশী কাপড় পরতেন এবং এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করেন। এসময় ১৯২২ সালের মাঝামাঝিতে তিনি ময়মনসিংহ জেলার খেলাফত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আন্দোলনের সমাপ্তিতে আবুল মনসুর আহমদ নতুন ধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন।[১৭]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে আবার ফাটল ধরে। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।[১৮] ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস কাউন্সিলে প্রবেশ করে অসহযোগিতার মাধ্যমে সরকারকে অচল করার পক্ষপাতি ছিলেন; অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন নির্বাচন বয়কট করতে। অবশেষে গয়া কংগ্রেসে গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হলে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাদের সমর্থকদের কংগ্রেস থেকে বের করে নতুন দল 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করেন এবং ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কাউন্সিলে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হন।[১৯] আবুল মনসুর আহমদ এই নির্বাচনে 'স্বরাজ্য পার্টি'র সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ থেকে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসেবে মৌলবী তৈয়বুদ্দীন আহমদের সমর্থনে তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালান। তৈয়বুদ্দীন আহমদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ধনবাড়ির বিখ্যাত জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। নওয়াব আলীর বিরুদ্ধে আবুল মনসুর আহমদ 'নবাব বাহাদুরের বাহাদুরি' শিরোনামে জীবনের প্রথম নির্বাচনী ইশতেহার লিখে ব্যাপক প্রচারণা চালান এবং মূলত এ কারণেই নবাব বাহাদুর নির্বাচনে হেরে যান। নির্বাচনের পর আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় গিয়ে *ছোলতান* পত্রিকায় চাকুরি নেন এবং স্বরাজ্য দলের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের

পার্লামেন্টারি নীতির পক্ষে লিখতে থাকেন। দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সহ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থনে এ সময় ঐতিহাসিক ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ সাধিত হয়। আবুল মনসুর আহমদ এই চুক্তি সম্পর্কে বলেন-

> “স্যার আব্দুর রহিম, মৌলবী আব্দুল করিম, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মওলানা আকরাম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মিঃ জে এম সেন গুপ্ত, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ জে এম দাশ গুপ্ত ও ডা: কিরণ চন্দ্র রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতার সহযোগিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সময় (১৯২৩ এপ্রিল) ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট নামক হিন্দু মুসলিম চুক্তিনামা রচনা করেন। এই প্যাক্টে ব্যবস্থা করা হয় যে সরকারি চাকুরীতে মুসলমানরা জনসংখ্যানুপাতে চাকুরী পাইবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাতে (তৎকালে শতকরা ৫৪) না পৌঁছিবে ততদিন নতুন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদের দেওয়া হইবে। সরকারি চাকুরী ছাড়াও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান; যথা কলকাতা কর্পোরেশন সমস্ড় মিউনিসিপালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ড সমূহে মুসলমানরা ঐ হারে চাকুরী পাইবে”।[২০]

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বেঙ্গল প্যাক্ট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে তীব্র বিরোধিতার মুখে তা গৃহীত হয় কিন্তু কেন্দ্রিয় কংগ্রেস এবং বাংলার অধিকাংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দ মন থেকে এই প্যাক্টকে গ্রহণ করেনি। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলনীতে দেশবন্ধু কংগ্রেসীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বেঙ্গল প্যাক্টকে পাশ করাতে সমর্থ হন। আবুল মনসুর আহমদ এ সময় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর *ছোলতান* পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি করতেন। ইসলামাবাদীর অনুরোধে সম্মিলনী সফল করার বিশেষ মিশন নিয়ে আবুল মনসুর আহমদ সম্মিলনীর আগে সিরাজগঞ্জে আসেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে এ সময় আঞ্জুমানের মুসলিম নেতারা ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা সিরাজগঞ্জের সম্মিলনী ভণ্ডুল করার চেষ্টা করলে তিনি যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝানোর পর সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্ত হয়। এভাবে তিনি বেঙ্গল প্যাক্টের পক্ষে সাংগঠনিক পর্যায়ে উলে- খযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।[২১]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হওয়া, দেশবন্ধুর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি, লীগ ও কংগ্রেস উভয়ের সাইমন কমিশন বর্জন, মুসলিম লীগের উদ্যেগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, কংগ্রেসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'নেহের্ রিপোর্ট' প্রণয়ন ও মুসলমানদের প্রত্যাখান, নেহের্ রিপোর্টের বিপরীতে 'জিন্নাহর চৌদ্দ দফা' পেশ, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রদান, মুসলিম লীগের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি ও 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ড় ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া উলে- খযোগ্য ঘটনা।[২২] বাংলার রাজনীতির এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯২৯ সালে স্যার আব্দুর রহিমকে সভাপতি, মওলানা আকরম খাঁকে সেক্রেটারি ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সহ-সভাপতি করে বাংলার উলে- খযোগ্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মিলে গঠন করেন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'।[২৩] আবুল মনসুর আহমদ এ সময় ওকালতি পাশ করে *দি মুসলমান* পত্রিকার কাজ ছেড়ে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহে চলে আসেন এবং ওকালতির পাশাপাশি প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ শাখা গঠন করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন।[২৪] একই সঙ্গে তিনি ময়মনসিংহ জেলা শাখার আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সহ-সভাপতি, কংগ্রেসের সহ-সভাপতি, মুসলিম লীগের সভাপতি ও প্রজা সমিতির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।[২৫] বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলেও মূলত তিনি ছিলেন একজন প্রজাকর্মী। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ দক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন বাংলার সর্ববৃহৎ জেলা ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এখান থেকে প্রজা আন্দোলন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সময়ই তিনি 'চাষী' নামে প্রজা আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করেন।[২৬]

প্রজা সমিতি একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও মূলত মুসলমান প্রজারাই এই সমিতির সদস্য ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ একটা কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করলে আঞ্জুমানের মুসলিম নেতারা তাঁর বিরোধিতা করেন ও মুসলিম কর্মী সম্মেলন ডাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ প্রজা সমিতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নষ্ট না করে আঞ্জুমানের সাথে

সম্পর্ক ছেদ করে সহ-সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির এবং প্রজা সমিতির মূল উদ্দেশ্য জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হওয়ায় তারা সবাই ছিলেন প্রজা সমিতির বিরোধী শক্তি। সাধারণভাবে বাংলার জমিদার ও মহাজনেরা হিন্দু এবং প্রজা ও খাতকরা মুসলমান হওয়ায় কার্যত প্রজা আন্দোলন ছিল হিন্দুর বির―দ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সময়ও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন।[২৭] ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার কর্তৃক কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হলে কংগ্রেসের বড় বড় নেতা গ্রেফতার হন। আবুল মনসুর আহমদকেও এ সময় জেলার পুলিশ সুপার মিঃ টেইলর গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তার অফিসে নিয়ে আসেন কিন্তু তাঁর বাগ্মিতায় এস পি সাহেব ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবী ও প্রজা আন্দোলনের অধিকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে প্রজা সমিতির কার্যক্রমে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে তাকে ছেড়ে দেন। ফলে আবুল মনসুর আহমদের একক নেতৃত্বে ময়মনসিংহের প্রতিটি স্ড়রে প্রজা সমিতি একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। [২৮]

আবুল মনসুর আহমদ বাংলার রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশি- ষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে ত্রিশের দশকে তিনি প্রজা সমিতির আঞ্চলিক নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী ছিলেন স্যার আব্দুল হালিম গজনবী। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এ সময় আবুল মনসুর আহমদের কাছে আব্দুল হালিম গজনবীর বির―দ্ধে একজন শক্তিশালী প্রার্থী দাঁড় করানোর জন্য একটি চিঠি লেখেন। আবুল মনসুর আহমদ নিজেও স্যার গজনবীর রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ধনবাড়ির জমিদার নবাবজাদা হাসান আলীকে দাঁড় করালেন। যদিও তাঁর বয়স পঁচিশ বছর না হওয়ায় প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে হয়। এই নির্বাচনে প্রজা সমিতির সভাপতি স্যার আব্দুর রহিম কলকাতা থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৫ সালে আইন পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। ফলে তিনি প্রজা সমিতির সভাপতির পদ থেকে ইস্ড়ফা দিলে নতুন সভাপতি নিয়ে দলের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং এতে আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকা ছিল খুবই গুর―ত্বপূর্ণ। প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে প্রবীণ প্রজা নেতারা

চেয়েছিলেন খান বাহাদুর আব্দুল মোমিনকে প্রেসিডেন্ট করতে, অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদের মতো তর ণ নেতারা চেয়েছিলেন ফজলুল হককে। বিদায়ী সভাপতি স্যার আব্দুর রহিম সমর্থন করেন আব্দুল মোমিনকে। ফলে ফজলুল হকের সমর্থনকারীরা তা মেনে নিলেন না। এভাবে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি নিয়ে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সম্মেলনের আয়োজন সমাপ্ত হলে মওলানা আকরম খাঁ সম্মিলনী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে আবুল মনসুর আহমদ এই ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করে সকল নেতাকর্মীকে সম্মেলনে আসার জন্য আহবান জানান এবং তার একক প্রচেষ্টায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সভাপতি নির্বাচিত করেন।[২৯] ময়মনসিংহ অঞ্চলের একজন আঞ্চলিক নেতা হয়েও আবুল মনসুর আহমদ এভাবে বাংলার রাজনীতিতে একজন গুর ত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রজা সমিতিকে তিনি ময়মনসিংহের তৃণমূল পর্যায়ের একটি জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতে এ সময়ে গোটা জেলার লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে মোট ৭২টি আসনের মধ্যে প্রজা সমিতি ৬৪টি আসন লাভ করে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে মেনিফেস্টো পেশ করেন। তার ভাষায় ঃ-

> “কার্যকরী সমিতির নির্দেশে আমি সম্মিলনীর বিবেচনার জন্য একটি ইলেকশন মেনিফেস্টো আগেই রচনা করিয়াছিলাম। জিন্নাহ সাহেবের চৌদ্দ দফার নামানুকরণে আমি প্রজাপার্টির দাবী গুলিকে টানিয়া খেচিয়া চৌদ্দতে স্ফীত সীমিত করিয়া উহার নাম দিয়াছিলাম প্রজা সমিতির চৌদ্দদফা। সেই মেনিফেস্টোতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নজর সেলামি রহিতকরণ, খাজনা ঋণ মওকুফ, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিশী বোর্ড গঠন, হাজা-মজা নদী সংস্কার, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শাসন ব্যয় হ্রাস, মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ ও

রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি করা হয়"।[৩০]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই আইন অনুযায়ী পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলার আসন সংখ্যা ছিল মোট ২৫০টি। নির্বাচনের পূর্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান শেষে ভারতে এসে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বাংলায় এসে কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে আপোসের চেষ্টা চালান।[৩১] কৃষক প্রজা সমিতির প্রতিনিধি দলের একজন হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় জিন্নাহর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেন কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের শর্তে জিন্নাহ রাজি না হওয়ায় আপোসের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টি পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৩২]

নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৮টি ও স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থী ৪১টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র বর্ণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দু বাদে কংগ্রেস ৫০টি আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র মুসলিম আসনের অনেকেই মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেয়ায় মুসলিম লীগের আসন দাড়ায় ৬০টিতে এবং কৃষক প্রজা পার্টির আসন দাড়ায় ৫৮টিতে। কৃষক প্রজা পার্টি তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মূল দল কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কারও পক্ষে এদের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন করা সম্ভব ছিলনা। কংগ্রেস কোন মন্ত্রীত্ব ছাড়া কৃষক প্রজা পার্টিকে সরকার গঠনের জন্য সমর্থনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাই কোন সমঝোতা করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মুসলিম লীগ কৃষক প্রজা পার্টির সমস্ত কার্যক্রম মেনে নিলে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।[৩৩] শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেও দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দলীয় নেতৃবৃন্দকে আয়ত্তে আনতে বা বোঝাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আবুল মনসুর আহমদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ সম্পর্কে আবুল

মনসুর আহমদ তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*-এ বিস্ড়ারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি নিজে প্রার্থী না হলেও একমাত্র তারই প্রচেষ্টায় ও নির্বাচনী প্রচারণায় ময়মনসিংহ জেলার মোট ১৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি ১১টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনায়-

> "আমি নিজে না দাড়াইয়া কৃষক প্রজা প্রার্থীদের জিতানোর জন্য দিনরাত সভা করিয়া বেড়াইলাম। কঠোর পরিশ্রম করিলাম আমারই মত গরীব সহকর্মীদের লইয়া। ফলে এ জিলার প্রধান প্রধান লীগ নেতা খান বাহাদুর শরফুদ্দীন, খান বাহাদুর নুরুল আমিন, খান বাহাদুর গিয়াসুদ্দিন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, মোঃ আব্দুল মোমেন খাঁ প্রভৃতি সকলকে ধরাশায়ী করিলাম। জিলার মোট ষোলটি মুসলিম সীটের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি পাইয়াছিল এগারটি এবং মুসলিম লীগ পাইয়াছিল মাত্র ৫টি। উলে- খ্য যে, জিন্নাহ সাহেব স্বয়ং ময়মনসিংহ জিলাতেই অনেকগুলো নির্বাচন কেন্দ্রে সভা সমিতি করিয়াছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নির্বাচন বিশারদ ও ময়মনসিংহের মুসলিম ভোটারদের মনে দাগ কাটিতে পারেন নাই"।[৩৪]

আবুল মনসুর আহমদ ১৯৩৭ সালের মন্ত্রীপরিষদের উপদেষ্টা বোর্ডের একমাত্র সদস্য যিনি মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন না। তবে সরকারের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে বির্তকে জড়িয়ে পড়েন। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ ও মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা নির্ধারণ নিয়ে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। মন্ত্রীদের বেতন নিয়ে তিনি এক বাকযুদ্ধের একটি চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন-

> "হঠাৎ শহীদ সাহেব উত্তেজিত সুরে আমাকে বলিলেন। তুমি দেড়শ টাকা আয়ের মফস্বলের উকিল। তুমি কলকাতাবাসী ভদ্র লোকের বাসা খরচের জান কি? আমি এই আক্রমণে আরও রাগিয়া গেলাম। পকেট হইতে এক টুকরা হিসাবের কাগজ স্বশব্দে সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া ক্রোধ কম্পিত গলায় বলিলাম। এই হিসাবে

> কলিকাতাবাসী একটি ভদ্র পরিবারের সমস্ড় আবশ্যক খরচ ধরা হইছে। এতে শুধু মদ ও মাগির হিসাব ধরা হয় নাই ও দুইটা ছাড়া আর কি এই হিসাবে বাদ পড়েছে দেখাইয়া দেন। শহীদ সাহেব রাগে চেম্বার ছাড়িয়া উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম আর কি? সভা ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব বাহাদুর হাবিবুল- াহ ছিলেন হাড়ে মজ্জায় আদত শরীফ লোক। তিনি মধ্যে পড়িলেন। আমরা উভয়ে সমান দোষী হইলেও নিজের দলের শহীদ সাহেবকেই তিনি দোষী করিলেন এবং আমার কাছে মাফ চাইতে তিনি শহীদ সাহেবকে কড়া হুকুম দিলেন। অন্যথায় তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়া হুমকি দিলেন। কিন্তু এর দরকার ছিল না। শহীদ সাহেব দিল দরিয়া লোক। তিনি হাত বাড়াইয়া শুধু আমার হাত ধরিলেন না, টানিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, মাফ কর এবং ভুলিয়া যাও। আমিও ঐ কথা বলিলাম" ।[৩৫]

আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের একজন আঞ্চলিক নেতা হয়েও সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ কে ফজলুল হক কৃষক প্রজা আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে কৃষক প্রজা পার্টি হক মন্ত্রীসভার বির"দ্ধে অনাস্থা প্রস্ড়াব উত্থাপন করে। আবার জিন্নাহর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। ফলে মুসলিম লীগ সমর্থন প্রত্যাহার করলে প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এসময় ফজলুল হক ক্ষুদ্র দলগুলোকে একত্রিত করে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেন এবং তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৩৬] এটি 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা নামে পরিচিত। বাংলার গভর্নর জন হার্বাট ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করলে এই মন্ত্রীসভারও পতন ঘটে এবং গভর্নরের আমন্ত্রণে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। এ প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে

পাকিস্ড়ান আন্দোলন জোরদার হলে সমস্ড় মুসলমান লীগের পতাকা তলে সমবেত হয়। ফলে কৃষক-প্রজা আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে।[৩৭]

বঙ্গভঙ্গের ফলে ১৯০৬ সালে আগা খানের নেতৃত্বে সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে দুটি পৃথক সত্ত্বায় পরিণত হয়। [৩৮] পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। আদর্শগত কারণে কংগ্রেস কখনও দেশ বিভাগ চায়নি আর মুসলিম লীগ তা চেয়েছে। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে অভিহিত করেন।[৩৯] এই ঘোষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী পুস্ড়িকা প্রকাশ করে, যেখানে মুসলমানদের জন্য পাকিস্ড়ান নামে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাস ভূমি দাবী করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে কবি ইকবালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪০] এ সমস্ড় আলোচনা ও চিন্ড়া চেতনার সফল পরিণতি আসে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বিখ্যাত লাহোর প্রস্ড়াব উপস্থাপনের মাধ্যমে। লাহোর প্রস্ড়াব অনুসারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল (বাংলা ও আসাম) নিয়ে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে মুসলিম লীগ এই অবস্থান থেকে সরে এসে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ড় নেয়, যা সুস্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্ড়াবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দুটি পৃথক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের যুক্তি তুলে ধরেন যা ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ বা ‘Two nation theory’ নামে পরিচিত। তিনি ভারতের

সমস্ড় মুসলমানকে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন; যাতে ভৌগোলিক সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করা হয়।[৪১]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে আবুল মনসুর আহমদের মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল। জিন্নাহ যেখানে 'Two nation theory'তে বিশ্বাসী ছিলেন সেখানে আবুল মনসুর আহমদ দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতে 'Two culture theory' বা 'দ্বি-সংস্কৃতি তত্ত্বে'র ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। যেখানে ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। আবুল মনসুর আহমদের এই 'দ্বি-সংস্কৃতি তত্ত্ব' ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তিতে অগ্রাহ্য হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমে তা সত্য প্রমাণিত হয়।[৪২] বিভাগ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সাল (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'পঞ্চাশের মন্বন্ড়র' নামে খ্যাত এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি এই দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গগ্রন্থ *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৮) এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে উপলক্ষ করে *আকাল আনিল কারা?* নামক দুটি পুস্ড়িকা লিখেছিলেন।[৪৩] ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর" হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের বিনা অনুমতিতে বড়লাট ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে ১৯৪১ সালে জাপান, জার্মানির পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় এবং বার্মা জয় করে ভারতের দিকে অগ্রসর হলে ইংল্যান্ড ভীত সন্ত্রস্ড় হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ ভারতে পাঠান। ক্রিপসের দেওয়া প্রস্ড়াব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই প্রত্যাখান করে। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুর" করলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।[৪৪] ফলে কংগ্রেসসহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইংল্যান্ডের নির্বাচনে (২৬ জুলাই ১৯৪৫) শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে এবং তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ভারতবর্ষকে যতদ্রুত সম্ভব স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন দলের সাথে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু এই 'মন্ত্রী মিশন' পরিকল্পনার দ্বারা তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ২৯ জুলাই (১৯৪৬) মুসলিম লীগ গণপরিষদ বর্জন করে দিয়ে ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ফলে ভারতব্যাপী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগের এই কর্মসূচী ছিল মূলত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করেন। ফলে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে হিন্দুরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম ব্যাপক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। কয়েকদিন পর এটা সাময়িকভাবে স্থিমিত হলেও দেশ বিভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে এ দাঙ্গা চলতে থাকে।[৪৫] আবুল মনসুর আহমদ এই দাঙ্গার হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> "গভীরতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা সকল দিক হইতেই ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ১৯২৬ সালের দাঙ্গার চেয়ে অনেক বড় ছিল। চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার নৃশংসতার খুঁটিনাটি মনে নাই। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনাবলি ছয়-চল্লিশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমল মনে আছে।...আমার মহল্লায় হয়ত একজন মুচি ফুটপাতে বসিয়া মুসলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে। হয়ত একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাতে বসিয়া মুসলমানদের ক্ষৌরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান আততায়ী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায় গলায় বা পেটে এপার-ওপার ঢুকাইয়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধড়পড়

করিয়া লোকটি সেখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন অন্য শিকারের তালাশে” ।[৪৬]

মূলত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই কংগ্রেস তথা ভারতের হিন্দুদের অখণ্ড ভারতের দাবি থেকে সরে এসে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি নমনীয় হতে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে বিরোধিতার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রীপরিষদে যোগদান করেও বিরোধিতার মুখে গণপরিষদ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি মেনে নেয় ।[৪৭]

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ঘোষণায় ভারতের বড় লাট লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলিম লীগের বিরোধী ভূমিকা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অখণ্ড ভারতের অনড় অবস্থানকে দুর্বল করে তোলে। অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন কূটনৈতিক উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে দেশ ভাগের ব্যাপারে নমনীয় করে তোলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত ভারত বিভাগের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ তথা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। [৪৮]

মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন পূর্ববাংলা তথা বাংলার সকল নেতাকে প্রভাবিত করেছিল। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন মূলত কৃষক প্রজা আন্দোলনের নেতা। ফজলুল হক ছিলেন কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূচনাকারী আবার অবসানে তার ভূমিকাই মূখ্য। ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ (১৯৩৭) দিলেও আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা পার্টিতে থেকে *দৈনিক কৃষক* (১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে হক মন্ত্রীসভার

বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তবে লাহোর প্রস্তাব তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত এবং এর পক্ষে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। আবুল মনসুর আহমদ এর ভাষায়-

> "এই ভাবে এই মুদ্দতটা হইয়া গেল আমার জন্য চরম বিভ্রান্তির যুগ। বস্তুত: আমার চিন্তারাজ্যে এমন গোলমাল আর কখনো ঘটে নাই। চিন্তার অস্পষ্টতাহেতু মতের দৃঢ়তা আর থাকিলনা। সব কথায় এবং সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আমি কিছু কিছু ভাল এবং কিছু কিছু মন্দ দেখিতে লাগিলাম... কংগ্রেস লীগ আপোসের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান যতই পিছাইয়া যাইতে লাগিল আমি ততই মুসলিম লীগের দিকে হেলিয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার কংগ্রেসী নেতারা যতই হিন্দু হইতে লাগিলেন, আমি ততই মুসলিম হইতে লাগিলাম। আমার এই মুসলিমত্বে অবশ্য ধর্মীয় গোড়ামি ছিলনা; পরধর্ম বিদ্বেষও ছিলনা। ছিল শুধু তীব্র স্বকীয়তা আত্মমর্যাদা বোধ ও স্বতন্ত্র চেতনা। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যটা এই সময় আমার কাছে বুনিয়াদি মানস পার্থক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল"।[৪৯]

আবুল মনসুর আহমদের এই মানসিক পরিবর্তনে ডা.আম্বেদকারের ইংরেজী গ্রন্থ 'পাকিস্তান' এবং মৌলবী মুজিবর রহমানের বাংলা গ্রন্থ 'পাকিস্তান' যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে আস্তে আস্তে তিনি পাকিস্তান বাদী হয়ে পড়েন এবং অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগ দেন। আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনের একটা বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি দুটি বিষয় ঠিক করেছিলেন।"এক, পাকিস্তান দাবিকে দেশ-বিদেশের সকল চিন্তুকের কাছে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে উহাকে একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপ দিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্রাকটিক্যাল করিতে হইবে। দুই, শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল-াদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোল-াদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিয়ে রাস্তা চলে তাই জীবন পথে মুসলমানরা এত বেশি হোঁচট খাইতেছে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাতে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। এই দুইটা সম্ভাবনাকে ঠেকাইতে হইবে।"[৫০]

পাকিস্ড়ান আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ‘পূর্ব পাকিস্ড়ান রেনেসাঁ সোসাইটি’তে যোগ দেন। তাছাড়া হিন্দু সাহিত্যিকদের সমান্ড়রালে মুসলমানি সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে সাহিত্যে পাকিস্ড়ান বিরোধী ভাবধারাকে যারা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ অন্যতম। ১৯৪৪ সালের ৫মে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্ড়ান রেনেসাঁ সোসাইটির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি। মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার মধ্যে পাকিস্ড়ান আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপটা ধরা পড়ে। পরবর্তীতে তিনি উলে- খ করেন-

“প্রথমত, আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্ড়ান দাবিটা প্রধানত: কালচারেল অটনমির দাবি বলিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়ে কালচারেল অটনমি অধিক গুর“ত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্ড়ান দাবি শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা গোটা ভারতের কালচারাল মাইনরিটির জাতীয় দাবি। দ্বিতীয় কথা আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত। বলিয়াছিলাম, শুধু মাত্র ধর্ম জাতীয়তার বুনিয়াদ হইতে পারেনা।” [৫১]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সময়ের দাবী হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হয়েও পাকিস্ড়ান আন্দোলনের প্রধান সমর্থকে পরিণত হন এবং মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান। তবে কখনও তার মন থেকে কৃষক-প্রজাদের স্বার্থের বিষয়টি মুছে যায়নি বরং মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের পদ কে ব্যবহার করে তিনি কৃষক প্রজাদের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাই তিনি “লাঙ্গল যার মাটি তার”, “বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ”, “কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই”, “শ্রমিক যে মালিক সে”, ‘জনগণের পাকিস্ড়ান”, “কৃষক শ্রমিকের পাকিস্ড়ান”, প্রভৃতি শে- াগান তৈরি করে পোস্টার প- াকার্ড ছাপিয়ে রাস্ড়ায় রাস্ড়ায়, গ্রামাঞ্চলে পাঠাতেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তাঁকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিলেও কেন্দ্রিয় পার্লামেন্টারি বোর্ড তা বাতিল করে আবুল কালাম

শামসুদ্দিন কে মনোনয়ন দেয়। তবে তিনি ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগের সদস্য নির্বাচিত হন কিন্তু কেন্দ্রিয়ভাবে মুসলিম লীগ গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করায় তাতে আর যোগ দেওয়া হয়নি।[৫২]

আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্ড়ান আন্দোলনের সমর্থক হলেও পাকিস্ড়ানের ত্রুটিপূর্ণ বিভক্তি সম্পর্কে তার লেখনির মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা-

"পার্টিশনে পাকিস্ড়ানের উপর অবিচার করা হইয়াছে। রেফারেন্ডামে বিপুল মিজরিটি পাকিস্ড়ানের পক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও সিলেটের করিমগঞ্জ ভারতের ভাগে ফেলা; সমস্ত গৃহীত মূলনীতির বরখেলাপে পাকিস্ড়ানের গুরুদাসপুর জিলা ভারতের ভাগে ফেলা; সুস্পষ্ট ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত মূলক অবিচার। কৈফিয়ত স্বরূপ বলা হয় যে কায়দে আযম লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্ড়ানের বড় লাট না করিয়া নিজেই বড় লাট হইয়া পড়ায় পাকিস্ড়ানের উপর রাগ করিয়াই মাউন্টব্যাটেন র‌্যাডক্লিফকে দিয়া এসব অবিচার করাইয়াছেন। জিন্না সাহেব বড় লাট হইবার ব্যক্তিগত লোভটা সংবরণ করিতে পারিলে পাকিস্ড়ানের উপর মাউন্টব্যাটেন অত অবিচার করিতেন না। ...পূর্ব পাকিস্ড়ানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই কাটা-ছেঁড়া পোকায় খাওয়া অবস্থার জন্য র‌্যাডক্লিফের চেয়ে আমাদের নিজের প্রতিনিধি নেতাদের দায়িত্ব কম ছিলনা। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী ও বেঙ্গল পার্টিশন কাউন্সিলের মেম্বর থাকাকালের এবং তার পরবর্তী কালের পার্থক্য হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।... সোহ্‌রাওয়ার্দীহীন পার্টিশন কাউন্সিল শুধু কলিকাতা ছাড়িলেন না, কলিকাতার দামে লাহোর কিনিয়া মূর্খের হাসি হাসিয়া বাড়ি ফিরিলেন আর কোথায় গেল ব্যারাকপুর, বারাসাত, ভাঙ্গর বশির হাট? কোথায় গেল দার্জিলিং? যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছে। কারণ পূর্ব বাংলার স্বার্থ দেখার কেউ ছিলনা। যারা তৎকালে আমাদের নেতা ছিলেন তারা পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের বিশেষত স্বয়ং কায়েদে আযমের মুখাপেক্ষী পদমর্যাদা লোভী ভিখারী মাত্র। পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা বলিয়া পাকিস্ড়ানী নেতৃত্বের বিরাগ ভাজন হইতে কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। হক সাহেব ও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের হাতে

নাস্ড়্নাবুদ হইতে দেখিয়া এদের কেউ আর টু শব্দ করিতে সাহস করেন নাই বলিয়াই মনে হয়।” ৫৩

আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৬ সালে তেমনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তখন পূর্ব বাংলার স্বার্থ সংশি- ষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে একটি বিষয় ছিল কলকাতাকে পূর্ব বাংলার অন্ড়র্ভূক্তির দাবী জানিয়ে তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালান। এসময় খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের অনেক নেতা *দৈনিক ইত্তেহাদ* অফিসে এসে আবুল মনসুর আহমদকে কলকাতা রক্ষার আন্দোলন বন্ধ করার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তা মানেন নি। দেশ ভাগের পর আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় থেকে গিয়ে পত্রিকা চালাতে থাকেন কিন্তু নাজিমুদ্দিন সরকার বাংলাদেশের *দৈনিক ইত্তেহাদের* প্রকাশ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সরকারের অসহযোগিতার কারণে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করার পরও পত্রিকা প্রকাশ করা হয়নি। ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের ইতি ঘটে।

অন্যদিকে দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বঙ্গভাগের বাস্ড়ব প্রেক্ষাপটেও তাঁকে কলকাতাবাসী সাদরে গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য ১৯৫০ সালের মে মাসে নিজ এলাকা ময়মনসিংহে চলে আসেন এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নানা কারণে এ সময় পাকিস্ড়ানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রামে সোচ্চার হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্ড়ানের বঞ্চিত জনসাধারণ। ভাষা আন্দোলন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে।[৫৪] ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হলেও ক্রমে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দুই পর্বে বিভক্ত এ আন্দোলন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ

ছিল এবং শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।[৫৫] মূলত *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন জানান।[৫৬] তাছাড়া ময়মনসিংহে গিয়ে অহিংস ভাবে সকল নেতা কর্মীকে নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দিন মজলিস' পাকিস্ড়ানের 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' এ নামে একটি পুস্ড়িকা প্রকাশ করে। [৫৭] তিনটি প্রবন্ধের এ সংকলনে কাজী মোতাহের হোসেন এবং আবুল কাসেমের সঙ্গে 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্র ভাষা' শিরোনামীয় অন্য প্রবন্ধের লেখক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ।[৫৮] এভাবে পূর্ব বাংলার রাজনীতির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[৫৯]

দেশ বিভাগের পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার তাবেদারী দলে পরিণত হয়। কেননা মুসলিম লীগ সরকার ও দল হিসেবে দেশ পরিচালনায় চরম বৈষম্য, ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার, দমননীতি অনুসরণ অনুকরণ করে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিম লীগের একদল আত্মসচেতন উদারপন্থী ও অসাম্প্রদায়িক তর“ণ রাজনৈতিক কর্মী আলাদা একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই রাজনৈতিক তাড়না থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে পূর্ব বাংলার নতুন রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আত্মপ্রকাশ করে।[৬০] প্রথমদিকে এ দলের তেমন উলে- খযোগ্য কোন সাংগঠনিক তৎপরতা ছিলনা। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক মাঝে মধ্যে পার্টি তৎপরতা সক্রিয় রাখার জন্য বক্তৃতা বিবৃতি দিতেন। তাছাড়া শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও যুক্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিচিতি।[৬১] ১৯৫০ সালে আবুল মনসুর আহমেদ 'আওয়ামী মুসলিম লীগে' যোগদেন এবং এই দলের ময়মনসিংহ জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই দল গঠনের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি উচ্চবিত্ত ও নবাব পরিবার থেকে ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তদের কাছে চলে আসে। নব গঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ক্রমান্বয়ে

অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয় এবং মুসলিম লীগের অনাচার ও ব্যর্থতার বির্"দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। [৬২]

পাকিস্ড়ান জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্ড়ান ভিত্তিক উপদল তাদের মধ্যকার ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনীতি, স্বাধীকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব দেশটিকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যক করে তোলে। [৬৩] পরবর্তীতে পাকিস্ড়ানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নীতি ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্ড়ানের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন দল নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকে। অবশেষে সরকার ১৯৫৩ সালে নির্বাচন সংক্রান্ড় ধারা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্ড়ান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করে। [৬৪] ১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ আওয়ামী মুসলিম লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন হয় তাতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করে এর একুশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার নেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ গুলো হলো মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ', এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন 'কৃষক শ্রমিক পার্টি', মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন 'নেজাম-ই-ইসলামী' এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন 'বামপন্থী গণতন্ত্রী' দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় নৌকা। আবুল মনসুর আহমেদ ঐতিহাসিক ২১ দফার রূপকার হিসেবে বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় স্থান দখল করে আছেন। [৬৫] একুশ দফা বাঙ্গালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। ঐতিহাসিক একুশে ফেব্র"য়ারিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অন্যতম পন্থা হিসেবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ২১টি দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া ২১ দফা আবুল মনসুর আহমদের স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও মা, মাটি, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অনন্য স্মারক। এটি ছিল একটি সুচিন্ড়িত, সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ড় ও সুলিখিত

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল যা আবুল মনসুর আহমদ প্রস্তুত করেছিলেন। [৬৬] ২১ দফা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "শেষ পর্যন্ড় কাউন্সিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার অনুমতি দেন। অত:পর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার আমার ওপর পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফা একটি নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করিয়াছিলাম। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য। শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবাকেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায়ও ছিল। কাজেই ২১ ফিগারটিকে চিরস্থায়ী করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীকে ২১ দফার কর্মসূচী করিলে কেমন হয়? অত:পর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল।" [৬৭]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৬৮] যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার শুরু থেকেই মন্ত্রীত্ব নিয়ে শরীক দলগুলোর মধ্যে চরম অসন্ড়োষ দেখা দেয় যা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম দূর্বলতা। এরই মধ্যে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রিয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ড় এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন। [৬৯] মূখ্যমন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেওয়াতে বাংলার আঞ্চলিক অন্যান্য নেতাদের মত তিনিও প্রতিবাদ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী লীগের মনোনয়নের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ সদস্যদের ভোটে পাকিস্ড়ান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৭০] তাছাড়া ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের রায়কে উপেক্ষা করে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার সকল স্ড়রে আন্দোলন চলাকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে পাকিস্ড়ানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়।[৭১] সংবিধান রচনার পেছনে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী,

আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাথে আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকাও ছিল খুবই গুর"ত্বপূর্ণ।[৭২]

১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্ড়ানে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হলে আবুল মনসুর আহমদ শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু ছয়দিন পর সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে পাকিস্ড়ান সরকার গঠিত হলে তাঁকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আবুল মনসুর আহমদ গৃহীত অনেক সংস্কার ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর দীর্ঘ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসময় আবুল মনসুর আহমদ, প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুপস্থিতিতে পাকিস্ড়ানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক জীবনে এটাই ছিল শীর্ষ অবস্থান। [৭৩]

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্ড়ান এর শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক এবং আমলাদের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯৫৮ সালে সেনা শাসন জারির বেশ আগে থেকে দেশের শাসন প্রক্রিয়ার ভেতর সেনাবাহিনীর পরোক্ষ ভূমিকা ও প্রভাব যুক্ত হয়। শুর" থেকেই পাকিস্ড়ানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছিল। এমনি এক পরিস্থিতিতে পাকিস্ড়ানের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল খুব অবাক হবার মত কোন ঘটনা নয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্ড়ানের সংবিধান বাতিল করে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রথমে সামরিক শাসন জারি করেন। এরপর বিশ দিনের মাথায় তাঁকে উৎখাত করে আরেক সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্ড়ানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১০ই অক্টোবর আবুল মনসুর আহমদকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয় তবে ১৯৫৯ সালের ২৯শে জুন হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চের রায়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলে ৬ই ফেব্র"য়ারি রাতে আবুল মনসুর আহমদকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

"জেলখানায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই *ইত্তেফাক* সম্পাদক মিঃ তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), শেখ মুজিবুর রহমান, কফিলুদ্দীন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মিঃ কোরবান আলী, মিঃ তাজউদ্দিন প্রভৃতি প্রায় বিশ-বাইশ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী (অধিকাংশ আওয়ামী লীগের) আমাদের সহিত একই ওয়ার্ডে মিলিত হইলেন। আমরা জেলখানায় থাকিতে থাকিতেই প্রেসিডেন্ট আইউব নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়েই ২৭শে এপ্রিল (১৯৬২) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এন্তেকাল করিলেন। আমরা শোকে সত্য সত্যই মুহ্যমান হইলাম"।[৭৪]

১৯৬২ সালে কারা মুক্তির পর আবুল মনসুর আহমদ আর রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেননি, লেখালেখি করেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। আবুল মনসুর আহমদ ৬৪ বছর বয়সে রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসেন। তাঁর জীবনের বাকী সময়ে তিনি বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ জীবনের শুরু থেকে রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আঞ্চলিক নেতা হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতির নিয়ন্ত্রকরূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৭৫] সমকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতো। তাই আবুল মনসুর আহমদ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা সমিতি ও আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে মূলত জমিদার, নাইট, নবাব ও উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণির একাধিপত্য ছিল। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসে শুধু তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রতিভার গুণে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তাঁর অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভায় তাঁকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[৭৬] ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌচুক্তি, ১৯১৯-১৯২২ সালের খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৭ সালের নির্বাচন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ও পরিশেষে পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ

বিভাগ প্রভৃতির ধারাবাহিকতায় মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতার পূর্ণাঙ্গ রূপটি ধরা পড়ে।[৭৭] আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা অর্জন আন্দোলনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। একদিকে তিনি ধর্মের খোলসধারী, কাঠমোল-া, ভন্ডপীর, ফতোয়াবাজ ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের বির"দ্ধে সাহিত্যিক আন্দোলন চালিয়ে সমাজকে শোধনের চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের আন্দোলনে আপোসহীন নেতৃত্ব প্রদান করেন। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক হলেও ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল রক্ষণশীল এবং কখনও কখনও প্রতিক্রিয়াশীলও। এ কথা সত্য যে এক জীবনে তিনি ব্রিটিশ, পাকিস্ড়ানি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বহু আন্দোলন, বিক্ষোভ, মের"করণ, সংগঠন বা সংহতি সৃজনের সাথে যুক্ত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শোষক, জমিদার, মহাজন, ধনিক, বণিকের অন্যায় আচরণ ও অবিচারমূলক প্রথা বা বিচার ব্যবস্থার বির"দ্ধে তিনি সোচ্চার সক্রিয় ও প্রতিরোধ রচনাকারীও ছিলেন। তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্যে বিপ- ববাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদ বেগবান হয়েছিল। নেতাজী সুভাষ বসুর সান্নিধ্যে সাহচর্য লাভ করলেও এবং ভক্তি প্রনত চিত্তে নেতাজীর বহু উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের অনুমোদনকারী হলেও আবুল মনসুর আহমদ কোথাও কখনো বিপ- ববাদের কিংবা বিপ- বী কোন দল বা উপদলের সঙ্গে যুক্ত হননি। কমিউনিস্ট মতবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর মোহ বা অনুরাগ ছিলনা। মওলানা ভাসানী ও ন্যাপের মার্কিন বিরোধী বক্তব্য ও প্রচারণাতে তিনি সমালোচনা করেছেন এবং সদা সর্বদা সজাগ মানসিকতায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার্থে তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নির্দেশিত রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করেছেন। তৎকালীন সময়ে একই ব্যক্তির একই সঙ্গে কংগ্রেস, লীগ, প্রজা পার্টির সদস্য ও নেতৃত্ব গ্রহণ ও ধারণ করা তার রাজনৈতিক কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ক্ষমতার বৃত্তে না পৌঁছতে পারলে আত্মসেবা কিংবা জনসেবা কিছুই করা যায় না। এই বোধ বিশ্বাস শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মতো আবুল মনসুর আহমদেরও ছিল। কংগ্রেসী হিসাবে আবুল মনসুর আহমদের আদর্শ ছিল গণতন্ত্র ও কর্মসূচি ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। বাংলার ইতিহাসে প্রজা পার্টি এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল

হকসহ প্রজা পার্টির নেতৃত্বে তাঁর একটা গুর—ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লীগ ও কংগ্রেসি বিরোধিতার মুখে প্রজা পার্টি ও ফজলুল হক অকুতোভয় সংগ্রামী ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন আবুল মনসুর আহমদের মত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতার অক্লান্ড় ভূমিকার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্ড়ানের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আবার আওয়ামী লীগের নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের অনুসারী হিসেবে মন্ত্রীত্ব করেছেন। স্বাধীকার, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলনে ও সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি তাঁর মেধা ও মনন প্রয়োগ করলেও নানারূপ শঙ্কা ও দ্বিধাগ্রস্থতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবুল মনসুর আহমদের মুসলিম বাংলা ভাষিক কৃষ্টির স্বকীয়তা ও লাহোর প্রস্ড়াবের বাস্তবায়নে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব ইত্যাদি ধারণা মুসলিম লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অন্যান্য মহলের প্রাণে আশা, মুখে কথা ও কাজে প্রেরণা দিয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের বিশিষ্ট দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও সে বাংলাদেশী প্রচেষ্টায় তাঁর সক্রিয় সমর্থন ঐতিহাসিক সত্য। তিনি জাতীয়তাবাদে বাঙালি মুসলমান, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরম গণতান্ত্রিক ছিলেন। ষাটের দশক শুর— হতে না হতেই যখন বয়োবৃদ্ধ জাতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী পরলোক গমন করেন আবুল মনসুর আহমদ তখন স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।এই মহান রাজনীতিবিদ **১৯৬৯** সালের মার্চ মাসে ইন্ড়েকাল করেন।[৭৯]

প্রান্তটীকা

১। নুরুল আমিন, আবুল মনসুর আহমদ, *জীবনী গ্রন্থমালা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২

২। জমিদার ঃ ফার্সি 'যামিন' (জমি) ও 'দাস্তান' (ধারণ বা মালিকানা) এর বাংলা অপভ্রংশের সঙ্গে 'দার' সংযোগে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগীয় বাংলার অভিজাত শ্রেণির ভূমধ্যধিকারীদের পরিচয় জ্ঞাপক নাম হিসেবে শব্দটি ঐতিহাসিক পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মোঘল আমলে জমিদার বলতে প্রকৃত চাষীর ঊর্ধ্বে সকল খাজনা গ্রাহককে বোঝানো হতো। (সিরাজুল ইসলাম ও শিরীন আখতার, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৬৪-৪৭০)

কাচারি ঃ সতেরো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সম্ভবত হিন্দি বা মারাঠি ভাষা থেকে উদ্ধৃত হয়ে বাংলায় প্রচলিত হয়। কাচারি বলতে বোঝায় একটি আদালত ভবন, একটি বড় কক্ষ, একটি প্রশাসনিক দফতর, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত একটি স্থান ইত্যাদি। মাদ্রাজ এবং মহিশুরে অফিস আদালতকে সচরাচর কাচারি বলা হয়। (সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২৯)

৩। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৭১-৭৭৩

৪। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য, সমাজ, জীবন ও রাজনীতি*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , ২০১৩, পৃ. ৬৪

৫। নুরুল আমীন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩

৬। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল , দশম সংস্করণ, ২০০২,*পূনর্মুদ্রণ* ২০১০, ঢাকা, পৃ. ১৬-১৮

৭। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী, ৩য় খন্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯৩

৮। *মোহাম্মদী* মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৯০৩ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক *মোহাম্মদীকে* দৈনিকে পরিণত করা হয়। *মোহাম্মদী* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), (Rana Razzaque, *Some Aspects of Bengali Muslim Social and*

Political Thought (1918-1947),Unpublished Ph.D Thesis,Dhaka University, 1997, P.220.*)*

খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী ফরিদপুর জেলার বেলগাছির জমিদার। লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৮৯৯ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং প্রায় নিয়মিতভাবে এর অধিবেশন সমূহে যোগ দেন। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা থেকে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯১৫- ১৬ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কমিটির সদস্য ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৪-১৯২৬) নির্বাচিত হয়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৬ সালে খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন। *(ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫)

৯। মওলানা আহমদ আলী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার অন্তর্গত মেছাঘোনা গ্রামে ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সে বঙ্গবিভাগ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫-১১) যোগদানের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে পদার্পন করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মওলানা আহমদ আলী এ কে ফজলুল হক পরিচালিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন করে এক বছর কারাবরণও করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি পুনরায় কারাবরণ করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মওলানা আহমদ আলী ছিলেন কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান বিরোধী। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। তিনি 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' এর বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। এছাড়া মওলানা আহমদ আলী *দৈনিক ছোলতান, কৃষক, নবযুগ*, পত্রিকার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৬৯)

১০। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৩

১১। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

১২। রাওলাট আইনঃ ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি তদন্তের জন্য ইংরেজ আইনজীবী রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে 'রাওলাট বিল' নামে একটি খসড়া আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে

উপস্থাপন করা হয়। এ আইনে এমন একটি বিশেষ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় যার রায় আপীলের ঊর্দ্ধে। তাছাড়া গোপন বিচার, থানা তল্লাশী ও গ্রেফতারের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবস্থাও এ আইনে রাখা হয়। (বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮১)

১৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২-৯

১৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭

রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সত্যাগ্রহ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভার প্লাটফর্ম থেকেই তিনি সত্যাগ্রহ শপথ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীকে বিশ্বস্ততার সাথে সত্যের অনুসরণ এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শপথ গ্রহণ করতে হত। একজন সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গান্ধীর অভিমত ছিল এরূপ 'একজন সত্যাগ্রহীকে রাগ থেকে মুক্ত- রাজনৈতিক প্রতিবাদী হতে হবে। তিনি প্রতিপক্ষের ক্রোধ সহ্য করে যাবেন কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্তী হবেন না। সরকার যখন তাকে গ্রেফতার করতে আসবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করবেন। সত্যাগ্রহী কখনও ইংরেজ জাতির প্রত্যাশাকে সালাম করবে না, তবে পতাকাকে লাঞ্ছিতও করবে না। (সৈয়দ মকদুস আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.৯৫-৯৬)

১৫। মৌলবী আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রথম সারির পরিচালক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহকর্মীরূপে বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। *'The Mussalmans'* (১৯০৩) পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০ সালে মওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে প্রেরিত খেলাফত ডেলিগেশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। মুসলিম লীগের সাথেও মৌলবী আবুল কাসেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভা ও পরে ভারতের কেন্দ্রিয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অন্য পরিচয় হল তিনি আবুল হাশিমের পিতা ছিলেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* , ১৯৯৬, পৃ. ১৮০)

১৬। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৩

১৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৫, ২৬-৩৩

১৮। আবু আল সাঈদ, *মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* ১২০৬-১৯৭৫, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা , ১৯৯৯, পৃ. ৮০

১৯। কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

২০। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৫

২১। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৬, ৩৭-৩৯, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, কালের ধ্বনি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৪-৮৫

২২। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, ২০১৩, পৃ. ৮০।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন নিয়ে সমালোচনার এক পর্যায়ে ভারত সচিব লর্ডবার্কেন হেড সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ করেন। সাইমন কমিশনের প্রতি বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯২৮ সালের ১৯ মে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে মিলিত হয় ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করেন। আগস্টের শেষে এই কমিটি ভারতীয় সংবিধানের খসড়া বিষয়ক রিপোর্ট লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে পেশ করে যা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। রিপোর্টে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরা এই রিপোর্ট প্রত্যাহার করেন। (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬)।

নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের অধিকার বিষয়ক ১৪ দফা পেশ করেন। ভারতে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, সমমানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ, কেন্দ্রিয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আইন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা, চাকরিতে ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি দাবী এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই দাবীর প্রতি একমত হননি। (এম. এ রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১)

২৩। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

২৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৫

২৫। 'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া' নামে সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন বাংলার ও ভারতের অনেক সদর ও মফস্বলে স্থাপিত হয়। তার মধ্যে ময়মনসিংহের 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' (১৮৭৫) প্রাচীনতম। ১৮৮৮ সালে ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' স্থাপিত হয়। সৈয়দ আবদুল বারি আঞ্জুমানের সভাপতি এবং শেখ হেদায়েত বক্স সম্পাদক ছিলেন। ঢাকার আঞ্জুমান কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। ঢাকার আঞ্জুমানের ভূমিকা সে সময়ের পটভূমিতে মুক্ত ও উদার হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে সমাজের একটি

অংশ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে যার কারণে ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। (ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম সভা-সমিতির ইতিহাস (১৮৫৫-১৯৪৭)*, ঢাকা ,২০০৪ , পৃ. ৮৮)

২৬। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

২৭। মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩১-৩২

২৮। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৮

২৯। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৬৬

৩০। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০, ৮৫-৮৬

৩১। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩০

৩২। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৩৩। Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, p.79-81

৩৪। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯

৩৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৬

৩৬। সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৩০-১৩৬

৩৭। সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩, ১৩১, ১৩৫-৩৬, ১৪৩, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৫৫

৩৮। সিমলা ডেপুটেশন ঃ ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ভারত সচিব লর্ড মর্লি ইংল্যান্ডের কমন্সসভায় ভারতের আইন পরিষদের গঠনকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করার ঘোষণা দেন। বিষয়টি উপলব্ধি করে নবাব মুহসীন-উল- মুলকের চেষ্টায় দেশের বিভিন্ন মুসলিম নেতার সহযোগিতায় মুসলমানদের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বড় লাটকে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উপলক্ষে ভারতের মুসলমানদের মধ্য থেকে সাড়ে চৌদ্দ লাখেরও অধিক (১৪,৬১,১৮৩টি) স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় এবং বড়লাটের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুহসিন-উল-মুলক ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামী স্মারকলিপির খসড়া তৈরী করেন এবং ১৯০৬ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে স্যার আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে

মুসলিম প্রতিনিধিদের এক ঘরোয়া বৈঠকে কিছুটা সংশোধনের পর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। আগা খাঁর নেতৃত্বে এই ডেপুটেশনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে স্থানীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় সকল কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিগণ মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার দাবি উপস্থাপন করেন যা 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে পরিচিত। (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী, প্রথম খন্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬০৫-৬০৯)

৩৯। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৪০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৪১। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪৯-১৫০

৪২। মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩১২

৪৩। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

৪৪। 'ভারত ছাড় আন্দোলন' (Quit India Movement) এটা আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা চালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। 'ভারত ছাড় আন্দোলন'ই পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। যার সফল পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে। (রঞ্জিত রায়, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৩-৩১৫)

৪৫। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬-৪৪২

৪৬। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৪৭। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৪৮। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৯-১৯১

৪৯। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৫০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৫১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৫২। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৫৩। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৫৪, ১৭৬

৫৪। মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

৫৫। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২

৫৬। *দৈনিক ইত্তেহাদ* ১৯৪৭ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয় যার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এটি মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালায়। তাছাড়া মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সাথে সাথে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জন্যও প্রচারণা করে। বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে খবর প্রচারিত হত। *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। (আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩৭২, ৩৮৬)

৫৭। 'তমুদ্দিন মজলিস' ১৯৪৭ সালে গঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তাদের মতামত দেওয়া শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই সংগঠন প্রচার করে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু" নামক একটি পুস্তিকা। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসামান্য ভূমিকা পালন করে 'তমুদ্দিন মজলিস'। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৮।)

৫৮। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৪-৪৭

৫৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮

৬০। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

৬১। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭-৭৮

৬২। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮

৬৩। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯

৬৪। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-৩৯

৬৫। নিজাম-ই-ইসলাম ঃ ১৯৫৩ সালে 'নিজাম-ই-ইসলাম' পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। এটি ছিল ইসলামপন্থী দল। এর প্রধান ছিলেন মওলানা আতাহার আলী। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ছিলেন এর সেক্রেটারি জেনারেল। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল হিসেবে 'নিজাম-ই-ইসলাম' থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ১৯ জন সদস্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠন করলে এ দল থেকে তিনি আশরাফ

উদ্দিন চৌধুরীকে অন্তর্ভূক্ত করেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮: একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ১৫৭,)

'আওয়ামী মুসলিম লীগ', 'কৃষক শ্রমিক পার্টি', 'বামপন্থী গণতন্ত্রী দল' একত্রে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বামপন্থী কর্মীদের সম্মেলন আয়োজন করে। এ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে (দিনাজপুর) সভাপতি এবং মাহমুদ আলীকে (সিলেট) সাধারণ সম্পাদক করে 'পাকিস্তান গণতন্ত্র দল' গঠিত হয়। দলটি র‍্যাডিকাল কর্মসূচীতে বিশ্বাসী ছিল। বস্তুত রাজনৈতিক দলের চেয়ে এটি ছিল বামপন্থী কর্মীদের একটি সংঘ বা গ্রুপ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ এর কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হন। তবে দলটি বেশিদিন টিকে ছিল না। (ইয়াসমিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭-৫৮)।

৬৬। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

৬৭। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

৬৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫২

৬৯। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৭১

৭০। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

৭১। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

৭২। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৭৩। মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩

৭৪। রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২৯-৭৮০

৭৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮২

৭৬। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪

৭৭। মোঃ চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪

৭৮। ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১

৭৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪-২৬৫

হাতেম আলী খান (১৯০৪–১৯৭৭)

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কৃষক সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিশ শতকের আগ পর্যন্ত ছিল না। তৎকালীন রাজনীতির সমস্যাসমূহ ছিলো সর্বাংশে উপর তলার সমাজের, সেহেতু সেখানে কৃষকদের প্রয়োজন অথবা প্রবেশাধিকার ছিলো সীমিত। এই অবস্থার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আসে উনিশ'শ বিশের দশকে খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে। এই পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ ছিলো এ সময় রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের আবির্ভাব।[১] এই ধারার নেতাদের মধ্যে হাতেম আলী খান অন্যতম কৃষক নেতা ছিলেন। কৃষক নেতা হাতেম আলী খান জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালে মতান্তরে ১৯০৪ সালের ২৪ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নের বেলুয়া গ্রামের এক ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে। বাবা নায়েব আলী খান জমিদার পরিবারের ছেলে হওয়ায় ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশবকাল। ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নিলেও বিত্ত-বৈভব ও আরাম-আয়েশের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। কৈশোর থেকেই তিনি শোষণ-বঞ্চনার বির"দ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যেখানেই অন্যায় অবিচার, তার বির"দ্ধে প্রতিবাদ করাই ছিলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। স্কুল জীবনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করেই জীবন কাটিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েও চাকরি-বাকরি বা অর্থ উপার্জনে কখনো মনোনিবেশ করেননি। হাতেম আলী খানের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা এবং একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাই পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়ে তিনি উলে- খযোগ্য অবদান রাখেন। [২]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) শুর"র দু-বছর পর ১৯১৬ সালে যখন স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ শুর" হয় হাতেম আলী খান তখন হেমনগর শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স বারোর কাছাকাছি। জীবনের সেই ঊষালগ্নেই কিশোর হাতেম আলী খানের মনোজগতে দ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুর" করে।[৩] তখন তিনি যুদ্ধে যোগদানের আশায় সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পাঠালে প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তীর

প্রযত্নে দাখিলা ফরম এসে পৌঁছে। প্রধান শিক্ষক তাঁর স্নেহের ছাত্রকে সেদিন বকাঝকা করেছিলেন পিতৃসুলভ অভিভাবকত্বের আবেদনে, বালকের মনে আশাভঙ্গের বেদনা জমা হলেও শিক্ষাগুর""র দেশপ্রেমমূলক নানা আলোচনা ও উপদেশ বাক্য তাঁকে চাঙ্গা রেখেছিলো। মানব মনের ঝোঁক প্রবণতা এমন যে তার প্রকৃত গতিমুখ খুলতে না পারলে তার নিবারণ অসম্ভব। হাতেম আলীর জন্য এক্ষেত্রে রসদ আসে তাঁর বড় ভাইয়ের সহপাঠী মাখন চন্দ্র দেবের তরফ থেকে, যার অনুপ্রেরণায় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝুঁকে পড়েন। এ সময় বিদ্রোহের পুঁথিপুস্তক, ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠি-তলোয়ার, বৃক্ষারোহণ, সাঁতার, লম্ফ, উদ্যাম গতরে দৌঁড়ঝাপ তাঁকে একজন প্রকৃত বিপ-বী করে তোলে।[৪] হাতেম আলী খান ছিলেন সশস্ত্র বিপ-বী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য।[৫] বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম শুর"" হয় বিশ শতকের গোড়ায়। শুধু ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে ১৯০৭ সালের মধ্যে অনুশীলন সমিতির পাঁচশ'টি শাখা খোলা হয়। সমিতির মাধ্যমে *যুগান্তর* নামে একটি পত্রিকা বের করা হতো।[৬] সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন আখড়ায় সমবেত হয়ে গোপন সভা, কর্মকা"ের পরিকল্পনা এবং শরীরচর্চা করতেন। আখড়ায় বিপ-বীদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করা হতো। সশস্ত্র বিপ-বী দলের সদস্যরা দেশের জন্য সবসময়ই জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতো। বিপ-বীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন করার জন্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করা।[৭] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ-বী সংগঠনগুলোর তৎপরতা বেশি বৃদ্ধি পায়। হাতেম আলী খান সশস্ত্র বিপ-বী সংগঠনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।[৮]

হাতেম আলী খান যখন সশস্ত্র বিপ-বীদের নির্দেশিত পথে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, তখন মহাত্মাগান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়।[৯] হাতেম আলী খানও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজপথে নামলেন।[১০] ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের বহু শহরে হরতাল পালিত হয়। হরতালগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। দেশের শস্যভা"ার খ্যাত পাঞ্জাবে আন্দোলন ব্রিটিশ প্রশাসনের বির""দ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ লাভ করেছিল। আন্দোলনে শ্রমিকরা, বিশেষ করে রেল শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রাম দমনের জন্য গভর্নর ও জেনারেল

ডায়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৯ এপ্রিল নতুন সৈন্য তলব করে এবং ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জনপ্রিয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালের বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র মানুষের ওপর সৈন্যবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। [১১] এর ফলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে প্রায় এক হাজার লোক নিহত ও প্রায় দুই হাজার লোক আহত হন। ঘটনার পরপরই ডায়ার কারফিউ জারি করেন। কারফিউ জারির ফলে কোনো চিকিৎসা সাহায্য ওখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। যে কারণে ময়দানে ও আশপাশের রাস্তায় অনেক লোক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। নিষ্ঠুর নির্যাতন আর অত্যাচার করেও ব্রিটিশ শাসকরা আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়। আন্দোলন তীব্রগতিতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি শিল্পশহর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেয়া "নাইট" উপাধি প্রত্যাখান করেন। [১২]
এ আন্দোলনগুলোতে গান্ধীর অহিংস নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ব্রিটিশ প্রশাসনের নৃশংস প্রতিশোধ পরিকল্পনাই এর পেছনে কাজ করেছে।[১৩] ১৯১৯ সালের ঘটনাবলিতে জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব কম। যে কারণে গান্ধী এ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে ঔপনিবেশিক সরকারের সম্মানসূচক নিয়োগ, উপাধি, সরকারি সংবর্ধনা, ব্রিটিশ স্কুল, কলেজ, আদালত, আইনসভার নির্বাচন ও আমদানি পণ্য বর্জন। এ ছিল প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের বয়কটের ধরণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল সরকারি কর দান বন্ধ করে দেয়া। আন্দোলন শুরুর দিন ধার্য করা হয় ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট। সমাবেশ, বিক্ষোভ ও হরতালের মাধ্যমে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খেলাফত আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংগঠিত করেন। [১৪] এ সময় ভারতের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে লড়াই সংগ্রামে সহযোগিতা ও যৌথ আন্দোলন সংগ্রাম করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সারা বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক-ছাত্র,

যুবক সবাই এ আন্দোলনে যোগ দেয়।[১৫] হাতেম আলী খান কলেজ ছেড়ে রাজপথে নেমে আসেন। কলকাতার রিপন কলেজের প্রায় চার হাজার ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ছাত্ররা মিছিল নিয়ে প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে যায়, সেখান থেকে দুই কলেজের মিলিত মিছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় প্রতিদিনই কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার, হারিশ পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ারসহ বিভিন্ন খোলা জায়গায় সভা-সমাবেশ হতো। এসব সভা-সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ নেতাদের বক্তৃতা শুনতো। [১৬] অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাতেম আলী খানের পরিচয় হয় আবদুল হালিম, আবদুল-াহ রসুল, সূর্যসেন, সত্যেন সেন, জিতেন ঘোষের মতো সংগ্রামী ব্যক্তিদের সঙ্গে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন।[১৭] এলাকায় এসে বিলাতি পণ্য বর্জন, জমিদারের খাজনাসহ দাদনের টাকা না দেয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পেলে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন চালায়।[১৮] ১৯২২ সালের প্রথম দিকে মতিলাল নেহের", জওহরলাল নেহের", মওলানা মুহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায়সহ বহু প্রখ্যাত নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।[১৯] আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন সত্ত্বেও গান্ধী হঠাৎ করে তার কর্মকৌশল পরিবর্তন করেন। কংগ্রেসের এ হঠাৎ মত পরিবর্তনের পেছনে যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার ছোট শহর চৌরিচৌরার একটি ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়। ১৯২২ সালের ৪ ফেব্র"য়ারি পুলিশ চৌরিচৌরায় আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর গুলি চালানোর পরে কৃষকরা পুলিশদের তাড়া করে থানায় অগ্নিসংযোগ করে। এখানে কয়েকজন পুলিশ নিহত হয়। গান্ধী প্রাকাশ্যে নিহত পুলিশদের পরিবারের কাছে সহানুভূতি জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তীব্র নিন্দা জানান। গান্ধীর এ সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। গান্ধীর এ মত পরিবর্তনের ফলে সশস্ত্র বিপ-বীদের গোপন কর্মকাণ্ডে নতুন জোয়ার দেখা দেয়। স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলো এ সময় কিছুটা পশ্চাৎপদসরণ করে এবং কংগ্রেসের মধ্যেও মতপার্থক্য বৃদ্ধি পায়।[২০]

ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চলাকালে বলশেভিকদের দ্বারা সংঘটিত রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ-ব বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। [২১] সারা

পৃথিবীর মানুষ এ বিপ-ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের খবরে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতেও নানাভাবে অক্টোবর বিপ-বের খবর আসতে থাকে। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় আগত ভারতীয় বিপ-বীরা লেনিনসহ অন্যান্য সোভিয়েত নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বিপ-বীদের মধ্যে মার্কসবাদেরও প্রসার ঘটতে থাকে।[২২] এক্ষেত্রে মানবেন্দ্র নাথ রায় উলে-খযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[২৩] তিনি ছিলেন মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মানবেন্দ্র নাথ রায় দ্বিতীয় কমিউটার্ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে বার্লিন হয়ে মস্কো যান। মস্কো থেকে ফিরে তিনি তাসখন্দ শহরে যান। সেখানে নির্বাচিত ভারতীয় কমিউনিস্টদের নিয়ে প্রথম দল গঠনের উদ্যোগ নেন এবং সফল হন। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। এম এন রায় ছাড়াও ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রবাসী দলগুলো গঠনের ক্ষেত্রে গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অবনী মুখার্জি। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যবর্তী সময়কে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২৪]

অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ১৯২২ সালে বোম্বাইয়ে মার্কসবাদী দল গঠন করেন। শওকত ওসমানী মস্কো থেকে ফিরে একই বছর বারানসীতে একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করেন। কলকাতায় মার্কসবাদী দল গঠন করেন মুজাফ্ফর আহমেদ। এ সময় বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেও মার্কসবাদী দল গঠিত হয়। অনেক জায়গায় মার্কসবাদী চক্রও গঠন করা হয়। গঠিত দলগুলোকে একত্রিত করে ১৯২৫ সালের ২৮-৩০ ডিসেম্বর কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রথম সম্মেলন আহ্বান করা হয়। পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে কলকাতায়। [২৫] ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ফলে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম দিকে হাতেম আলী খান কলকাতায় একজন সশস্ত্র বিপ-বী দলের কর্মী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করার কারণে বিপ-বীরা নতুন করে সশস্ত্র পন্থায় দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগঠিত হতে শুর‍ু করেন এবং গোপনে

চালানো হয় বিভিন্ন কর্মকান্ড। হাতেম আলী খান কলকাতায় কলেজ হোস্টেলে থাকা অবস্থায় শান্তিপুরের নূর মোহাম্মদ, দিলি-র অতূলচন্দ্র শীলের সঙ্গে মিলে 'ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি গঠিত হওয়ার পর আরও অনেকেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।[২৬] 'ন্যাশনাল লীগ' বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিস্ট হলে সংগঠনের বক্তব্য ও কর্মসূচী তুলে ধরার জন্য এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় চীনের কনসাল বক্তৃতা করেন। সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ-বী পথে স্বাধীনতা অর্জন করা। ন্যাশনাল লীগ কর্মীদের বিপ-বী ভাবধারায় তৈরি করতে হাতেম আলী খান বিভিন্ন জায়গায় পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শরীরচর্চা ও বিপ-বী বইপত্র পাঠ করানো হতো। বিজ্ঞানের কিছু ছাত্র বোমা তৈরির ফর্মুলা সংগ্রহ করে বোমা তৈরি শুরু করেন। সদস্যদের অস্ত্র চালনায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসময় হাতেম আলী খান সংগঠনের কাজে বিহারের গয়া, কাশী, বাংলার চন্দন নগরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যান। ফলে তরুণদের মধ্যে ন্যাশনাল লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ছাত্র যুবকরা সশস্ত্র বিপ-বী সংগঠনে যোগ দিতে থাকে। [২৭]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ শতকের শুরুতেই বাংলায় প্রজা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী নেতারা জমিদারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রজাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ক্রমেই প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এতে প্রজা আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। [২৮] ১৯১৪ সালে মহকুমা শহর জামালপুরের কামারিয়ার চরে এক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বক্তৃতা করেন রাজিবউদ্দিন তরফদার (১৮৯১-১৯৫৯), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, খোন্দকার আহমেদ আকালুবি প্রমুখ নেতা। [২৯] সম্মেলনের পর কয়েক বছর চলে যায় আন্দোলন জোরালো হতে। ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার চালু হলে রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কৃষক আন্দোলন শুরু হলে এসময় কৃষকদের নতুন করে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চলে।[৩০] ১৯২০ সালে জে. এন. রায় নামে একজন ব্যারিস্টার জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রজাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৯১৪-১৯৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির তৎপরতায় বাংলায় প্রজা

আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সেটেলমেন্ট কর্মচারীদের অনিয়মের বির‍ুদ্ধে ১৯২১ সালে কৃষকরা আন্দোলনে নামেন এবং পাবনা ও বগুড়ায় কয়েকজন অফিসারের ওপর আক্রমন করেন। এসময় ইউনিয়ন বোর্ড ও চৌকিদারি ট্যাক্সের বির‍ুদ্ধেও আন্দোলন করেন কৃষকরা। আন্দোলনের ফলে সরকারের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন বন্ধ হয়ে যায় এবং ট্যাক্স আদায় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। ময়মনসিংহের কৃষকরা খাজনা দিতে অস্বীকার করলে ময়মনসিংহের এ আন্দোলনের সঙ্গে খেলাফত নেতারাও যুক্ত হন। রাজশাহীতে ওয়াহাবি নেতা আবদুল-াহ হেল বাকী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারের বির‍ুদ্ধে আন্দোলন করেন।[৩১] ফলে ট্যাক্স ও খাজনা আদায় কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া তমলুক কাঁথিতে সরকারি খাসমহলে এবং মেদিনিপুর জমিদারিতে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে খাজনা আদায় বন্ধ হয়ে যায়।[৩২]

বিভিন্ন জায়গায় প্রজা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার পর হাতেম আলী খান নিজ গ্রাম বেলুয়ায় চলে আসেন। তিনি এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করে জমিদার সুদখোর মহাজনদের বির‍ুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। হাতেম আলী খানের নেতৃত্বে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদারের খাজনা, মহাজনদের দাদন ও বর্গাজমির ফসল প্রদান বন্ধ করে দেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় এলাকার জমিদার, জোতদার ও সুদখোর মহাজনরা একজোট হয়ে কৃষকদের আন্দোলন দমন করার জন্য নির্যাতন চালায়। হাতেম আলী খানকে ভয়ভীতি দেখানোর পর প্রাণনাশের চেষ্টাও করা হয়। এ আন্দোলনে হাতেম আলী খানের পরিবারও খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ কারণে তাঁর বাবা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে পরিবার, জমিদার, জোতদার সবার বিরোধিতার মুখে তিনি কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় গিয়ে আবার নতুন কৌশলে আন্দোলন সংগ্রাম শুরুর পরিকল্পনা করতে থাকেন। [৩৩]

অন্যদিকে ব্রিটিশ অনুগত জমিদার জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের নির্যাতন নিপীড়ন উপেক্ষা করে বাংলার কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকেন। তাছাড়া এসময় কৃষক শ্রমিকদের সমর্থনে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে।[৩৪] মওলানা ভাসানী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তৎপরতা শুর‍ু করেন। তিনি ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে এক প্রজা সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন হোসেন শহীদ

সোহ্‌রাওয়ার্দী। সম্মেলনে কৃষকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুল মোমিন। এ বিশাল কৃষক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহাত্মা গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে খাজনা হ্রাস, নজর সেলামি বাতিল এবং চক্রবৃদ্ধি হারে মহাজনের সুদ বাতিল করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা যোগ দেয়ায় সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ সম্মেলনের খবর দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।[৩৫] হাতেম আলী খান কলকাতায় বসে সিরাজগঞ্জের প্রজা সম্মেলনের খবর শুনতে পান। খবর শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হন। হাতেম আলী খান ১৯৩৩ সালে কলকাতা থেকে নিজ এলাকায় ফিরে এসে আবার জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বেলুয়া গ্রামের কাছাকাছি দু'জন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন, একজন হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী অন্যজন ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী।[৩৬] হেমনগরের জমিদারের বার্ষিক আয় ছিল চার লাখ টাকা এবং ধনবাড়ির জমিদারের বার্ষিক আয় ছিল আরও অনেক বেশি। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন বড় জমিদার এবং বঙ্গীয় সরকারের একজন মন্ত্রী। এ অঞ্চলে জমির পরিমাপ করা হতো ত্রিশ শতাংশে এক বিঘা। তখন খাজনা ছিল প্রতি বিঘায় এক টাকা। হেমনগর ও ধনবাড়ির জমিদার পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জমির মাপ হবে সাতাশ শতাংশে এক বিঘা, এ নতুন মাপ চালু হলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। নতুন মাপের ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ। জমি পরিমাপ করার জন্য মাঠে নামেন নায়েব, গোমস্তা ও আমিনরা। বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের তাগিদ দিতে থাকে পাইক পেয়াদারা। জমিদারের এ কূটকৌশলের কারণে প্রজাদের খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। এ অবস্থায় প্রজারা দিশেহারা হয়ে পড়ে কিন্তু জমিদারের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। আবার খাজনা নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারলে জমিদারের লোকেরা কৃষকদের ধরে নিয়ে আসতো। তারপর কাচারির সামনে একটা শিমুল গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হতো। নির্মম প্রহারে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যেত সে অবস্থায় জ্ঞান হারানোর পর

প্রজাদের ছেড়ে দেয়া হতো। হেমনগরের জমিদারও প্রজাদের ওপর একইভাবে অত্যাচার চালাতেন। বকেয়া খাজনার জন্য প্রজাদের শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া ও হাতি দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়ার মতো ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটতো।[৩৭]

জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও হাতেম আলী খান জমিদারের অত্যাচার নির্যাতন রুখে দাড়ানোর প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি নির্যাতিত শোষিত প্রজাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। হাতেম আলী খান হেমনগর ও ধনবাড়ির জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বাইশটি গ্রামের প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং তাঁর দক্ষ ও সাহসী নেতৃত্বে বাইশ গ্রামের কৃষক প্রজারা বিক্ষোভে শামিল হন। প্রজারা খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেন। তবে আন্দোলন কিছুদিন চলার পর পুলিশের মাধ্যমে নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন দমন করা হয়। এ আন্দোলনে বেলুয়া, ছাতারকান্দি, খামারপাড়া, ভোলারপাড়া, হাদিরা, খরিষা, বনমালীসহ বাইশ গ্রামের প্রজারা তার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করেন। পারিবারিক জীবনে দুর্ভোগের কারণে হাতেম আলী খান অন্য কোথায় না গিয়ে নিজ এলাকায় সংগঠনের কাজে বেশি সময় ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। কৃষকদের সচেতন করার জন্য গ্রামে গ্রামে বৈঠক এবং কৃষকের ঘরে ঘরে গিয়ে যোগাযোগ করতেন। সাইকেলে করে গ্রামের আলপথ দিয়ে চলাফেরা করতে করতে কৃষকের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফসলের ক্ষেতে যেতেন। সেখানে তাদের খোঁজ খবর নেওয়াসহ চাষাবাদ সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। তিনি পরিচিত কাউকে দেখলেই সাইকেল থেকে নেমে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে চলতেন। আবার অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে নামতে অনুরোধ করতেন। এলাকার জনগণ তাকে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুরোধ জানালে তিনি সদস্য পদে নির্বাচন করে ১৯৩৫ সালে হেমনগর ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৩৮]

প্রজা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র উদ্যোগে গোপালপুর থানার ভেঙ্গউলায় ১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৯] মওলানা আবদুল-াহ হেল বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ

নওশের আলী, মওলানা শামসুদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য নেতা।[৪০] এ প্রজা সম্মেলনে সারাদেশ থেকে কৃষক প্রতিনিধি, কাছের থানা ও জেলার কয়েক হাজার কৃষক প্রজা অংশ নেয়। হাতেম আলী খান সম্মেলনে অংশ নিয়ে গুর‍ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। করটিয়ার জমিদার মসউদ আলী খান এ এলাকার অন্য জমিদারের সহায়তায় প্রজা সম্মেলনে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কৃষকদের বাঁধার মুখে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সম্মেলনের প্রভাব কাজ লাগিয়ে হাতেম আলী খান কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করেন। [৪১]

এদিকে ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ শহরে কমিউনিস্ট কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্‌ফর আহমদ ও ধরণী গোস্বামী।[৪২] সভায় আলোচনা শেষে সবার মত নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সাত সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটিতে ছিলেন মনি সিংহ, সুধীন রায় (যিনি খোকা রায় নামে বেশি পরিচিত) আলতাব আলী (১৯১২-১৯৮০), পুলিন বকশ্‌ী, রবি নিয়োগী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী ও পবিত্র শংকর রায়।[৪৩] সুধীন রায়কে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। জেলা কমিটি গঠনের পর টাঙ্গাইল মহকুমা গঠনে তৎপরতা শুর‍ু হয় এবং কিছুদিন পর হাতেম আলী খান, নারায়ন বিশ্বাস, খন্দকার আবদুল বাকী ও আবদুর রহমানকে সদস্য করে মহকুমা কমিটিও গঠন করা হয়। নারায়ন বিশ্বাস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাতেম আলী খানকে মহকুমা কমিটি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়। [৪৪]

কৃষক সভা ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নেত্রকোনা জেলার নাগাড়ার মাঠে এক বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করে। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য জেলা কমিউনিস্ট ও কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। মাঠকে সারা ভারত কৃষক সমাবেশের উপযুক্ত করে তোলার জন্য মণি সিংহ, সুবিমল সেন, খুশু দত্ত রায়, শচীন চক্রবর্তী ও সুকুমার ভাওয়াল প্রমুখ নেতা দিনরাত পরিশ্রম করেন। সম্মেলনের কাজে শত শত হাজং যুবক এবং জুঁইফুল দত্ত, অঞ্জলি রায় ও নির্মলা সেনের নেতৃত্বে বহু মহিলাকর্মী দিনরাত পরিশ্রম করেন।[৪৫] সম্মেলন সফল করার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া ও পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বাঁশ সংগ্রহ করা হয়। বাঁশ ও চাটাই দিয়ে তৈরি হয় সুদৃশ্য বক্তৃতার মঞ্চ, সভাম−ল, প্রদর্শনী স্টল প্রভৃতি নিয়ে ছোট্ট একটি সুন্দর শহর গড়ে ওঠে। মণিপুর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে হাতেম আলী খানের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে লাখো জনতার সম্মিলন ঘটে। এতে সভাপতিত্ব করেন কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ। বক্তৃতা করেন পূরণ চাঁদ যোশী(১৯০৭-১৯৮৯), বঙ্কিম মুখার্জি, ভবানী সেন (১৯২২-২০১১), সুন্দরাইয়া নাম্বদ্রিপদ, সোমনাথ লাহিড়ী, হরকিষাণ সিং, চন্দ্রিকা সিং, ইরাবত সিং, আবদুর রাজ্জাক খান, কৃষ্ণবিনোদ রায়, আবদুল-াহ রসুল (১৮২৭-১৯১৭) প্রমুখ।[৪৬] সমাবেশের ফলে সারা বাংলায় কৃষকদের মধ্যে দার−ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। নেত্রকোণা কৃষক সমাবেশ থেকে ফিরে এসে হাতেম আলী খান নিজ এলাকায় কৃষকদের জমিদারদের বির−দ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুর− করেন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্য থেকে তিনি প্রত্যেক গ্রামে ১০ জন করে ভলান্টিয়ার নিয়ে একটি করে স্কোয়াড গঠন করেন। এই স্কোয়াডের নামকরণ করা হয় ‘হোমগার্ড’। হোমগার্ডের সদস্যদের নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের নিয়মিত কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়। এরপর হাতেম আলী খান হেমনগর ও ধনবাড়ির জমিদারদের বির−দ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোপালপুর ও মধুপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করা শুর− করেন। ওসব গ্রামের নেতাদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং পরামর্শ সভায় মিলিত হতেন। তাছাড়া হোমগার্ডের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তিনি যোগীর গোপা নামে একটি জনবেষ্টিত দ্বীপের নির্জন স্থানে বৈঠকে বসতেন। এসব বৈঠকে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। [৪৭]

১৯৪৬ সালের ২১-২৪মে খুলনা জেলার মৌভাগে কৃষক সভার নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনে কৃষ্ণবিনোদ রায় সভাপতি এবং মনসুর হাবিবুল-াহ সাধারণ সম্পাদক হন। বগলা গুহ ও অবনী লাহিড়ী যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৪৮] সম্মেলনে প্রধান বিষয় ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। সম্মেলনের প্রস্তাবে পাশ হয় যত শিঘ্রই সম্ভব ভাগচাষীদের তিনভাগের দু’ভাগের অধিকার দিয়ে অথবা চাষের সব খরচের অর্ধেক বহন

করলেই মালিক ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে এই মর্মে আইন হওয়া প্রয়োজন। বাংলার কৃষকদের মধ্যে একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যদিকে কৃষক সভার তৎপরতার ফলে বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় গণভিত্তিক সম্পূর্ণ কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। এ সময় টাঙ্গাইলের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোপালপুর ও মধুপুর অঞ্চলে হাতেম আলী খান একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[৪৯]

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ৬০ লাখ ভাগচাষী তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুর<্ করেন।[৫০] ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন চলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এ আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি। কৃষকদের দাবী আদায়ে হাতেম আলী খান তাঁর এলাকায় তেভাগা আন্দোলন শুর<্ করেন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য স্থানীয় কৃষক নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজ খোলানে ধান তোলার জন্য ভলান্টিয়াররা কৃষকদের পাশে থেকে তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে হোমগার্ডের সদস্যরাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কোথাও কোনো জোতদার বা জমিদার কৃষকের ওপর শক্তিপ্রয়োগ করলেই হোমগার্ডের সদস্যরা দলে দলে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। হাতেম আলী খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে টাঙ্গাইলের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোপালপুর ও মধুপুরে তেভাগা আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে টাঙ্গাইলের মহকুমা প্রশাসকের মধ্যস্ততায় কৃষক ও জমিদার পক্ষের মধ্যে একটি আপোস করা হয়। ফলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। টাঙ্গাইলে তেভাগা আন্দোলন সফল হওয়ার পর হাতেম আলী খান রংপুর, দিনাজপুর, রায়পুর ও মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন সংগঠনে কাজ করেন। [৫১]

টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে তেভাগার উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগেই পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপকতা গোটা অঞ্চলকে কাঁপিয়ে দেয়। ইতোপূর্বে পুরণচাঁদ যোশী ও বঙ্কিম মুখার্জিসহ কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলে স্বীকৃতি দেন। এ স্বীকৃতির ফলে হাতেম আলী খান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি এলাকার কৃষকদের পাকিস্তান

আন্দোলনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এ সময় মুসলমান প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে হেমচন্দ্র চৌধুরী তার কাচারির সামনে বাজার থেকে দু'জন দোকানিকে জবরদস্তিমূলকভাবে উচ্ছেদ করেন। এসময় হাতেম আলী খান উচ্ছেদকৃত প্রজাদের স্বপক্ষে দাঁড়ালেন এবং এলাকার কৃষকদের হেমনগর বাজার বর্জনের নির্দেশ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, হেমনগর বাজারের অদূরে তিনি একটি নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে জমিদার বাড়ির কাচারির সামনের বাজারটি বন্ধ হয়ে যায়। এমনিতেই জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক এবং পাকিস্তান আন্দোলনবিরোধী। তদুপরি নিজ কাচারির সামনের বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক মুসলমান প্রজাদের ওপর তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি প্রজাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান ও নতুন বাজারটি বন্ধ করার জন্য পাইক পেয়াদা ও বরকন্দাজদের লেলিয়ে দেন। সাধারণ প্রজা ও কৃষকরা জমিদারের বির―দ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে উভয়পক্ষে কয়েকবার তুমুল সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকেরা লাঠি, সুড়কি, বল- ম, দা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে। তারা কাচারি বাড়ি আক্রমণ করে জমিদারের কাগজপত্র সব ছিনিয়ে আনে। কাচারির নায়েব এবং পাইক-পেয়াদা ও বরকন্দাজদের বেদম প্রহার করে। এ ব্যাপারে হোমগার্ডের সদস্যরা গুর―ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এ ব্যাপারে বাদী হয়ে হাতেম আলী খানসহ মোট সাতজনকে আসামি করে টাঙ্গাইল মহকুমা সদরে ৩৯টি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মামলায় মহকুমা সদরের সব উকিল মোক্তার চৌধুরীর সপক্ষে এবং হাতেম আলী খানের বিপক্ষে মামলায় লড়তে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে আসামিদের বির―দ্ধে এলাকার কেউ সাক্ষী দিতেও রাজি হয়নি। ফলে মামলাগুলো এমনিতেই খারিজ হয়ে যায়। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রজারা জমিদারের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তারা জমিদার বাড়িতে ঘনঘন সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে। ফলে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি এলাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই ভারত বিভক্ত এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্তির আগে ঐ বছর ২৭ ফেব্র―য়ারি থেকে ১ মার্চ মেদেনীপুর জেলার পাঁচখুরিতে কৃষক সভার দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে কৃষ্ণবিনোদ রায় সভাপতি এবং মনসুর হাবিবুল-াহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্যসংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৩৮২ জন। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ৩৮২ জন। দেশবিভাগের পর কৃষক আন্দোলনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গ থেকে কৃষক সভার বহু হিন্দু কর্মী ও নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। নতুন পরিস্থিতিতে অনেক নেতা আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে পারেননি। স্বাধীনতার আগে কৃষকদের দাবী ছিল স্পষ্ট, তারা চেয়েছিলেন বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে বিনামূল্যে তাদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হবে। ভাগচাষীদের তেভাগা, পাটের ন্যায্যমূল্য ধার্য, মহাজনী ঋণ মওকুফ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস, কালোবাজারি মুনাফাখোরি বন্ধ এবং খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু দেশ বিভক্তির পরও পূর্ববাংলায় প্রাক পুঁজিবাদী ভূমি ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।[৫২]

তাছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূল করে দেয়া। মুসলিম লীগ সরকারের প্রচ— দমননীতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্য তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। কিন্তু হাতেম আলী খান এ সময় প্রকাশ্যে সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে সুদৃঢ় যোগাযোগ গড়ে তোলেন। অবশ্য চলি-শের দশকের প্রথমেই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৫৩] মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পূর্ব বাংলার শীর্ষস্থানীয় যেমন মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, সামসুল হক প্রমুখ নেতাগণ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিছু দিন পরে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দলে যোগদান করেন। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশের ইতিহাসে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র জন্ম একটি তাৎপর্যময় ঘটনা।[৫৪] 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের এক বছর পর ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র জেলা শাখা গঠনের কাজে ময়মনসিংহ আসেন। এখানে মওলানা ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী জেলা নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর

টাঙ্গাইলে মহকুমা 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের দায়িত্ব হাতেম আলী খানের ওপর অর্পণ করেন। হাতেম আলী খানের অক্লান্ত চেষ্টায় অল্প সময়ে টাঙ্গাইলে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।[৫৫] পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা রহিত করার পর কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের জন্য মওলানা ভাসানীকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী জাতীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে মওলানা আবদুর রশীদ তর্ক বাগীশকে (১৯০০-১৯৮৬) এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। মওলানা আবদুর রশীদ সংগঠনের সভাপতি ও মহিউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসময় হাতেম আলী খান কৃষক সমিতির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও দুটি কারণে তিনি কৃষক সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমত, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ দায়িত্ব গ্রহণে তাঁকে উৎসাহিত করেন। কারণ তিনি ছিলেন ভাসানীর প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়। একদিকে সাংগঠনিক তৎপরতা ও কর্মদক্ষতা অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হাতেম আলী খান ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।[৫৬]

১৯৫৪ সালের যুক্তফন্ট নির্বাচন ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের ওপর সাধারণ মানুষ এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, নির্বাচনী অভিযান শুর" হওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে এক ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ববঙ্গের সকল স্তরে এ দল জয়লাভ করে।[৫৭] এ নির্বাচনে হাতেম আলী খান যুক্তফন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ও খন্দকার আবদুস সামাদ। নির্বাচনে হাতেম আলী খান বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।[৫৮] চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের পর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র দমননীতির জন্য পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের আত্মঘাতী বৈদেশিক নীতির বির"দ্ধে

কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল সবসময় সংগ্রাম করেছে। হাতেম আলী খান 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র একজন নেতা হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবসময় সংগ্রাম করেছেন, সোচ্চার থেকেছেন। এ ব্যাপারে সবসময় তিনি পুরোপুরি মওলানা ভাসানীর অনুসারী ছিলেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রুপের সৃষ্টি হয়। হাতেম আলী খান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী বিরোধী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্যই মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। 'কাগমারী সম্মেলন' সফল করতে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে হাতেম আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫৯] তাই ১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই মওলানা ভাসানী যখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন, তখন দেশের প্রগতিশীল অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাতেম আলী খানও তাকে স্বাগত জানান। [৬০] আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে মওলানা ভাসানী দেশের প্রথম প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গড়ে তোলেন। [৬১] এ সময় হাতেম আলী খান ন্যাপের কেন্দ্রিয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং টাঙ্গাইল মহকুমা ন্যাপের সভাপতি হন। ন্যাপ গঠনের পর বিপুল রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে সন্তোষে কৃষক মজদুর কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। ন্যাপ গঠনের পাঁচ মাস পরে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে রংপুর জেলার ফুলছড়ি ঘাটে মওলানা ভাসানী এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়। সম্মেলনে মওলানা ভাসানী কে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। মওলানা ভাসানী ও হাতেম আলী খানের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের কর্মীদের নিষ্ঠার ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলাতেই কৃষক সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। [৬২] এদিকে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের মাত্র দশ মাস পরে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। পরবর্তীতে

আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হলে নানারকম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে এবং গণগ্রেফতার শুর করলে এসময় হাতেম আলী খান আত্মগোপন করেন। [৬৪] ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে কাগমারীতে মওলানা ভাসানীর কাছে চলে আসেন। এখানে তিনি কৃষক সমিতির কার্যক্রম তদারকি শুর করেন। ১৯৬৮ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল পাবনার লাহিড়ীমোহনপুরে কৃষক সমিতির সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে কৃষকদের পক্ষ থেকে খাজনা, ঋণ, দ্রব্যের দাম, কৃষক, জেলে, তাঁতীদের কাজের উপকরণ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত দাবী উত্থাপন করা হয়। [৬৫]

১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান দ্বিতীয় বারের মতো দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন কৌশলে দমনের জন্য কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে আইয়ুব খান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[৬৬] যুদ্ধের সময় হাতেম আলী খান সাংগঠনিক সফরে ময়মনসিংহে যান। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে পুলিশ হাতেম আলী খানকে গ্রেফতার করলে কয়েক মাস পর হাইকোর্টের রিট আবেদনের মাধ্যমে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকে সমর্থনের প্রশ্নে 'ন্যাপ' মওলানা ভাসানী ও মুজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালে কুলাউড়ায় দুই প্যানেলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক প্যানেলে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও আবদুল হক সাধারণ সম্পাদক হন। অন্যটিতে আমজাদ হোসেন সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক হন। [৬৭] মূলত ন্যাপের ভাঙ্গনের ফলেই হাতেম আলী খান মওলানা ভাসানীর মতের বিপক্ষে অবস্থান করেন অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরোধী পক্ষাবলম্বন করে মওলানা ভাসানীর সাথে হাতেম আলী খানের মতাদর্শের ক্ষেত্র আলাদা হয়ে যায় যা হাতেম আলীর জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল। [৬৮]

১৯৬৭ সালে কৃষক সমিতি ঢাকা জেলার রায়পুরা অঞ্চলে এক বিশাল কৃষক সমাবেশ আয়োজন করে। এই সমাবেশে প্রায় দশ হাজার কৃষক একত্রিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিলের আয়োজন করলে পুলিশ গ্রেফতার শুর করে। পুলিশ নির্যাতনের প্রতিবাদ সমাবেশ করায় সভাস্থল থেকে অন্যান্য নেতার সাথে হাতেম আলী খানকেও গ্রেফতার করা হয়। এর কিছুদিন পর হাতেম আলী খানের বির দ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয়

যে, নেত্রকোনা মহকুমার বোয়ার হাটে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। এ অভিযোগে তাঁকে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৬৯] ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর জেল থেকে বের হয়ে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে হাতেম আলী খান ঢাকা জেলার কৃষক সমিতির বিশেষ সম্মেলনে বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশ করে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন বেগবান করেন। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা করে। এই নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপের (মুজাফফর) একজন প্রার্থী হিসেবে টাঙ্গাইলের গোপালপুর আসন থেকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও কালো টাকার দৌরাত্মের কাছে পরাজিত হন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা দিতে নানা অজুহাত দেখায় এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালীর উপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। গোটা জাতি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় হাতেম আলী খান নিজ এলাকায় তরুণদের সংগঠিত করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সবাইকে কাজ করার আহ্বান করেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দিকনির্দেশনা ও নানাভাবে সহায়তা করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বেলাবোতে কৃষক সিমিতির সভা হয় যেখানে হাতেম অলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপ (মুজাফফর) এর মনোনয়ন নিয়ে গোপালপুর-ভুঞাপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে বগুড়া কৃষক সম্মেলনে তিনি সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭৬ সালে ঢাকার রায়পুরা কৃষক সমিতির সম্মেলনে কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সংগঠনের সভাপতি হওয়ার অল্প কিছুদিন পর তিনি গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৭ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।[৭০]

হাতেম আলী খান জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি জমিদার বিদ্বেষী ছিলেন এবং কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর জীবন ছিল সুদীর্ঘ সংগ্রামে স্পন্দিত এবং

সংগ্রামী জীবনে তিনি তেরোবার কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি ছিলেন সাদামাটা মানুষ এবং মতাদর্শের দৃঢ়তায় ছিলেন অবিচল। হাতেম আলী খান ছিলেন এক অতুলনীয় রহস্যজনক মানুষ কারণ পরিবার ও ঘনিষ্ঠ জনেরাও তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন না। তিনি প্রচার বিমূখ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিল বঞ্চিত জনগণ, খেটে খাওয়া ও সর্বহারার দল। হাতেম আলী খানের প্রত্যয় ছিল শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার এবং তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন শোষণের সকল উৎসকে। হাতেম আলী খান ছিলেন মনুষ্যত্ব ও মহৎ মূল্যবোধের প্রতীক, রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য এক ব্যক্তিত্ব আজকের দিনে যা সত্যিই বিস্ময়কর।

প্রান্তটীকা

১. বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, মওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১-২

২. সাক্ষাৎকার, (হাতেম আলী খানের নাতি জাহিদ খান) ,তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫,টাঙ্গাইল ।

৩. জুলফিকার হায়দার, *সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা কৃষকনেতা হাতেম আলী খান*, প্রাঙ্গণ প্রকাশন, ময়মনসিংহ, ২০১৩, পৃ. ৫-৬

৪. সাক্ষাৎকার, (হাতেম আলী খানের নাতি জাহিদ খান) ,তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৫. যে নিয়মতান্ত্রিক পথে বাঙলায় ব্রিটিশদের বির‍ুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন চলছিল সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সেদিন অনেক যুবককেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই বিক্ষুব্ধ যুবদল শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জন নীতিতে সমর্থন করবেন না, তারা মূলত সেদিন মনে প্রাণে চেয়েছিল ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন। এই ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তারা র‍ুশ বিপ-বের মত সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তাগিদ অনুভব করেছিল এবং গড়ে তুলেছিল ‘অনুশীলন সমিতি’। (হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৯, সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৬)

৬. স্বদেশী আন্দোলনের তথা বিপ-বের আদর্শ প্রচার করার জন্য *যুগান্তর* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৭ সালে এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাতহাজার। (হোসেন উদ্দীন হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯.)

৭. মুনতাসীর মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৮-৭৯, Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement*, New Delhi, 1973, P. 9-12

৮. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*,অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৫

৯. *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৬

১০.জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

১১.বিভুরঞ্জন সরকার(সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

১২.“নাইট” ব্রিটিশ সরকারের একটি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এ উপাধি লাভ করেন। (মুহাম্মদ ইনাম উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-৪১)

১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৮-৩০।

১৪. সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৯০-৯৫

১৫. *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৯১-৯২

১৬. বিভুরঞ্জন সরকার(সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৭

১৭. সূর্যসেন বিপ-বী যুগান্তর দলের চট্টগ্রাম শাখার প্রধান এবং ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান সংগঠক। ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে পড়া অবস্থায় বিপ-বী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। (মোহাম্মদ শাহ,*বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১)*

সত্যেন সেন (১৯০৭- ১৯৮১) প্রগতি ও শিল্পী সংঘ উদীচী সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তী বিপ-বী, সাহিত্যিক, শ্রমিক সংগঠক। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যুক্ত হন বিপ-বী দল যুগান্তরের সাথে। আজীবন এ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। (তপন বাগচী, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬১-৬২)* ।

প্রখ্যাত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার কুমার ভোগ গ্রামে। বিংশ শতাব্দীর শুর“ থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিক্রমপুর স্থান ছিল অনন্য। ১৯২১ সালে জিতেন ঘোষ অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে দেড় বছর সশ্রম কারাদ’ প্রদান করে। কংগ্রেস গণআন্দোলনের প্রথম যুগে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী । কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক দিক নির্ণয়ের পরিপূর্ণতা পাননি। সর্বশেষ জনগণের একমাত্র শোষণ মুক্তির পথ মার্কসবাদ, লেনিনবাদের তত্ত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর

রাজনৈতিক পরিপূর্ণতা আসে। (শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ. ১০৮-১০৯)

আব্দুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩) টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান, স্থানীয় বোর্ডের সদস্য এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করেন। কংগ্রেসের সমর্থক হলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বিভক্তিকরণ হলে জীবনের বাকী সময় নির্দলীয় উদারপন্থী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। (মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *বাংলা পিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩)*

১৮. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮ জুলফিকার হায়দার , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৮

১৯. লালা লাজপত রায় সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ নেতা, যিনি কংগ্রেসী আন্দোলনে ও নেতৃবৃন্দের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে লালা লাজপত রায়ই সর্বপ্রথম সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শ জনসভায় প্রচার করেন। ভারতে ইংরেজ সরকারের বির ুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। অদম্য সাহস ও নির্ভীকতার জন্য তাকে 'শের-ই পাঞ্জাব' (পাঞ্জাবের সিংহ) বলা হত। (অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪-৪২৫)

২০. সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৪, অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬-৭৮,

২১. বলশেভিক ইংরেজি (Bolsheviks) মার্কসবাদী রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির একটি উপদল যা ১৯০৩ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস এর অপর উপদল মেনশেভিক থেকে আলাদা হয়ে যায়। বলশেভিকরা একটি মাত্র গুর ুত্বপূর্ণ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাই তাদের এই নাম। পরবর্তীতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

ভ্লাদিমির লেনিন এবং আলেকজান্ডার বগদানভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এই দলটি। (অতুল চন্দ্র রায়, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস*, (অষ্টম সংস্করণ), ১৯৮৯ কলিকাতা, পৃ. ১৭০-১৭১

অক্টোবর বিপ-ব হল রাশিয়ায় সংঘটিত একটি রাজনৈতিক বিপ-ব, এর আর এক নাম সমাজতান্ত্রিক বিপ-ব। ১৯১৭ সালের র"শ বিপ-বের একটি অংশ বিশেষ। শ্রমিক শ্রেণির এই বিপ-বের বিজয় রাশিয়ার জনগণকে পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিল । (সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৪)

২২. ভ-াদিমির ইলিচ লেনিনের জন্ম ১৮৭০ সালে। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক, সমাজতান্ত্রিক বিপ-বে উজ্জীবিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। (*https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin)*

পৃথিবীর সব দেশেই কমিউনিস্ট দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কমিউনিস্ট দল মূলত কমিউনিজম ভাবধারার একটি রাজনৈতিক দল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। যার মূল ভিত্তি হলো, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কমিউনিস্ট পার্টিকে বলা হয় শ্রমিক শ্রেণির অগ্রবাহিনী, তার সংগঠক ও পরিচালক। (এম আর চৌধুরী, আবশ্যকীয় শব্দ পরিচয়, ঢাকা,২০১২, পৃ. ৪৯)।

মার্কসবাদ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতবাদ। মার্কসবাদ সামাজিক পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সম্পর্ককে কেন্দ্রীভূত করে সমাজ বিশে-ষণে ব্যবহারের প্রক্রিয়া ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসবাদী প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক পরিবর্তনে শ্রেণি সংগ্রামের ভূমিকা এবং পুঁজিবাদ বিকাশের সমালোচনা ও বিশে-ষণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। (*https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin)*

২৩. মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । তিনি ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম বিপ-বী বলে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।(*দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৫, পৃ. ৮।)

২৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩

২৫. মুজাফফ্‌র আহমেদ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার একজন অন্যতম নেতা। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের সন্দ্বীপ দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৭।)

২৬. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৬২, জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৩

২৭. সাক্ষাৎকার , জুলফিকার খান, (হাতেম আলী খানের ভাতিজা), ০৫ এপ্রিল, ২০১৫, টাঙ্গাইল ।

২৮. ইমতিয়াজ আহমেদ, *বাংলা রাজনীতিতে উদার পন্থী মুসলিম রাজনীতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫)*, অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, ২০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১২

২৯. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩,ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত,*প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫৪৬-৪৭

৩০. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৬, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

৩২. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

৩৩. সাক্ষাৎকার, ১৭.০৪.২০১৫, তাহমিনা খান (হাতেমআলী খানের নাতনী), টাঙ্গাইল ।

৩৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৫, ইয়াসমিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮।

৩৫. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩৬-৪০, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৬ হেমচন্দ্র চৌধুরী (১৮৩৩-১৯১৫) টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় হেমনগরের রাজবাড়ীর রাজা ছিলেন। তাঁর নামেই এলাকাটির নামকরন হয়। হেমনগর বিখ্যাত আম্বাবীয়ার জমিদার বংশের কালীচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র হেমচন্দ্র চৌধুরী। তিনি পুখুরিয়া পরগণার একআনি অংশের জমিদার ছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তবে প্রজা

নিপীড়নের ক্ষেত্রেও তার কুখ্যাতি ছিল । (খান মাহবুব, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯)*

৩৬. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৫

৩৭. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান , (হাতেম আলী খানের নাতি), ১৯.০৮.২০১৫ , টাঙ্গাইল ।

৩৮. সাক্ষাৎকার, জুলফিকার খান, (হাতেম আলী খানের ভাতিজা), ০৫এপ্রিল, ২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৩৯. বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আবুল মনসুর আহমদসহ অন্যান্য কংগ্রেসীরা কংগ্রেস বর্জন করে মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন। স্যার আব্দুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ এটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এখানেই সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হন। (আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫)

৪০. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫,

৪২. কমরেড মুজাফফ্‌র আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) চট্টগ্রাম সন্দীপে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে চলমান খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২০ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রদেশের খেলাফত কমিটির সদস্য হন। তারপর ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাসখন্দে। এ সময় কমরেড মুজফফর আহমদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সাথে সাথে তিনি এ আন্দোলনের পুরধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। (*https://bn.wikipedia.org/s/1biy*)।

৪৩. মনি সিংহ (১৯০১-১৯৯০) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কৃষক শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র জীবন থেকে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর মনি সিংহ পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি

পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। (সালেহ আতহার খান, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬)।

৪৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ* ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২৫

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৪৭. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) ১৫.০২.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৪৮. মনসুর হাবিবুল-াহ (১৯১৭-১৯৯৬) বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের একজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মী এবং পরবর্তীকালের বামপন্থী নেতা। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মনসুর হাবিবুল্লাহ বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন। (সৈয়দ আলী ইমাম,বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২১-২২২)

৪৯. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৫০. তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে শুর— হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। বর্গা বা ভাগ চাষীরা এতে অংশ নেয়। মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী, একভাগ জমির মালিক, এই দাবী থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। তবে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনের প্রধান নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র। (সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৬-২৮৭)

৫১. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭

৫২. সাক্ষাৎকার, জুলফিকার খান, (হাতেম আলী খানের ভাতিজা), ০৫.০৪.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৫৩. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) ১৫.০২.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৫৪. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৫৫. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) *স্মারক সংকলন*, *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭, মাহমুদ কামাল, *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৮৯-৯০

৫৬. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান, (হাতেম আলী খানের নাতি), ১৯.০৮.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৫৭. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭-২৩০ ,আবু আল সাইদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫৪

৫৮. মাহমুদ কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১। খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিত*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৮, তাহমিনা খান, *পূর্ব বাংলায় রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ (১৯৪৭–১৯৫৭)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৮

৫৯. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২২

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন। টাঙ্গাইল জেলার কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মূল আলোচ্যসূচী ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। এখানেই আদর্শিক কারণে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১১)।

৬০. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) *স্মারক সংকলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৯, তাহমিনা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০। দরজি আব্দুল ওয়াহাব, *ময়মনসিংহের চরিতাভিধান* , ময়মনসিংহ, ১৯৮৯ ,পৃ. ৫৩২-৫৩৪

৬১. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১১

৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ , পৃ. ৮

৬৩. ইস্কান্দার আলি মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯৫৮ সালে তিনি সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক আইন জারীর বিশ দিন পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। পরবর্তীতে ইস্কান্দার মির্জা লন্ডনে নির্বাসিত হন। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৩-২৮৪)

৬৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৬৫. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) *স্মারক সংকলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৮

৬৬. ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭-১৮

৬৭. আমজাদ হোসেন ১৯৪২ সালে যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয়কর্মী হিসেবে ষাটের দশকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে কৃষক আন্দোলনে যোগদান ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। (আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, লেখক পরিচিতি অংশ।)

আব্দুল হক (১৯২০-১৯৯৬) যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাম রাজনীতির এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড আবদুল হক দীর্ঘ কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের কৃষক শ্রমিকদের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। *(http://gorbitobangali.com/pi/37/abdul-haque-comrades)*

৬৮. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) ১৫.০২.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৬৯. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান, (হাতেম আলী খানের নাতি), ১৯.০৮.২০১৫, টাঙ্গাইল ।

৭০. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) *স্মারক গ্রন্থ* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৬

মৌলবী তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩)

ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ দীর্ঘ অধ্যায় পাড়ি দিয়েছে। এ পর্যায়ের একজন অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তমিজউদ্দিন খান। বিশ শতকের সূচনা থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান কাল (১৯৪৭) পর্যন্ত আন্দোলন, সংগ্রাম এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য ভূমিকা ছিল। এমনকি পাকিস্ড়ান রাষ্ট্রের উদ্ভবকালে নবগঠিত রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি রচনায় তার অবদান স্মরণীয়। স্বদেশী, খেলাফত-অসহযোগ, স্বরাজ, পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর দীপ্ত পদচারণা লক্ষ্য করা যায়।[১] আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় কখনো প্রাদেশিক কখনো কেন্দ্রিয় শাসনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তমিজউদ্দিন খানের অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে। তাই পূর্ববাংলার রাজনীতিতে একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তমিজউদ্দিন খানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। মৌলবী তমিজউদ্দিন খানের কর্মমুখর জীবনকাল এমন এক সময়ে পরিব্যাপ্ত যখন ভারতের মুসলমানগণ নিজেদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলো এবং শতাব্দীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তা অর্জনে নিয়োজিত ছিল।[২] তমিজউদ্দিন খান ১৮৮৯ সালে ফরিদপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত খানখানাপুর গ্রামে পশ্চাৎপদ এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ শরিয়তুল-ার জমি সাতবার পদ্মার ভাঙ্গনে নিপতিত হওয়ায় পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পিতা আমির উদ্দিন খানের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরিবারটি টিকে থাকে।[৩]

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। থানা কিংবা মহকুমায় একজনও উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিল না। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ছিল কম। স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্র খুবই কম ছিল। তাছাড়া ইংরেজি ভাষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহও ছিল না।[৪] এরূপ পরিস্থিতিতে তমিজউদ্দিন খানের হাতেখড়ি তাঁর বাবার কাছে। এরপর তিনি ঝপু খানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৫] তবে

তার বাবার দরিদ্রের কারণে লেখাপড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এই বিদ্যালয়ে পড়ালেখা ভালো না হওয়ায় তিনি খানখানাপুর মিডল ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয় থেকে ১৯০৬ সালে ইংরেজিতে লেটার মার্কস নিয়ে এন্ট্রান্স পাস করেন। এরপর তার বাবা লেখাপড়া বন্ধ করার কথা বললে নিজ ইচ্ছা ও শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকায় তমিজউদ্দিন খান কুচবিহার কলেজে ভর্তি হন এবং আই এ পাশ করেন। অতঃপর কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯১১ সালে ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজিতে অনার্সসহ বি এ পাস করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম এ ও আইন কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। তমিজউদ্দিন খান তৎকালীন ফরিদপুর জেলার প্রথম মুসলিম অনার্স গ্রাজুয়েট ছিলেন। ছেলের লেখাপড়ার খরচ বহন করা পিতার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ায় ছেলের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তমিজউদ্দিন খান রাজবাড়ি শহরের নিকটবর্তী চরনারায়নপুর গ্রামের বিত্তবান ও হোমিও চিকিৎসক বশির উদ্দিন সাহেবের মেয়ে রাহতুন নেসার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সমর্থনের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।[৬]

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এক অতি গুর্ত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি একদিকে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক গুর্তর বোঝা লাঘবে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গের জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও শান্ড়ি-শৃঙ্খলা পুনর্বহালে অবদান রেখেছে এবং এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিরোধিতার দর্ণ সৃষ্ট আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে ও ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করেছে। ১৮৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রশাসনিক যোগ্যতার প্রতীক লর্ড কার্জন ভারতের ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি বা ভাইসরয়ের পদে সমাসীন হন। শীঘ্রই তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক সংস্কারে হাত দেন কিন্তু প্রায় সবগুলোই উঠতি রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সবচাইতে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তাঁর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা তাঁর পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা নয়, সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি বলতে গেলে বাংলা প্রদেশ গঠনের পর থেকেই সরকারিভাবে বাংলা বিভক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রস্ড়াব ও পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়।[৭] লর্ড কার্জনকে

চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ডে় পৌঁছাতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল তিনজন ব্রিটিশ আমলা-বাংলার ছোট লাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, আসামের চিফ কমিশনার (পরে পূর্ব বাংলা ও আসামের ছোট লাট) ব্যামফাইল্ড ফুলার এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হার্বাট রিজলে। তবে গোড়া থেকেই প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[৮] বঙ্গ বিভক্তির আগে বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল যা আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল। একজন গভর্নরের পক্ষে এ বিশাল প্রদেশের শাসন পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া পূর্ববাংলা ভারতবর্ষের একটি পশ্চাৎপদ প্রদেশে পরিণত হয়। স্বাভাবিক কারণে পূর্ববাংলা অবহেলিত থেকে যায়। অর্থনৈতিক অবস্থাও খুবই নাজুক ছিল কারণ মিল-কলকারখানা, বাণিজ্য ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক আবার শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে পূর্ববাংলার মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে ছিল। লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিজে উপলব্ধি করেন নতুন প্রদেশ গঠিত হলে প্রশাসনিক সংকট দূর হবে এবং পূর্ববাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক উন্নতি হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি এগিয়ে যান। লর্ড কার্জন বিষয়টি গুর—ত্বসহকারে বিবেচনা করেন এবং ১৯০২ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাথে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। এ নির্দেশকে কার্যকর করতে ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বাট রিজলে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ড় করার প্রস্ড়াব পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি 'Risley Note' বা রিজলে পত্র নামে পরিচিত। কেন্দ্রিয় সরকার সীমানা রদবদলের পর তা অনুমোদন করে। এ পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও অসন্ডে়াষ দেখা দেয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বির—দ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি আসতে থাকে। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় এই পরিকল্পনার বির—দ্ধে জোর প্রতিবাদ জানায়। এমনকি মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এর প্রতিবাদ আসে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্র—য়ারি মাসে পূর্ববাংলা সফর কালে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামে বক্তৃতা দেন এবং এখানে তিনি প্রস্ড়াবিত পুনর্বিন্যাসে আরো কিছু এলাকা যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন। যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর একটি আইন পরিষদ

ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি মুসলমানদের পক্ষে টানার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে বক্তৃতায় বলেন "পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনগণ প্রাচীন সুলতান ও সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য থেকে বঞ্চিত; সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।" ৯ গভর্নর নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা করার এবং এ অঞ্চলের মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিরও প্রস্তাব দেন। এরপর কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ৯ই জুন ভারত সচিব ব্রডারিক এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তা ১৯০৫ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ নিয়ে (দার্জিলিং বাদ দিয়ে কিন্তু মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরা জেলা অন্তর্ভুক্ত করে) 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয় এবং রাজধানী করা হয় ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী কলকাতা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন হিন্দু সম্প্রদায় শোক দিবস পালন, অনশন, সব ধরনের কাজ বর্জন, খালি পায়ে হেটে গঙ্গাস্নানে যায়। বাংলার হিন্দুরা প্রচার করতে থাকে যে বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং এটি দেবী কালীর প্রতি অপমানের শামিল। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা 'বন্দে মাতরম' কে তাদের জাতীয় স্লোগান ও জাতীয় সংগীতে রূপ দেয়[১০]। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। কালকাতার অধিকাংশ পত্র পত্রিকার মালিক ছিলেন মধ্য শ্রেণীর বা জমিদার। এ কারণে হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা পালন এবং ব্রিটিশ সরকারকে রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পরিচালনায় *বেঙ্গলি*, কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদিত *সঞ্জীবনী*, ভুপেন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত *যুগান্তর*, মতিলাল ঘোষের *অমৃত বাজার* ইত্যাদি পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখির মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে।[১১] ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নিসংযোগ ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ৫ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী

আন্দোলনে রূপ নেয়।[১২] উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সকলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে নমঃশুদ্ররা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়।[১৩] কিছু ব্যতিক্রমবাদে পূর্ববাংলার মুসলমানদের সিংহভাগ ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। মুসলমানদের মধ্যে যারা বঙ্গ বিভক্তিকে স্বাগত জানায় তাদের মধ্যে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল-াহ বাহাদুর অন্যতম। ১৯০৫ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের বির‍ুদ্ধে যখন প্রবল আন্দোলন শুর‍ু হয় তখন ঢাকার নবাব সলিমুল-াহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করেন।[১৪] ১৯০৬ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় ' নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের রাজনৈতিক দল। মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৯০৫ সালেই এক ঘোষণাপত্রে মুসলমানদের কাছে আবেদন জানান যে, তারা যেন স্বদেশী বা অন্য নামে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় যোগ না দেয়। এভাবে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।[১৫] বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও দ্বিমত পোষণ করেন। যেমন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে আবার মুনশী মেহের‍ুল-াহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে।[১৬] বঙ্গভঙ্গের বিরোধী নেতাদের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮২৭-১৯১৭), আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩), আবুল কাশেম (১৮৭২-১৯৩০), আবুল হোসেন, দ্বীন মুহাম্মদ, গোলাম মওলা, সৈয়দ খাজা আলাউদ্দিন প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখেন।[১৭]

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠতে থাকে। ফরিদপুর অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অত্র অঞ্চলের বিখ্যাত নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার।[১৮] তিনি এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীই ছিলেন সর্বময় নেতা। নবাব সলিমুল-াহ মুসলমানদের সর্বজন স্বীকৃত নেতা ছিলেন তাই তিনি সার্বক্ষণিকভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে তাঁর বাণী পৌঁছাতে পারেনি। তেমনি করে ফরিদপুর অঞ্চলেও মুসলমানদের প্রতি নবাব সলিমুল-াহর বাণী পৌঁছাতে পারেনি। তাই অম্বিকাচরণের মতো নেতাদের বক্তৃতা শুনে অত্র অঞ্চলের সকলের মত তমিজউদ্দিন খান কিশোর বয়সে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে মনোযোগী হয়। এ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে তিনি পাচুরিয়ায় বিপিন পাল ও তাঁর সঙ্গী ডাঃ গফুরের বক্তৃতা শুনতে যান।[১৯] সেখানে তমিজউদ্দিন খানের শিক্ষক তাঁকে মুসলমানদের পক্ষ

থেকে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনের পক্ষে প্রস্ড়াবক হওয়ার প্রস্ড়াব করলে তমিজউদ্দিন খান গৃহীত সিদ্ধান্ড়কে স্বাগত জানিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, "মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমি এ প্রস্ড়াব সমর্থন করছি" 'I support the resolution on behalf of the Muslim community' Tamijuddin Khan, *The Test of Time : My Life and Days,* Page.29) এই ঘোষণার পর সকলে করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তমিজউদ্দিন খান এ সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি মূলত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এ আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ কাপড় ও লবণ বর্জনে ছাত্র ও জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। "বন্দে মাতরম" ধ্বনি সহকারে বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে দলবেধে স্ে-াগান দেওয়া তাঁর নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাড়ায়। এসময় তিনি স্বদেশী কার্য করার পাশাপাশি ছোট বড় সম্মেলনে যোগদান করতেন। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এবং তাঁর শ্বশুর বশিরউদ্দিন যোগদান করেন। এই সম্মেলনে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আবদুল করিম সভাপতিত্ব করেন। এ কে ফজলুল হক ও চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন প্রধান বক্তা। সম্মেলনে উপস্থিত বক্তাদের বক্তৃতা তমিজউদ্দিন খানের জীবনে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। এভাবেই বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তমিজউদ্দিন খান তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুর করেন।[২০] বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট স্বদেশী, বয়কট আন্দোলন তীব্র সন্ত্রাসবাদী রূপ নিলে ব্রিটিশ সরকার নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়া হিন্দু- মুসলিম দাঙ্গা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। স্বদেশী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে পরিণত হলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিলি- দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ও কলকাতা থেকে দিল-ীতে রাজধানী স্থানান্ড়রের কথা ঘোষণা করেন।[২১] ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ব্রিটিশ নীতি তথা বিদ্যমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী তমিজউদ্দিন খানকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। কিছু একটা করার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার পর কংগ্রেস আর ব্রিটিশনীতি দুটোর ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের স্বার্থে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব এটা তমিজউদ্দিন খান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[২২]

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তমিজউদ্দিন খান প্রথমে কলকাতা ও পরে ফরিদপুর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে ফরিদপুর বার-এ যোগ দেন। আইন ব্যবসায় যোগদান করার পর ফরিদপুর পৌরসভার কমিশনার এবং পরে ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন।[২৩] তিনি এসময় ফরিদপুর প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন ছিলেন সভাপতি এবং তমিজউদ্দিন খান সংবর্ধনা কমিটির সেক্রেটারি।[২৪] তিনি পরিবারকে অন্য বাসায় রেখে তাঁর বাসায় জেলা প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এম এন রায়। শত শত নমঃশুদ্র , প্রজা এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন । তাছাড়া কলকাতা থেকে বিখ্যাত লেখক পাঁচকড়ি বাড়ুজ্যে সম্মেলনে যোগদান করেন।[২৫] আবহাওয়া খারাপ থাকায় সম্মেলনে কিছু ত্রুটি থাকলেও সম্মেলন যথা সময়ে সম্পন্ন হয়। তমিজউদ্দিন খানের রাজনৈতিক জীবনে প্রথম এই বিরাট প্রজা সম্মেলন সংগঠন করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।[২৬] ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে এতে মুসলমানদের স্বার্থ অবহেলিত হতে থাকে। মুসলমানদের অধিকাংশ নেতা এতে যোগ দেননি। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলা ডেপুটেশনে যাবার জন্য এবং লর্ড মিন্টোর কাছে পেশকৃত স্মারক লিপি পর্যালোচনার জন্য লক্ষ্ণৌতে মিলিত হলে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব লাভ করে। ঐ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের পরবর্তী বার্ষিক সভায় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে।[২৭] ঢাকায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলন শেষে নেতৃবৃন্দ ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে একটি রাজনৈতিক সভায় মিলিত হন। নবাব ভিকার-উল-মুলক ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।[২৮] তাঁর আলোচনা শেষে ঢাকার নবাব সলিমুল-াহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খাঁনের সমর্থনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ

মুসলিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।[২৯] তমিজউদ্দিন খান ফরিদপুর বারে থাকা পর্যন্ড় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেয়ার পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। ১৯১৫ সালে মুসলিম লীগের সেক্রেটারির উদ্যোগে বার্ষিক বিশ টাকা চাঁদা দিয়ে মুসলিম লীগের সদস্যপদ লাভ করেন। ফরিদপুরে তিনিই প্রথম এই সদস্যপদ লাভ করেন। বহুবছর নামমাত্র সদস্য ছিলেন কারণ তখন তার বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করার মত আর্থিক সামর্থ ছিল না।[৩০] এসময় 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া' নামে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন বাংলার ও ভারতের অনেক সদর ও মফস্বল শহরে স্থাপিত হয়। কলকাতার 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া' এ সংগঠনগুলির প্রেরণার উৎস ছিল। ফরিদপুরের 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া'র প্রধান ছিলেন নবাব সলিমুল-াহ এবং সেক্রেটারি খান বাহাদুর আবদুল গনি।[৩২] 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া'য় যোগ দেওয়ার কিছু দিন পর তমিজউদ্দিন খান এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করেন এবং শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৩৩]

খেলাফত আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯) বিশ্ব দুটি যুদ্ধমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, মিত্র শক্তির নেতৃত্ব দেয় গ্রেট-ব্রিটেন এবং জার্মানি নেতৃত্ব দেয় অক্ষ শক্তির। স্বাভাবিক ভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসী হওয়ায় ভারতবাসী ব্রিটেনের পক্ষে থাকবে ইংরেজরা তা আশা করছিল। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্ক এবং তুর্কি সুলতান জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমানরা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ভারতের মুসলমানরা তুরস্ককে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক এবং তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মনে করতো। এভাবে দেখা যায় যে, ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত হলেও ধর্মীয় দিক দিয়ে তুরস্কের অনুগত। এ পরিস্থিতিতে ভারতসহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের পক্ষে টানার জন্য ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের শুর"তেই ঘোষণা দেন যে তাদের তুরস্কের বির"দ্ধে যুদ্ধ, খেলাফতের বির"দ্ধে নয়। ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য ব্রিটেন প্রতিশ্র"তি দেয় যে, যুদ্ধকালে ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর কোন ক্ষতি করবে না এবং যুদ্ধ শেষে তুরস্ককে বিভক্ত করা হবে না। অথচ যুদ্ধের

পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মিত্র পক্ষ তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করে যা ভারতের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। তাই সুলতান বা খলিফাকে তাঁর হৃতমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় মুসলমানরা এ সময় যে আন্দোলন শুরু করেন তা খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রণীত হলে এ আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই এটি প্রত্যাখ্যান করে।[৩৪] যুদ্ধকালীন ভারতবাসীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি খুব কমই এ আইনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনি অভিযোগে উভয় সম্প্রদায় পরবর্তী নির্বাচন বর্জন করে। অধিকন্তু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করতে সরকারের দমন নীতি আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯১৯ সালে প্রণীত 'রাওলাট আইনে'র আওতায় বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেয়া হয়। এ আইনের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদ জানায়। এ আইন প্রয়োগ করে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ভারতবাসীকে আরো বিক্ষুব্ধ করে। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সত্যাগ্রহ শুরু করলে মুসলমানদের এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে তিনি খেলাফত আন্দোলনে সমর্থন ঘোষণা করেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে।[৩৫] বাংলায় খেলাফত আন্দোলন একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয় এবং হিন্দু-মুসলমানরা এতে ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা যেমন রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরে খেলাফত কমিটি গঠনের সাথে সাথে আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। এ সময় তমিজউদ্দিন খান মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে রাজবাড়ি, ফরিদপুরে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ফরিদপুরে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিলেন পীর বাদশাহ মিঞা।[৩৬] তমিজউদ্দিন খানের কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ফরিদপুর জেলায় আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। কারণ সংশোধিত 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া'র সেক্রেটারি আর নব্য মুসলমান উকিল হিসেবে জনগণের বড় অংশ তাকে বিশ্বাস করত। এ সময়েই তিনি ফরিদপুর জেলা খেলাফত কমিটির সহ-সভাপতি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। আন্দোলনের সমর্থনে তমিজউদ্দিন খান চরকা কিনে চরকা কাটা শুরু করেন কারণ প্রত্যেক

অসহযোগকর্মীর চরকা কাটা বাধ্যতামূলক ছিল।[৩৭] খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে গিয়ে তমিজউদ্দিন খান আইন পেশা ছেড়ে খেলাফত কংগ্রেস নেতা প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজে (কলকাতা) কিছুদিন শিক্ষকতা করেন । সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ও কেন্দ্রিয় খেলাফত কমিটির সভা ১৯২১ সালের ২৮ শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। তমিজউদ্দিন খান এ সভায় যোগদান করেন। সভায় সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় যে, ইংল্যান্ডের যুবরাজের আসন্ন ভারত সফরকে বয়কট করা হবে, বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে বয়কটকে জোরদার করতে হবে। এ সকল কর্মকান্ড পরিচালনার সময় তিনি মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। [৩৮] আন্দোলন চলাকালে তিনি ফরিদপুরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনী সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়। অপরাধ সংশোধনী আইনের ১৭(২) ধারায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ঐ বাহিনী গঠনের দায়ে তাঁকে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তমিজউদ্দিন খানকে চৌদ্দমাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তিনি ফরিদপুর ও ঢাকা জেলখানায় কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনারও শিকার হন। কারা আইন অনুসারে সাজায় রেয়াতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি লাভ করেন এবং পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। [৩৯]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন প্রথম দিকে অহিংস হলেও ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানায় ৩০০০ ব্যক্তি আক্রমন চালিয়ে একজন ইন্সপেক্টর ও ২৫ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। এরপর খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এতই ভয়াবহরূপ লাভ করে যে, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বহু চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। ফলে মহাত্মা গান্ধী এ আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। স্বাভাবিকভাবে খেলাফত আন্দোলন হুমকির সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে ১৯২২ সালের নভেম্বরে তুরস্কের জাতীয় পরিষদে সুলতান খলিফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে এবং তাঁর স্থলে আবুল মজীদকে সুলতান না করে তাঁকে পার্থিব ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবিহীন খলিফা বলে ঘোষণা করে। এ সময় ১৯২৩ সালে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, ১৯২৪ সালে খলিফা পদ তুলে দেয়ার পর উপমহাদেশের

খেলাফতপন্থীরা হতচকিত হয়। ফলে ভারতে খেলাফত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আর থাকেনি এবং ক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়। [৪০] মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে একদল ত্যাগী ও বিপ-বী নেতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচীকে সামনে রেখে একটি বিকল্প প-াটফর্ম গঠনের চেষ্টা করে।[৪১] গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাসসহ অনেক নেতাই তখন কারার"দ্ধ থাকায় রাজনীতিতে ঘোরতর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। গান্ধীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহের" প্রমুখ নেতাদের মতবিরোধ তখন থেকেই চরম রূপ নেয় এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মত ও পথ নিয়ে দ্বিধা বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২২ সালের মে মাসে কলকাতা কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী পরিষদে প্রবেশের বিপক্ষে অবস্থান নেন। অন্যদিকে আলীপুর জেলে বন্দি থাকাকালেই চিত্তরঞ্জন দাস ব্যবস্থাপক পরিষদে যোগদান করে সরকারের বির"দ্ধে অসহযোগ কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনায় আইন সভা, স্বশাসিত সংস্থার নির্বাচন বয়কট না করে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রম অচল করে দেয়ার মাধ্যমে স্বরাজ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্ড়াব ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের ৭-৯ জুন কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মতভেদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ বিরোধের নিস্পত্তি হয় ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে। এর সভাপতি ছিলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস। সভাপতির ভাষণে তিনি আইন সভায় প্রবেশ নীতিকে গ্রহণের আবেদন জানান। পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্ড়ফা দেন এবং নিজের কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য গয়ায় ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'কংগ্রেস খেলাফত স্বরাজ দল' যা সংক্ষেপে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন দাস এর সভাপতি এবং মতিলাল নেহের" সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৪২] তমিজউদ্দিন খান ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বরাজ পার্টির দুঃসময়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মুসলিম প্রার্থী হিসেবে স্বরাজ পার্টির স্বপক্ষে নির্বাচনে যোগদান করার জন্য তমিজউদ্দিন খানকে মনোনীত করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাবার পর হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। যেসব মুসলিম কংগ্রেস এবং খেলাফত

আন্দোলনে ছিলেন তারা স্বরাজ পার্টির প্রার্থীকে হিন্দু ভেবে ভোট দেননি। গোটা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বেড়ে চলছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা আদায় করার আশা শূণ্যে পরিণত হয়। কংগ্রেস সহনশীল হলেও অনেক সদস্য জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে তমিজউদ্দিন খান কংগ্রসের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন। তবে পৌরসভা নির্বাচনের সময় খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। তখন কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় পৃথক নির্বাচন হতো এবং স্থানীয় পৌরসভার নির্বাচনগুলো যৌথভাবে করা হতো। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য তমিজউদ্দিন খান হিন্দু প্রধান নির্বাচনী এলাকা থেকে ফরিদপুর পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থীতা করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু হলেও যোগ্যতায় ভোট পাওয়ার যোগ্য ছিল না। এরপর ১৯২৫ সালে তমিজউদ্দিন খান কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

কংগ্রেস ত্যাগ করার পর তমিজউদ্দিন খান 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া'র সেক্রেটারি হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে পুণর্জাগরণ করেন। এ সময় তিনি মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ছিলেন। এরপর তিনি আবার আইন ব্যবসায় ফিরে যান। ১৯২৬ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ফরিদপুর জেলা দুটি কনস্টিটিউশন ফরিদপুর সদর ও গোয়ালন্দ নিয়ে একটি, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ নিয়ে অন্যটি ছিল। তখন স্বরাজ পার্টি ছাড়া নির্বাচন করার জন্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত দল ছিল না, বেশির ভাগ প্রার্থী ছিলেন স্বতন্ত্র। নব্বইভাগ মানুষ কৃষক হওয়ায় তারা জমিদার বিরোধী ছিলো এবং জমিদার বিরোধী আন্দোলনে তমিজউদ্দিন খান সবসময় কৃষকদের পাশে থাকায় তাঁর সমর্থন বেড়ে যায়। তাছাড়া খেলাফত আন্দোলনে কারাবাস করায় তাঁর সুনাম ছিল। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ প্রভাবশালী জমিদার হওয়ায় এবং হিন্দু প্রভাবিত কংগ্রেসের সদস্য থাকায় অধিকাংশ প্রজা তমিজউদ্দিনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। তাঁর অর্থ সংকট থাকায় অনেকে গোপনে নিজের টাকা খরচ করে নির্বাচনী প্রচার চালাতেন। পীর বাদশা মিঞা নির্বাচনে তমিজউদ্দিনকে সমর্থন প্রদান করেন। তবে দরিদ্রের বন্ধু নামে খ্যাত এ কে ফজলুল হক তমিজউদ্দিনের প্রতিপক্ষ লাল

মিঞাকে সমর্থন করেন। প্রজা সাধারণের ব্যাপক সমর্থনের ফলে স্বরাজ পার্টির প্রার্থী হিসেবে তমিজউদ্দিন খান বিপুল ভোটে জয়ী হন।[৪৩] লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে থাকাকালীন তমিজউদ্দিন খান প্রজাপার্টির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। তাছাড়া ভোট কমিশন ও শিক্ষা পরামর্শ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্যার আবদুর রহিম, আবদুল মোমেন, খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ মন্ত্রী ও কাউন্সিল সদস্যের সাথে কাজ করেন। এ সময় তমিজউদ্দিন খান পশ্চাৎদপদ মুসলমানদের জন্য ভোটাধিকার ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে সমর্থ হন। তিনি দরিদ্র কৃষকের জমি হস্তান্তরের অধিকার নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন ও ভূমি দখল আইন প্রণয়নে অবদান রাখেন। তমিজউদ্দিন খান প্রজাপার্টির পক্ষ থেকে আইন সভায় জোরালোভাবে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর এসকল কর্মকাণ্ডের ফলে জনগণের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বর্গা চাষীরা আশার আলো দেখতে পায়। তবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ীত্বকাল ছিল স্বল্পকালীন কারণ ১৯২৯ সালে ব্যবস্থাপক সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। (স্যার এ কে গজনবী ও শ্রীবি চক্রবর্তী) "গজ-চক্র" মন্ত্রীত্বের গণবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং একটি বৃহৎ প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ সময় একজন নব্য ও প্রগতিশীল মুসলিম নেতা হিসেবে তমিজউদ্দিন খান স্বীকৃতি পান এবং এসময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে। তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দেয়া হয় কিন্তু তিনি তা বর্জন করেন।[৪৪]

প্রাদেশিক আইন সভায় ১৯২৮ সালে বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য হয়। প্রজাস্বত্ব সংশোধনী প্রস্তাবেও প্রজাদেরকে জমির ওপর মালিকানা দেয়া হয় কিন্তু প্রিএম্পশনের অধিকার ও সালামি নামে পরিচিত হস্তান্তর ফিস বহাল রাখা হয়।[৪৫] এতে মুসলমানরা আপত্তি করে এবং এই ফিস প্রত্যাহারের দাবী জানায়। এই বিতর্কে সমস্ত হিন্দু, এমনকি স্বরাজ্য দলীয়রাও সালামি রাখার পক্ষে মত দেয় আর সমস্ত মুসলমান; তন্মধ্যে কিছু জমিদারও সালামির বিরোধিতা করে। উল্লেখ্য, বাংলায় শতকরা ৮০ জন কৃষক-প্রজা মুসলমান এবং অধিকাংশ জমিদার হিন্দু। এ বিভক্তিতে আইন সভায় শুধু হিন্দু-মুসলিম বিভক্ত হননি বরং পরিণতিতে ১৯২৯ সালে প্রজাপার্টি গঠিত হয়।[৪৬] অর্থাৎ ১৯২৯ সালে মওলানা

আকরম খাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন।[৪৭] স্যার আবদুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ সেক্রেটারি হন। এ কে ফজলুল হক, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, আবদুল করিম, মুজিবর রহমান সহ-সভাপতি, শামসুদ্দিন আহমেদ ও তমিজউদ্দিন খানকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এভাবে রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে বাংলার সমস্ড় হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমস্ড় মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা-সমিতিতে সংঘবদ্ধ হন।[৪৮] তবে ১৯৩০ সালের নির্বাচনে তমিজউদ্দিন খান গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর থেকে কংগ্রেসের মনোনয়নে জয়ী হন। এই নির্বাচনে তমিজউদ্দিন খানের নিজ এলাকা ফরিদপুর গোয়ালন্দের সিট তাঁর বন্ধু আলীমুজ্জামান চৌধুরীকে (১৮৯৯-১৯৩৬) ছেড়ে দেন ।[৪৯] কারণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকায় তমিজউদ্দিন খান যে কোন এলাকা থেকে বিজয়ী হতে পারতেন।[৫০]

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‌্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন।[৫১] এ ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে পৃথক নির্বাচন প্রথা, কেন্দ্রে ফেডারেল ও প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের মাধ্যমে এ প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ দেখতে পান। ১৯৩৪ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডনের স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে বোম্বাই ফিরে আসেন । নির্বাচনে মুসলমানদের আসন ছিল সংরক্ষিত, ভারতীয় মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হবার সুযোগ দেখে তিনি মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে এগিয়ে আসেন। ঢাকার নবাব হাবিবুল-াহর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 'সম্মিলিত মুসলিম দল' এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে 'মুসলিম মজলিশ' গঠিত হয়।[৫২] বাংলায় মুসলিম দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হাসান ইস্পাহানির আহ্বানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৬ সালের ১৭ই আগস্ট কলকাতায় আসেন। ১৯ শে আগস্ট এলবার্ট হলে জিন্নাহকে অভ্যর্থনা দেয়া হয় যে সভায় ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। ১৮ই আগস্ট 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি' 'সম্মিলিত

মুসলিম দল', ও মুসলিম লীগ একত্রিত হয়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০ শে আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করার পর কৃষক প্রজা সমিতির সাথে বিরোধ শুর‍ু হয়। তিনি 'সম্মিলিত মুসলিম দল'কে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকেন এবং ২১ শে আগস্ট 'কৃষক প্রজা সমিতি'র আদর্শ উদ্দেশ্য মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে 'প্রজা সমিতি'র সাথে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের বিরোধ শুর‍ু হয়।[৫৩] তবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপদেশ ও অনুরোধে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' মুসলিম লীগের অঙ্গীভূত হয়।[৫৪] ১৯৩৬ সালে তমিজউদ্দিন খান প্রথমে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৫৫] বিদ্যমান সকল মুসলিম দলগুলোর মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে 'কৃষক প্রজা পার্টি' স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ড় নেয়। জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর 'ইউনাইটেড মুসলিম লীগে'র সমন্বয়ে বাংলার মুসলিম লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় নির্বাচন ঘোষণা হলে সাংবিধানিক রাজনীতিতে যোগদানের জন্য দলগুলো মানসিকভাবে প্রস্তুত না হলেও নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টি এ প্রধান তিনটি দল প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বাংলার নির্বাচন মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরিণত হয়।[৫৬] ১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তমিজউদ্দিন খান ফরিদপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবিরকে পরাজিত করে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৫৭]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, ২৫০টি মোট আসনের মধ্যে ১১৭টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের মুসলিম লীগ ৩৫, প্রজাপার্টি ৩৬, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫ এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি আসন পায়। সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৬০টি, বাকি আসন পায় অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। যদিও বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য বরাদ্দকৃত ৪টি আসনসহ মুসলিম লীগ ৩৯টি আসন লাভ করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ড় প্রদেশে মুসলিম

লীগের চরম ভরাডুবি হয়। বর্ণ হিন্দুদের অধিকাংশের ভোট কংগ্রেস পায়। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চেয়ে কৃষক-প্রজা দল নির্বাচনে ভাল ফল করে। [৫৮]

বঙ্গীয় বিধান সভা নির্বাচনে মুসলিম আসনের ফলাফল, ১৯৩৭

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার
কৃষক প্রজাপার্টি	৩৬	৩০.৭৬
মুসলিম লীগ	৩৫	২৯.৯১
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	৪১	৩৫.০৪
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	৫	৪.২৭
মোট	১১৭	৯৯.৯৮

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়োজন হয়। বাংলার গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথমে কংগ্রেসের বাংলার সভাপতি শরৎ বসুকে আহবান জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কৃষক প্রজা পার্টির সংসদীয় দলের নেতা ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও কয়েকটি সংখ্যালঘু ও তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠীকে নিয়ে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন। [৫৯] বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে মন্ত্রীসভার আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল। প্রথম থেকেই মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে প্রজাস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার, প্রজাস্বত্ব অধিকার, শিক্ষানীতি, গ্রামীন ঋণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রবল ছিল। [৬০] তমিজউদ্দিন খান ১৯৩৭-১৯৪১ সাল পর্যন্ড় বঙ্গীয় সরকারের ফজলুল হক মন্ত্রীসভার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৬১] ১৯৩৭ সালের মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার কিছুদিন পরই মন্ত্রীসভার স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্য ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দান করেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, চাষী খাতক আইন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, মহাজনি আইন পাস ১৯৪০,

পলী সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি সাফল্য হক মন্ত্রীসভায় লক্ষ্য করা যায়। [৬২] ফজলুল হক মন্ত্রীসভার উলেখযোগ্য সাফল্য থাকলেও বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। নির্বাচনী কর্মসূচিতে বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রতিশ্র"তি দিলেও তাঁর মন্ত্রীসভার ১১ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন জমিদার। তাছাড়া মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের ফলে শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি বিদ্রোহী অংশের চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ফজলুল হক তাঁর এককালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে সোহ্রাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে তোলেন। কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের হস্ড়ক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। হক - জিন্নাহ বিরোধের মূল কারণ ছিল দুই নেতার রাজনৈতিক জীবনের নীতিগত বৈষম্য। সর্বশেষ এ কে ফজলুল হককে ভাইসরয় কাউন্সিল বা জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় নিয়ে জিন্নাহর সাথে তাঁর বিরোধ চরমে পৌঁছে ফলে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ফজলুল হকের বির"দ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্ড়াব গ্রহণ করে। অন্যদিকে প্রাদেশিক লীগ মন্ত্রীরা ও নেতারা ফজলুল হককে জিন্নাহর সাথে আপোস করতে চাপ দিতে থাকে। এরই সূত্র ধরে জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করেন। এ অবস্থায় ১৯৪১ সালে ফজলুল হক পদত্যাগ করেন এবং ১৯৪১ সালের ১৮ নভেম্বর 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেন। [৬৩] ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর জিন্নাহর নির্দেশে মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, নবাব হাবিবুলাহ ও তমিজউদ্দিন খান হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, নবাব হাবিবুলাহ এবং তমিজউদ্দিন খান এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, এ. কে ফজলুল হক এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যেজন্য মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা রাখছেন না। প্রগতিশীল যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হলে ফজলুল হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতির পদ থেকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফজলুল হক ছিলেন জিন্নাহর সবচেয়ে উলেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী যার ফলে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে মুসলিম লীগ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং এ সকল কারণেই প্রথম মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। [৬৪]

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত।[৬৫] মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই লাহোর অধিবেশনে তমিজউদ্দিন খান বাংলার মুসলিম লীগের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।[৬৬] ১৯৪১ সালের নভেম্বরে মুসলিম লীগ ও প্রজাপার্টির কোয়ালিশন সরকার থেকে মুসলিম লীগের বেরিয়ে যাওয়ার পর ফজলুল হক ও তার মন্ত্রীসভা ৭ ডিসেম্বর ইস্তফা দেয়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে প্রগ্রেসিভ সংসদীয় পার্টির ৪২ জন, কৃষক প্রজা পার্টির ১৯ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের ২৮ জন, তফসিলি বর্ণের ১২ জন, এ্যাংলো ইন্ডিয়ানস ৩ জন, শ্রমিক ১ জন এবং হিন্দু মহাসভার সদস্য ১৪ জন নিয়ে দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। উগ্র হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৬৭] তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে কেউ কেউ একে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা নামে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে ২৯ মার্চ ১৯৪৩ পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকেন। এ সময় প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে কাটাতে হয়েছে মুসলিম লীগের বিরোধিতার মুখে। স্বাভাবিকভাবেই হক মন্ত্রীসভা উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারেনি। কেননা ফজলুল হক বাংলার গভর্নর জন হার্বাট থেকে শুরু করে মহকুমা অফিসার পর্যন্ত সর্বস্তরের আমলাদের প্রতিকূল মনোভাবের স্বীকার হন। ফলে এক সময় ভাইসরয়ের নিকট তিনি গভর্নরের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন। স্পষ্টত গভর্নরের সাথে ফজলুল হকের বিরোধ প্রকট হয়। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় যা ছিল বরখাস্তের নামান্তর মাত্র।[৬৮] এ কে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পদত্যাগের সময় গভর্নর একটি সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের ধারণা দিলেও ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ প্রেক্ষাপটে মুসলিম সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান

জানানো হয়। ১৯৪৩ সালের ২৩ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৬৯] নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩–১৯৪৫) নিম্নরুপঃ

নাম	মন্ত্রীসভা
খাজা নাজিমুদ্দিন	স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা
হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী	বেসামরিক সরবরাহ
তমিজউদ্দিন খান	শিক্ষা
খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজেমুদ্দিন হোসেন	কৃষি ও পল-ী উন্নয়ন
নবাব মোশাররফ হোসেন	বিচার ও ব্যবস্থাপনা
খাজা শাহাবুদ্দিন	বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প
খান বাহাদুর জালাল উদ্দিন আহমদ	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
তুলসী চরণ গোস্বামী	অর্থ মন্ত্রণালয়
বরদা প্রসন্ন পাইন	পূর্ত ও যানবাহন
তারকনাথ মুখার্জী	রাজস্ব ও রিলিফ
হেমহরি বর্মা	বন ও আবগারি
পুলিন বিহারী মলি- ক	প্রচার
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	সমবায়, ঋণ ও পল-ীদারিদ্র্য

তমিজউদ্দিন খান খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় ১৯৪৩-১৯৪৫ পর্যন্ড় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি মুসলিম লীগের দলীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন জনাব তমিজউদ্দিন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিল আবার ফিরিয়ে আনেন। এসময় মন্ত্রীসভার হিন্দু সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তমিজউদ্দিন খান শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্র"টি দূরীকরণের চেষ্টা করেন। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থতা, দুর্নীতি, হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ দ্বন্দ্ব তথা দলীয় কোন্দল নাজিমুদ্দিন

মন্ত্রীসভার পতন ঘটায়। দূর্ভিক্ষের সময় সোহ্‌রাওয়ার্দীর খোলা নঙ্গরখানা সাফল্যের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষকে রক্ষায় অবদান রাখলে নাজিমুদ্দিন নয় বরং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নামই প্রচারিত হয়। নিখিল পাকিস্ড়ান মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নাজিমুদ্দিনের প্রতি সমর্থন ছিল। ফলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নাজিমুদ্দিনপন্থী ও সোহ্‌রাওয়ার্দীপন্থী এ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খাদ্য সমস্যা নিয়ে দুই গ্র“পের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। তমিজউদ্দিন খান মুসলিম লীগের বিবাদমান দুই গ্র“পের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রাণান্ড় চেষ্টা করেন কিন্তু উভয় গ্র“প যার যার যুক্তিতে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেট বরাদ্দের ওপর ভোটাভুটি হলে সরকার সমর্থকরা বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে ১০৬/৯৬ ভোটে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতনের পর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাসহ সারা ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে তমিজউদ্দিন খান ঢাকা-ময়মনসিংহ থেকে কেন্দ্রিয় আইনসভায় প্রার্থীতা করেন। তাঁর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্যার আবদুল হালিম গজনভী। এসময় তিনি নিজস্ব এলাকা ফরিদপুর লাল মিঞার জন্য ছেড়ে দেন। কারণ তমিজউদ্দিন খানের জনপ্রিয়তা সকল অঞ্চলে জয়ী হওয়ার মতো ছিল। এই নির্বাচনে উলে-খযোগ্য ভোট পেয়ে জয়ী হন। কিন্তু আবদুল হালিম গজনভী তমিজউদ্দিন খানের বির“দ্ধে ভোট কারচুপির মামলা দায়ের করেন। এ কে ফজলুল হক এতে সাক্ষ্য দেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তমিজউদ্দিন খান এ মামলায় বিজয়ী হয়ে দিল-ীর কেন্দ্রিয় আইন সভায় সদস্য হিসেবে যোগ দেন। তখন কেন্দ্রে জওহরলাল নেহের“ প্রধানমন্ত্রী ও লিয়াকত আলী খান অর্থমন্ত্রী। এ সময় তমিজউদ্দিন খানের ডেপুটি স্পিকার হওয়ার কথা শোনা যায়। যখন তিনি ভারতের গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তখন ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পথে। গণপরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি যুগান্ড়কারী অবদান রেখে গেছেন। এসময় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির বিস্ড়ার করছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার হিন্দু-মুসলিমদের স্মৃতি নিয়ে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়রের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে ইংল্যান্ড থেকে ক্রিপস মিশন, মন্ত্রীমিশন ভারতে আগমন করে।[৭০] কংগ্রেস তখন পর্যন্ড় অখন্ড

ভারতের পক্ষে অবস্থান করে। এসময় কংগ্রেসের মধ্যে নানা রকম পক্ষ-বিপক্ষ লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেসের অনিশ্চয়তার কারনে পাকিস্ড়্নের স্বাধীনতা বিলম্ব হচ্ছে ভেবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ দিবস' পালন করেন। [৭১] হিন্দুরা এর বিরোধিতা করায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে এবং বহু মুসলমান নিহত হয়। অন্যদিকে নোয়াখালীতে প্রচুর হিন্দু নিহত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ড় মাত্র তিন দিনের ভয়াবহ দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুসলমান নিহত ও আহত হয়। এই দাঙ্গার ফলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হিন্দু-মুসলমান রাষ্ট্র ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে বাংলা তথা ভারতে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করলেও ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, যার শেষ পরিণতি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি তথা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্ড়্ন এবং ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। [৭২]

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী প্রদেশ গুলো বিভাজনের জন্য কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়।[৭৩] সম্পদ ও ঋণের ভাগ বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে গঠিত পার্টিশান কাউন্সিলে তমিজউদ্দিন খান সদস্য ছিলেন। পাকিস্ড়্ন রাষ্ট্র গঠিত হলে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গণপরিষদের সভাপতি ও তমিজউদ্দিন খান সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। লিয়াকত আলী খানের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তমিজউদ্দিন খান কার্যপ্রণালী কমিটির সদস্য হিসেবে অসম্ভব পরিশ্রম করেন এবং তাঁর প্রণীত কার্যপ্রনালী বিনা তর্কে গৃহীত হয়। এসময় দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে জিন্নাহর সাথে তাঁর যুক্তি তর্কের ধারাবাহিক আলোচনা চলে। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল হন এবং পূর্ববাংলার নুরুল আমিন প্রধানমন্ত্রী হন। এসময় তমিজউদ্দিন খান পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক আইন সভার সভাপতি মনোনীত হন।[৭৪]

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্ড়্নীরা পূর্ব পাকিস্ড়্নের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ করতে থাকে। বিশেষ করে পাকিস্ড়্ন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পশ্চিম

পাকিস্ড়ানীরা তাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করতে থাকে এবং কালবিলম্ব করে পূর্ব পাকিস্ড়ানেরর দাবী দাওয়া উপেক্ষিত করে। [৭৫] পশ্চিম পাকিস্ড়ানীরা পূর্ব পাকিস্ড়ানীদের দাবী মেনে নিতে রাজী না থাকায় শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ বিলম্বিত হতে থাকে। এসময় লিয়াকত আলী খানকে তমিজউদ্দিন খান বারবার চাপ প্রয়োগ করেন যাতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন তরান্বিত হয়। এরই মধ্যে ১৯৪৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মূলনীতি কমিটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের নির্দেশনা দিয়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। [৭৬] এখানে বিতর্কিত বিষয়গুলো ছিল শাসনতন্ত্রে ইসলামের ভূমিকা, প্রদেশসমূহ ও কেন্দ্রে ক্ষমতার বিভাজন এবং রাষ্ট্র ভাষা। এখানে প্রদেশের জন্য কার্যকর স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা ছিল না। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার সুপারিশ বাঙালির সবচেয়ে বেশি অগ্রহণীয় ছিল। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন। পাকিস্ড়ানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [৭৭] ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে পাকিস্ড়ানেরর রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর কথা ঘোষণা করেন একই ভাবে ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে ঘোষণা করেন উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিবাদে নতুন করে ভাষা আন্দোলন গতি লাভ করে। এরই মধ্যে সরকার ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্র"য়ারি ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্রজনতা তা উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালায়।[৭৮] এতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার নিহত হয় এবং অনেক মানুষ আহত হয়। ফলে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে পাকিস্ড়ানের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাই তমিজউদ্দিন খান প্রধানমন্ত্রীকে খুব দ্র"ত ভাষা এবং সংবিধানের জটিলতা দূর করার আহ্বান করেন। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেন। ফলশ্র"তিতে পাঞ্জাব থেকে আসে বড় রকমের আপত্তি। পূর্ববঙ্গেও এমন হতাশা সৃষ্টি হয় যে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সব উৎসাহ অদৃশ্য হয়ে যায়।[৭৯] মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের প্রবল অনীহা তৈরি হয়। কারণ দেশ বিভাগের শুর"তেই মুসলিম লীগ সরকার ও দল হিসেবে দেশ পরিচালনায় চরম বৈষম্য, ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার, দমন নীতি, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিম লীগের একদল আত্মসচেতন, উদারপন্থী ও অসাম্প্রদায়িক তর"ণ রাজনৈতিক কর্মী ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন

পূর্ববাংলার নতুন দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন।[৮০] পাকিস্ড়ানের শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়ায় এসময় গণতন্ত্র চরমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৫৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে সেনাবাহিনী উৎখাত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী করে।[৮১] তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কিছুটা তৎপরতা দেখান এবং ভারত শাসন আইনকে রদবদল করে পাকিস্ড়ানের উপযোগী করেন। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি কমিটি তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করে। এতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রস্ড়াব করা হয়। গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ বিদেশ থেকে দেশে ফিরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী দেশে নেই তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণপরিষদ স্থগিত ঘোষণা করেন। তমিজউদ্দিন খান এ সময় সিদ্ধান্ড়ের বিরোধিতা করে পরামর্শ প্রদান করেন কিন্তু তাঁর কথা মোহাম্মদ আলী কর্ণপাত করেননি।[৮২]

পূর্ববাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বির"দ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্ড়ানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বির"দ্ধে এ নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ-ব'। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর থেকেই এর বির"দ্ধে পাকিস্ড়ান সরকার বিরোধিতার মনোভাব পোষণ করে। ফলে কেন্দ্রিয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ক ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ড় করে এবং পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন।[৮৩] এভাবে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান ঘটে।[৮৪] প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বিদেশ থেকে এসে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এতে তমিজউদ্দিন খানকে যোগদান করার কথা বললে তিনি তৎক্ষনাৎ প্রস্ড়াব নাকচ করে দেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির কাজ সম্পূর্ণ, শুধুমাত্র রিপোর্টে স্বাক্ষর করার জন্য একটি সভার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোন কিছু বিবেচনা না করে এসময় গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ২৬শে অক্টোবর তমিজউদ্দিন খান গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ড়কে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর সামনে ছিল দুটো পথ- গোলাম মোহাম্মদ কে উপেক্ষা করে আইনসভা আহ্বান করা অথবা গণপরিষদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে আইনের সাহায্য

নেয়া। সব হুমকি উপেক্ষা করে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হলেন। বাথ আইল্যান্ডে তাঁর সরকারী ভবনের ওপর কড়া নজর রাখা হলো। ৭ নভেম্বর ১৯৫৪ একটি স্মরণীয় ঘটনার দিন। ঐ দিন তমিজউদ্দিন খান গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে সিন্ধু প্রধান আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করেন। সব হুমকি উপেক্ষা করে তিনি আদালতে উপস্থিত হন। তিনি গোপনে মোটর রিক্সা করে কোর্টে পৌঁছালেন। কেউ তাঁকে ধরে ফেলে এই ভেবে ৭ নভেম্বর কেস ফাইল করে সারাদিন কোর্ট লাইব্রেরিতে কাটান। ইতোমধ্যে গোলাম মোহাম্মদের অনুচররা বাসায় এসে তাঁকে নানারকম ভীতি প্রদর্শন করে। ইস্কান্দার মির্জা, করাচীর কমিশনার নাকভী, গণপরিষদের সেক্রেটারি এম বি আহমদ, গুরমানী সদলবলে তাঁর বাসায় চড়াও হয়ে মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে বলে নচেৎ বিপদ হতে পারে জানায়।[৮৫] তমিজউদ্দিন খান জানান যে, "তোমরা তোমাদের কর্তব্য কর। আমার কর্তব্য আমার ওপর ছেড়ে দাও।" তমিজউদ্দিন খানের মামলা সমগ্র দেশে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দেশবাসী এই শান্ত, বর্ষীয়ান মানুষটির চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। মামলার শুনানীর সময় জনসাধারণের উপস্থিতি ও কোর্ট অঙ্গনে জায়নামাজ হাতে দরিদ্র সাধারণ মানুষের অনবরত প্রার্থনার দৃশ্য ছিল দর্শনীয় ঘটনা। এসব দরিদ্র মানুষ বুঝত না গণতন্ত্র কি কিন্তু তারা হৃদয় দিয়ে তমিজউদ্দিন খানকে জনগণের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী শাসকের বির‍ুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন করেছে। এই মামলায় তমিজউদ্দিন খানের জয় হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করায় ১৯৫৬ সালের সংবিধান রহিত হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের তথাকথিত নির্বাচনে মিস ফাতেমা (কায়েদে আজমের ছোট বোন) পূর্ব পাকিস্ড়ানে ব্যাপক সমর্থন পান। কিন্তু আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তমিজউদ্দিন খান নির্বাচনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাঁর নিষ্ক্রিয়তা পরিবারের সদস্যদের ব্যথিত করে। তাই সকলের অনুরোধে তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়ে কেন্দ্রিয় আইনসভা নির্বাচনে অতি সহজে জয়লাভ করেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা ছিল ঢাকা-ফরিদপুর। এরপর তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রিয় আইন সভার 'স্পিকার' নিযুক্ত হন।। আইয়ুব খান দুবার দেশের বাইরে গেলে তাকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। তমিজউদ্দিন খান মৃত্যু পর্যন্ড় কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের স্পিকার ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ১৯শে আগস্ট তমিজউদ্দিন খান শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন। তমিজউদ্দিন খানের মৃত্যুর সংবাদে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিম্নোক্ত নিবন্ধ প্রকাশ করে।[৮৬] "পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দিন খান গতকাল ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি সংগ্রাম করেন। তিনি মে মাসে ওয়াশিংটনের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ... একটি স্বচ্ছল আইন ব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি বন্দী অবস্থায় ব্রিটিশ জেলারকে হাসি মুখে যে ব্যঙ্গোক্তি করেন তা প্রকাশিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় তিনি দুবার মন্ত্রী ছিলেন এবং বহু কথা-সাহিত্য রচনা করেন।"[৮৭]

"১৯২০ থেকে শুরু করে তাঁর বিচিত্র রাজনৈতিক জীবন। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তিনি গ্রেফতার হন। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে দুবার তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ও আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ ও ১৯৪২ সালে দুবার অবিভক্ত বাংলায় মন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ও কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি হন। গণপরিষদ ভাঙ্গার পর তিনি যে আইনগত পদক্ষেপ নেন তা কেবল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়ই নয় তা ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াইও।"[৮৮]

"তিনি ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রপথিক। প্রচার বিমুখ ও মৌনী এ রাজনীতিবিদ অশুভ শক্তির কাছে কখনো মাথা নোয়াননি। তাঁর বীরত্ব ছিল গভীর ও অপ্রকাশিত। তাঁর যোগ্যতা ও আইন প্রণয়ন অভিজ্ঞতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। আইন সভায় সুযোগ সুবিধায় তিনি ছিলেন বিবেকবান রক্ষক। দ্বিতীয় রিপাবলিকে তাঁর আবার স্পিকার নির্বাচিত হওয়া প্রমাণ করে সর্বশ্রেণির মানুষের তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। বিরোধী দলের লোকেরাও তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের প্রশংসা করে। তিনি *পয়গাম* ও *মদিনা* এই দুটি সাপ্তাহিক কোলকাতা থেকে সম্পাদনা করতেন। ফুটবল, ক্রিকেট ও মাছ ধরা ছিল তাঁর পছন্দ। তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী স্বাধীনতা আন্দোলনের ছাত্রদের জন্য এক মূল্যবান দলিল।"[৮৯] মিস ফাতেমা জিন্নাহ বিরোধী দলের নেত্রী তাঁর বানীতে বলেন "জনাব তমিজউদ্দিন খান ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক,

পার্লামেন্টারিয়ান ও গণতন্ত্রের সৈনিক। পাকিস্ড়ান আন্দোলনে সক্রিয় সংগ্রাম করেন। দেশ ও জনগণের সেবায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। গণপরিষদ ও জাতীয় আইনসভায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।" আবদুল হামিদ খান ভাসানী খেলাফত আন্দোলনের সময় জনাব তমিজউদ্দিন খানের সঙ্গে একত্রে কাজ করার কথা স্মরণ করে বলেন 'তিনি ছিলেন একজন মহান মুজাহিদ।'[৯০]

তমিজউদ্দিন খান বাংলাদেশ তথা পূর্ববাংলার একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আঞ্চলিক রাজনীতি দিয়ে জীবনের সূচনা হলেও নিজ প্রতিভাগুণে পাকিস্ড়ানের রাজনীতির শীর্ষ আবস্থানে পৌঁছেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। তমিজউদ্দিন খানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের শুর" খেলাফত আন্দোলন দিয়ে। তবে বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তাছাড়া পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পর গণপরিষদের অবৈধ ভাঙ্গনের সময় তাঁর সাহসী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বিভাগ পূর্ব ভারতে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নিবেদিত সৈনিক। তমিজউদ্দিন খানের কর্ম সাধনা আজও আমাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

প্রান্তটীকা

১। স্বরাজঃ ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের অদ্বিতীয় লক্ষ্যরূপেই স্বরাজ আন্দোলনের উদ্ভব। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী ইউনাইটেড কিংডম বা তার উপনিবেশগুলোর ন্যায় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। (অমলেশ ত্রিপাঠী, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (অনুবাদ নির্মল দত্ত)*, আনন্দ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১২৮।)

২। *জীবনী গ্রন্থমালা*, তমিজউদ্দিন খান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫-৭

৩। তমিজউদ্দিন খান, *(The Test of Time: My Life and Days) কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি, অনুবাদ রাজিয়া খান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২-১৫

৪। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ. বি. এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*,একাদশ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্ড়ান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

৫। ঝপু খান ফরিদপুর অঞ্চলের একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর নামে ঝপু খান প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে তজিমউদ্দিন খান পড়ালেখা করেন। ঝপু খান শিক্ষিত না হলেও তিনি ধার্মিক ছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়াও ঝপুখান নিজের এলাকায় মসজিদও নির্মাণ করেন। তৎকালীন সময়ে অত্র এলাকায় সবচেয়ে স্বনামধন্য লোকও ছিলেন তিনি । (তমিজউদ্দিন খান , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮)

৬। তমিজউদ্দিন খান, *(The Test of Time: My Life and Days) কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি*, অনুবাদ রাজিয়া খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২৫, ২৯-৩৬

৭। মুহাম্মদ ইনাম-উল- হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৩-১১৫

৮। মুনতাসির মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রতিক্রিয়া, মওলা ব্রাদার্স*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২-১৫

৯। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৯-২০, ২৪-২৫

১০। মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২২

১১। কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫২–১৯৩৬) ব্রাহ্ম সমাজ ও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৮৮৩ সালে তিনি কালীশঙ্কর প্রমুখের সহযোগিতায় *সঞ্জীবনী* নামে একটি জাতীয়তাবাদী বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। *সঞ্জীবনীর* মাধ্যমে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন। (সমাবুর চন্দ্র মহন্ত, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত* , পৃ.৪৫১-৪৫২)

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫) ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা। ১৮৭৬ সালে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভারতীয় সংঘ' বা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সাল হতে তিনি *বেঙ্গলী* শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যেখানে তিনি জাতীয় সংস্কৃতি, একতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। তাছাড়া ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। (ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, প্রথম প্রকাশ, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৭-১১৮)

ভূপেন্দ্রনাথ দাস ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একজন নেতা। যিনি তার পত্রিকা *যুগান্তরে* বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখির মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০)

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ সালে জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক হিসেবে অবিভক্ত বঙ্গের যশোর জেলার মাগুরা গ্রাম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (হেলাল উদ্দীন আহমেদ ও গোলাম রহমান, *বাংলাপিডিয়া*)

১২। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩২

১৩। নমঃশুদ্র : হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনামূলক নমঃশুদ্ররা নিচু জাতের ধরা হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় এই গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসামে নমঃশুদ্রের সংখ্যা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩২. ৬২%। এর মধ্যে নমঃশুদ্র ছিল ১৩.৭৮%। তাছাড়া পূর্ববঙ্গে হিন্দু চাষীদের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল নমঃশুদ্র। (মুনতাসীর মামুন, *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮)

১৪। মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৫। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০, গোলাম মোস্তফা, *বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, সন্দেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০ পৃ. ২৭-২৮

১৬। স্মরণীয় বরণীয় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত ধর্ম প্রচারক হিসেবে অধিক সমাদৃত, তবে তৎকালীন রাজনীতিতেও ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি এর পক্ষে অবস্থান করেন। (শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ. ১৯৫)

১৭। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১৮। অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২) ফরিদপুর অঞ্চলের স্বদেশী আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ছিলেন।তিনি ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করে মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তমিজউদ্দিন খান তাঁর বক্তৃতা শুনে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে মনোযোগী হয়। (শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পৃ. ৯)

১৯। বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) সিলেট জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন । রাজনীতবিদ ও লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার কংগ্রেস নেতা হিসেবে বিপিন চন্দ্র পাল চরমপন্থী বিপ- বী কংগ্রেস নেতা হিসেবে বাংলার মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি ১৯০১ সালের ১২ই আগস্ট *নিউ ইন্ডিয়া* নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। (তাবেদার রসুল বকুল, *ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল: জীবন ও কর্ম*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৫)

২০। তমিজউদ্দিন খান, *(The Test of Time: My Life and Days) কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি*, অনুবাদ রাজিয়া খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮-২৯, ৬৬

২১। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬-১৩৭

২২। মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০, ৭২

২৩। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩, ৬৬

২৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

২৫। পাঁচকড়ি বাড়ুজ্যে *বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী* স্বদেশী যুগে কলকাতার বিখ্যাত লেখক ছিলেন। ১৯১১ সালে ফরিদপুর প্রজা সম্মেলনে যোগদান করেন যার আয়োজক ছিলেন তমিজউদ্দিন খান। (তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬)

২৬। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭

২৭। ১৮৯২ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় কাউন্সিল এ্যাক্ট মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই তারা আলীগড়পন্থি মুসলিম নেতা মুহসিন-উল-মূলকের নেতৃত্বে বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করেন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম ভারতের ৩৫ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির এক প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়, বড়লাট মিন্টোর সাথে সিমলায় সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের স্বার্থ সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এটিই বিখ্যাত 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে পরিচিত। 'সিমলা ডেপুটেশনের' অন্যতম দাবী ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বা পৃথক নির্বাচন। (মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪)

২৮। ভিকার-উল-মূলক (১৮৪১-১৯১৭) ভারতের উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মুসলিম সহযোগিতার ওপর গুরত্বারোপ করেন। খেলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলন। ভিকার-উল মূলক আলীগড় কলেজের এবং একইসাথে মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। (মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮, ৮২, ৮৩)

২৯। মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৫

৩০। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

৩১। ওয়াকিল আহমদ,*বাংলার মুসলিম সভা-সমিতির ইতিহাস (১৮৫৫-১৯৪৭)*, ঢাকা, *১৯৮২*, পৃ. ৮৮

৩২। খান বাহাদুর আবদুল গনি (১৮৩০-১৮৯৬) ঢাকার বড় জমিদারদের মধ্যে অন্যতম একজন। ঢাকার জমিদার নবাব খাজা আহসানউল্লাহ ছিলেন তাঁর পুত্র এবং নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন তাঁর নাতি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বড় অংকের উপঢৌকন প্রদান করেন। ১৮৬৭ সালে ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স তাঁকে আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। তাছাড়া ১৮৭৫ সালে তাঁকে বংশানুক্রমিক 'নবাব' উপাধি দেওয়া হয়। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬-৭)

৩৩। তমিজ উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

৩৪। ১৯১৯ সালে ভারত সচিব মন্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ডের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয় যা 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার' নামে পরিচিত। এই সংস্কার কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ ও বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্রের অধীন এবং আইন শৃঙ্খলা শিক্ষা, ভূমি,

রাজস্ব, কৃষি, সেচ, পূর্ত, বন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ড় করা হয়। এই আইনে কেন্দ্র এবং প্রদেশে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়। বঙ্গীয় আইন সভায় ১৩৯ জন সদস্য নিয়ে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়। (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭)

৩৫। সত্যাগ্রহ : রাওলাট বিলের বির”দ্ধে ভারতীয় জনমতকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সত্যাগ্রহ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভার প্লাটফর্ম থেকেই তিনি সত্যাগ্রহ শপথ আন্দোলনের (Satyagraha pledge Movement) ডাক দেন। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশ্বস্ড়তার সাথে সত্যের অনুসরণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শপথ গ্রহণ করতে হত। তারা কখনও প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেনা। (Chandiprasad Sarkar, *The Bengali Muslim: A study in Their Politicization (1921-1929)* , Dhaka, 1991, P.82)

৩৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২-৭। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪, কলকাতা, পৃ, ১৭৯।

পীর বাদশা মিঞা (১৮৮৪-১৯৫৯) ফরিদপুরের শিবচর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৮৪ সালের ২২ মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সভা-সমিতিতে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয়। কারামুক্তির পরেও বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং ইংরেজ শাসন বয়কট নীতির প্রচারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিরাম পরিশ্রম করে জেলায় জেলায় সভা-সমিতি করেন। তিনি 'নিখিল বঙ্গ প্রজা পার্টি'র পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের প্রচারনায় অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। তাছাড়া সিলেটের গণভোট উপলক্ষে সেখানে গিয়ে সিলেটকে পাকিস্ড়ানের অন্তর্ভূক্ত করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর পীর বাদশা মিয়া 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ ইসলাম' (১৯৪৫ খৃ.) ও 'নেজামে ইসলাম পার্টির' (১৯৫২ খৃ.) পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১৮৯)

৩৭। তমিজউদ্দিন খান, *(The Test of Time: My Life and Days)*, *কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৩৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩, ৭৮

৩৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

৪০। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৮

৪১। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

৪২। সুমিত সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩-১৯৫

৪৩। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-১০০

৪৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৫, ১০৮

৪৫। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

৪৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

৪৭। এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৩

৪৮। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৪৯। আলীমুজ্জামান চৌধুরী তিনি ফরিদপুর জেলার রেলগাহির জমিদার ছিলেন। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা থেকে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (১৯২৪–২৬) পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত হন। আলীমুজ্জামান চৌধুরী ১৯৩৬ সালে ইন্তেকাল করেন।*(ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫)

৫০। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

৫১। 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-১৯৩২' ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রদেশ গুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট যে সাময়িক সিদ্ধান্ত সমূহ ঘোষণা করেন তাই "সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ" নামে খ্যাত। এ আইনের দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয়, খ্রিস্টান, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এই রোয়েদাদে ভারত উপমহাদেশের অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়। (অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস*,মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৯৬।)

৫২। নবাব হাবিবুল্লাহ ঢাকা খেলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি খেলাফতের অনেক সভা সমিতিতে সভাপতিত্ব করেন, ভাষণ দেন এবং ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার নর্থব্রুক হলে শিক্ষা বর্জন তথা অসহযোগের বিরুদ্ধে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নওয়াব সাহেবই তার উদ্যোক্তা ছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি 'ঢাকা খেলাফত কমিটি' থেকে পদত্যাগ করেন। (ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১)

৫৩। Humaira Momen, *A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937,* Dacca, 1972, P. 45-53

৫৪। ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২

৫৫। Humaira Momen, *Ibid,* P. 93

৫৬। *Ibid* , P. 46-54

৫৭। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

৫৮। Humaira Momen, *Ibid,* p. 62-69

৫৯। তফসিলি সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে গঠিত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনুন্নত বলে বিবেচিত একটি রাজনৈতিক শ্রেণি। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম তফসিলি কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ আইনে বলা হয় যে, যেসব বর্ণ সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতি ইত:পূর্বে অনুন্নত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত ছিল এখন থেকে তারা তফসিলি সম্প্রদায় রূপে আখ্যায়িত হবে। ১৯৩৭, ১৯৪৭ ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তফসিলি সম্প্রদায় বাংলার রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি শক্তিশালী পথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৩)

৬০। Humaira Momen, *Ibid,* P. 68-70

৬১। পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা , ২০ আগস্ট, ১৯৬৩, পৃ. ১

৬২। চাষী খাতক আইন: শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা কৃষক প্রজার ভাগ্যোন্নয়নে ১৯৩৯ সালে চাষী খাতক আইনের প্রথম সংশোধনী এনে ঋণ সালিশী বোর্ডকে শক্তিশালী করেন। কারণ ১৯৩৫ সালে পাশকৃত চাষী খাতক আইনে অনেক ত্রুটি থাকায় কৃষক সমাজ এ আইন দ্বারা উপকৃত হয়নি। (সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১)

৬৩। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১৪, ১২৩-১২৪

৬৪। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩

৬৫। লাহোর প্রস্ড়বঃ ১৯৪০ সালের ২২ শে মার্চ থেকে লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতম অধিবেশন শুরু হয়। ২৩ শে মার্চ বিকেলে ৩টা ৪৫ মিঃ এ মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক প্রবেশ করলে অধিবেশনে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে 'শের-ই-বঙ্গাল' 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তারপর ফজলুল হক ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের মূল প্রস্ড়বটি উপস্থাপন করেন। ২৪ শে মার্চ তারিখে গৃহীত এই প্রস্ড়বটি মুসলিম লীগের কার্যবিবরণীতে 'লাহোর প্রস্ড়ব' নামে উল্লেখিত এবং তাতে কোথাও 'পাকিস্ড়ন' শব্দটির উল্লেখ নেই। এই প্রস্ড়ব গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু কাগজগুলোতে বড় বড় শিরোনামায় খবর ছাপা হয় যে, পাকিস্ড়ন প্রস্ড়ব গৃহীত। এই ভাবেই 'লাহোর প্রস্ড়ব' হয়ে ওঠে 'পাকিস্ড়ন প্রস্ড়ব'। এই প্রস্ড়বের মূল কারণ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সমস্ড় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্তশাসিত। *(রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* আগামী প্রকাশনী , ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৭-২৮)

৬৬। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৬৭। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

৬৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯-২১১

৬৯। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৭, পৃ.২৪৬-৫০

৭০। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৭১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৪

৭২। ড. মোঃ শাহজাহান, *বাংলার ইতিহাস (১৭৬৫-১৯৪৭), আধুনিক যুগ*,চয়নিকা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩১৩

৭৩। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ১৯৪৭ সালের ৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' কে বাস্ড়বে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই যে আইন পাস করে তা 'ভারত স্বাধীনতা

আইন' নামে খ্যাত। ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন ব্যাপারে এটা সর্বশেষ আইন প্রণয়ন। ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা, ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধনী, (গভর্নর জেনারেল নিয়োগ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস, কমনওয়েলথে থাকা বা না থাকার স্বাধীনতা) ইত্যাদি বিষয় এই আইনে অন্তর্ভূক্ত ছিল। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮-১৯৩)

৭৪। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১১৬

৭৫। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৫

৭৬। গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত প্রধান কমিটির নাম মূলনীতি কমিটি যা ১৯৪৯ সালের মার্চে গঠিত হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়ন করা। (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৫)

৭৭। গোলাম মোহাম্মদ (১৮৯৫-১৯৫৬) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন কে প্রধানমন্ত্রী এবং গোলাম মোহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। (আবু জাফর, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৫)

৭৮। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫

৭৯। আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, ঢাকাঃ জে.কে.প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫

৮০। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*,পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭-৭৮

৮১। মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) (১৯০৯-১৯৬৩), পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। (মুয়ায্যম হুমায়ুন খান, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ .৩০৯)

৮২। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৮৩। ৯২ ক ধারাঃ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তানী সরকার মাত্র ত্রিশ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ১৯৩৫ সালের ভারত

শাসন আইনের ৯২ক ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ড় করে এবং বাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন (ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫০)

৮৪। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

৮৫। ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯–১৯৬৯) ছিলেন পাকিস্ড়ানের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ণের পর তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৫৮ সালে তিনি সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন। এই সামরিক আইন জারির বিশ দিন পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। ইস্কান্দার মির্জা লন্ডনে নির্বাসিত হন। (উইকিপিডিয়া, *https:/bn.wikipedia.org/sla6f)*

৮৬। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১২২

৮৭। NewYork Times, 20 August, 1963, America, Editorial Page.

৮৮। *পাকিস্ড়ান অবজারভার*, ঢাকা, ২০ আগস্ট, ১৯৬৩, পৃ. ১

৮৯। *মর্নিং নিউজ* , ঢাকা, ২০ আগস্ট ,১৯৬৩, ,পৃ. ১

৯০। তমিজউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৬

শামসুদ্দিন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯)

শামসুদ্দিন আহমেদ বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে শীর্ষ স্থানীয় একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পূর্বে তিন দশকে বাংলার রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।[১] তিনি ছিলেন বাংলাদেশের কৃষক প্রজা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল এবং শিক্ষানুরাগী।[২] শামসুদ্দিন আহমেদ ১৮৮৯ সালের আগস্ট মাসে কুষ্টিয়া (পূর্বে নদীয়া) জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [৩] তাঁর পিতা মাহতাবুদ্দীন আহমদ সমাজ সংস্কারক ছিলেন।[৪] শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯১০ সালে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ সালে ইতিহাস এবং আইন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।[৫] তিনি প্রথমে ১৯১৭ সালে কৃষ্ণনগর এবং পরে ১৯১৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুর“ করেন। [৬] তারপর শামসুদ্দিন আহমেদ তৎকালীন কলকাতার শীর্ষ স্থানীয় ব্যারিস্টার এবং কংগ্রেসের বামপন্থী গ্র“পের নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের অধীনে জুনিয়রশিপে ছিলেন। [৭]

শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেন। [৮] মওলানা আবুল কালাম আজাদ যখন বঙ্গীয় খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন শামসুদ্দিন আহমেদ বঙ্গীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। [৯] এ সময় তিনি কোর্ট বয়কট করেন এবং নদীয়ার জেলা বোর্ডের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি তিনি বিদেশী কাপড়-চোপড় ব্যবহার বাদ দিয়ে হাতে তৈরি দেশীয় খাদি কাপড় ব্যবহার শুর“ করেন। [১০] ১৯২১ সালে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাে র জন্য শামসুদ্দিন আহমেদ কলকাতা থেকে অন্যান্য নেতাদের সাথে গ্রেফতার হন। ১৯২১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি কারাবরণ করেন। [১১] জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শামসুদ্দিন আহমেদ আবার খুব জোরালোভাবে বিশেষ করে কুষ্টিয়া জেলার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ সময় তিনি ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করে মুসলিমদের স্বার্থের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে কর্মসূচী দাড় করান । [১২]

শামসুদ্দিন আহমেদ কংগ্রেস আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাসের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি এর সেক্রেটারি ছিলেন। [১৩] ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে 'স্বরাজ্যদল'(১৯২৩) গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের একদল ত্যাগী ও বিপ-বী নেতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচীকে সামনে রেখে একটি বিকল্প প-াটফর্ম হিসাবে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি মুসলমানদের সমর্থন ও হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনের জন্য ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়ের প্রতি সঠিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করা। উলে-খযোগ্য শর্ত ছিল যে, প্রত্যেক জেলায় ৬০ ও ৪০ এর সংখ্যানুপাতে স্থানীয় সংস্থা সমূহে প্রতিনিধিত্ব, যে সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু তাদের জন্য ৬০ ভাগ এবং যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু তাদের জন্য ৪০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব, ফলে বহু মুসলমান চিত্তরঞ্জন দাস এবং 'স্বরাজ দলে'র সমর্থক হয়ে উঠে।[১৪] অন্যান্য মুসলিম নেতার মত শামসুদ্দিন আহমেদ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সমর্থন করেন। কারণ তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৫] বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলা চুক্তি বা 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। গান্ধীর সমর্থক কংগ্রেস দল ও স্বরাজ্য বিরোধী হিন্দুরা বাংলা চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। তদুপরি ১৯২৫ সালের ১৬ ই জুন চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যু হিন্দু-মুসলিম মিলন ও ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে। ১৯২৬ সালে প্রথম কলকাতা ও পরে ঢাকায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ফাটলের সৃষ্টি করে। ফলে কংগ্রেস এবং বাঙালি মুসলিম নেতাদের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চেষ্টা ব্যর্থ হয়। [১৬] এ সময় কোন ভারতীয় সদস্য ছাড়াই ১৯২৭ সালে 'সাইমন কমিশন' গঠন করা হয় ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা এই কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময় মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ চেষ্টা করে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' আবার বাস্তবায়ন করার জন্য, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। ১৯২৮ সালের

বঙ্গীয় প্রজ্বাসত্ব (সংশধোনী) বিলের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থানকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয় । ফলে ১৯২৮ সালেই চূড়ান্তভাবে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' রহিত হয়ে যায়। [১৭]

'বেঙ্গল প্যাক্ট' পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অন্যান্য জেলার মত কুষ্টিয়াতে লক্ষ্য করা যায়। শামসুদ্দিন আহমেদ তাঁর নিজ জেলাতে এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় উকিল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৭ সালে শামসুদ্দিন আহমেদ সর্ব প্রথম কুষ্টিয়া থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি এই সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। [১৮] শামসুদ্দিন আহমেদ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে প্রজা স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। প্রজাদের যখন কোন সংগঠন ছিল না তখনও তিনি প্রজাদের স্বার্থ নিয়ে ভাবতেন এবং তাদের কল্যাণে কাজ করতেন। শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১৯২৫ সালের ৭ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি বগুড়া জেলায় নিখিল বাংলা প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি দাবী করেন যে, মহাজনদের থেকে গরিব প্রজা যে ঋণ গ্রহণ করেন তার উপর আরোপিত সুদের হার সীমাবদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া প্রজাদের সকল অধিকার দিতে হবে , সাথে সাথে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শামসুদ্দিন আহমেদ 'কৃষক প্রজা পার্টি'র বামপন্থী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু তিনি কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিলেন সেটি প্রশ্নের বিষয় হিসেবে বিবেচ্য।

শামসুদ্দিন আহমেদ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন।[১৯] ১৯২৫ সালে তিনি কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।[২০] ১৯২৮ সালে জামালপুরের টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের ধর্মঘট দাবীর পক্ষে তিনি সফল ভাবে কাজ করেছিলেন।[২১] এ সময় তিনি টাটা কোম্পানির শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাবও পেয়েছিলেন।[২২] এভাবে দেশ বিভাগের আগের তিন দশক শামসুদ্দিন আহমেদ শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থী মতাদর্শী হিসেবে কাজ করে গেছেন।[২৩] শামসুদ্দিন আহমেদ কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করায় বিদ্রোহাত্মক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কারণ ইতিহাস বিখ্যাত বাঘা যতিনের (১৮৮৩-১৯১৫) সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র ছিল কুষ্টিয়া জেলা। তাছাড়া বিপ-বী সুভাষ চন্দ্র বোসেরও আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল তৎকালীন নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলা। [২৪] আবার এসময় কমিউনিস্ট আদর্শ বিস্তার করছিল। শামসুদ্দিন আহমেদ এমনই এক বিদ্রোহী ও বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ফলে

সমকালীন এই রাজনীতির প্রভাব থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেননি। তাই তিনি কৃষক প্রজা পার্টি এবং এ কে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় বামপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫]

শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯২৯ সালে মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।[২৬] ১৯২৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে কংগ্রেসের উপর বাংলার নেতৃবৃন্দ ভরসা হারিয়ে ফেলে। কংগ্রেসের মুসলমান নেতারা মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। স্যার আব্দুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এই সমিতি গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হন।[২৭] শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে গ্রেফতার হন। এরপর তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন। তখন কর্পোরেশন মেয়র ছিলেন এ কে ফজলুল হক। কলকাতা কর্পোরেশন কমিশনার থাকাকালে শামসুদ্দিন আহমেদ 'বস্তি অ্যান্ড রোড কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৮] ১৯৩৪ সালে ঢাকায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বিরোধী দল এটা মেনে নিতে চাননি। ফলে ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রজা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় , সভায় সভাপতিত্ব করেন এ কে ফজলুল হক। ডা. আর আহমদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, আশরাফ আহমদ চৌধুরী, শামসুদ্দিন আহমেদ, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ নওশের আলী, প্রমুখের সমর্থনে এ কে ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি এবং শামসুদ্দিন আহমেদ সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। [২৯] শামসুদ্দিন আহমেদ প্রথমে কৃষক প্রজা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেও ১৯৩৪ সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনে যোগদান করেন। মওলানা আকরম খাঁ এসময় নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলে ডানপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন ফলে শামসুদ্দিন আহমেদ তাঁর স্থলে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। [৩০] ১৯৩৫ সালে স্যার আব্দুর রহিম কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তিনি প্রজা সমিতির পদে ইস্তফা দেন এবং ফজলুল হক সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ফজলুল হক ১৯৩৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সম্মেলনে কিছু সদস্য দাবী করেন যে, প্রকৃত

কৃষকদের এ সমিতির সদস্য করার বন্দোবস্ত করা হোক। তদনুযায়ী একটি প্রস্তাব পাশ হয় এবং প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'কৃষক প্রজা পার্টি' করা হয়। [৩১] এ সময় শামসুদ্দিন আহমেদ ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগদান করেন যাতে তিনি কৃষকদের দাবীর পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এই দল গঠন করা হয়েছিল আসন্ন ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে লড়াই করার জন্য। [৩২] শামসুদ্দিন আহমেদ খাজা পরিবার এবং বাংলার ডানপন্থী রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৩৩] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়োজন হয়। বাংলার গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথমে কংগ্রেস দলের বাংলা অঞ্চলের সভাপতি শরৎ বসুকে আহ্বান জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কৃষক প্রজা পার্টি সংসদীয় দলের নেতা ফজলুল হক মুসলিম লীগ, কয়েকটি সংখ্যালঘু ও তফসিলি সম্প্রদায় গোষ্ঠীকে নিয়ে এগারো সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। [৩৪] ১৯৩৭ সালে গঠিত মন্ত্রিসভার মাত্র তিন জন কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য স্থান পায়। তারা হলেন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, অন্য দুই জন ছিলেন শামসুদ্দিন আহমেদ, এবং সৈয়দ নওশের আলী। [৩৫] যদিও ফজলুল হক ঐক্যের প্রয়োজনে সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমেদকে প্রথমে মন্ত্রিসভায় নিতে পারেনি। কারণ মুসলিম লীগ ও গভর্নর এন্ডারসনের বিরোধিতার জন্য তিনি শামসুদ্দিন আহমেদকে বাদ দিয়ে নবাব কাজী মোশাররফ হোসেনকে মন্ত্রী করেন।[৩৬] পরবর্তীতে কৃষক প্রজা দলের প্রতিনিধি হিসেবে শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষি ও পশু পালন মন্ত্রী হিসেবে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। [৩৭] শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে এবং মন্ত্রিত্বের শুরুতেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য দাবী করেন যেটা কৃষক প্রজাপার্টি এবং মন্ত্রিসভার ভাঙ্গনের জন্য বিবাদের মূল বিষয় হয়ে দাড়ায়। এই বিষয়ে সৈয়দ নওশের আলীর সাথে শামসুদ্দিন আহমেদ একমত পোষণ করেন। কারণ উভয়ই ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার ধারক। তাই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলোপের পক্ষে জোরালোভাবে কাজ শুরু করেন। [৩৮]

১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হন দলের সাধারণ সম্পাদক।

ফজলুল হক একই সঙ্গে দুই দলের সভাপতি পদে থাকলে এক সময় কৃষক প্রজা পার্টি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে হক মন্ত্রিসভা অনেকটা মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে প্রজাস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার, প্রজাস্বত্ব অধিকার, শিক্ষানীতি, গ্রামীণ ঋণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রজাপার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রবল ছিল। 'কৃষক প্রজা পার্টি' ভূমি সংস্কারের পক্ষে ছিল। এ দলটি ছিল অসাম্প্রদায়িক, অন্যদিকে মুসলিম লীগ ছিল সাম্প্রদায়িক ও উচ্চ শ্রেণির দল। [৩৯] শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষক প্রজাপার্টির একনিষ্ট সমর্থক ছিলেন। তাই জমিদারি প্রথা বিলোপের প্রশ্নে ফজলুল হকের সাথে মতানৈক্যে আসতে না পারায় ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। [৪০] এই পদত্যাগ করার বিষয়টি তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কৃষক প্রজা দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ পদত্যাগ সম্বন্ধে কৃষক প্রজা দলের অন্যতম নেতা আবুল মনসুর আহমদ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন - "কোন পার্লামেন্টারি দল স্বীয় মন্ত্রীকে কলব্যাক করা এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে উহাই প্রথম। সকলে মিলিয়া আমরা শামসুদ্দিন সাহেবের এই সাহসী পদত্যাগ ও স্বার্থ ত্যাগে তাঁকে ধন্যবাদ করিলাম।" এ সময় প্রজাপার্টির মুখপত্র *সাপ্তাহিক কৃষক*, বের করার পেছনে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক।[৪১]

মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করতে পারায় শামসুদ্দিন আহমেদ সহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মন্ত্রিসভার সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির বিদ্রোহী অংশের চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ফজলুল হক তার এককালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুকে পড়েন। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে তোলে। এসময় কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাই এসময় একুশ জন সদস্য কোয়ালিশন ত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সালে নওশের আলী কোয়ালিশন থেকে পদত্যাগ করলে লীগের ওপর ফজলুল হকের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কংগ্রেসের অসহযোগিতায় ফজলুল হক মুসলিম লীগের ওপর আরো নির্ভরশীল হতে থাকেন। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় জিন্নাহ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। ১৯৪০-৪১ সালে কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগের বিরোধ দেখা দেয়। ফজলুল হককে সংগঠন ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য

মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়। এ অবস্থায় ফজলুল হক পদত্যাগ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ‘প্রগ্রেসিভ পার্টি’ গঠন করেন।[৪২]

ফজলুল হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের পর থেকেই মূলত শামসুদ্দিন আহমেদ হক মন্ত্রীসভার সমালোচনা শুরু করেন। বিভিন্ন জেলায় হক বিরোধী প্রচারাভিযান এবং সমাবেশ করেন ফলে সাধারণ জনগণের মনে কৃষক প্রজাপার্টি সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পার্টির শক্তি দুর্বল হতে থাকে। এসময় মুসলিম লীগ মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে। কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকা বিশেষ করে *আজাদ*, *মুসলমান* এবং *দি স্টার অব ইন্ডিয়া* প্রভৃতি পত্রিকাকে দায়ী করে যে শামসুদ্দিন আহমেদকে হক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় উস্কানী দিচ্ছে।[৪৩] ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বেঙ্গল কৃষক প্রজা পার্টির বার্ষিক সাধারণ সভা রংপুরে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শামসুদ্দিন আহমেদের গ্রুপ হক মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থার ঘোষণা দেয়।[৪৪] শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৩৮ সালের ১লা আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক মিটিং-এ যোগদান করেন যেখানে ছয়শত মানুষ অংশগ্রহণ করে। মিটিং শেষে তাদের সামগ্রিক অবস্থার বিবরণ সম্বলিত একটি কপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন।[৪৫] এরপর তিনি কুষ্টিয়ার কৃষকদের নিয়ে একটি গোপন মিটিং করেন। সে প্রায়ই তাঁর সহযোগীদের মাঝে নিজেকে কমরেড হিসাবে উপস্থাপন করতো এবং এটা স্বীকৃত যে, তিনি কৃষকদের মাঝে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করত।[৪৬] এসময় শামসুদ্দিন আহমেদ সহ কৃষক প্রজাপার্টির অন্যান্য সদস্যরা বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব বিল পাশের জন্য ফজলুল হক মন্ত্রীসভার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ফলে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে বিলটি পাশ করেন কিন্তু হক মন্ত্রীসভা কোন ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে এই বিল ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে পাশের পর তৎকালীন পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যায়। হক মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ফলে কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থী পক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা উলে-খযোগ্যভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। হক মন্ত্রীসভা কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থী সদস্যদের অনুপস্থিতিতে প্রজাদের দাবীর পক্ষে বিল পাশ করে। এভাবেই বাঙালি কৃষকদের মাঝে ফজলুল হকের ভাবমূর্তি বেড়ে যায়।[৪৭] তবে শামসুদ্দিন আহমেদ এবং তার সহযোগীরা সব সময় জমিদার মহাজনদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাংলার কৃষকরা লবণাক্ততা বা বৃষ্টির অভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন করতে বার বার ব্যর্থ হয়ে জমিদার ও মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে বন্ধক গ্রহণ করত। শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষকদের এই ঋণ থেকে মুক্ত

করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফজলুল হক ছিলেন জ্ঞানী এবং চতুর রাজনীতিবিদ তাই তিনি শামসুদ্দিন আহমেদকে কোন কৃতিত্ব না দেওয়ার জন্য কৃষকদের কল্যাণে 'ঋণ বন্দোবস্ত আইন' ও 'বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন' সংশোধন করে সকল কৃতিত্বের দাবীদার হলেন।[৪৮] শামসুদ্দিন আহমেদ এবং তাঁর সহযোগীদের দাবীর ফলাফলে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে 'State aquisition এবং 'প্রজাস্বত্ব আইন' বাস্তবায়নের মাধ্যমে জমিদারী প্রথা এবং মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উভয়ই বাতিল করা হয়। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বাতিল করা হলেও ১৯৫৫ সালে তা কার্যকরী হয়। মন্ত্রীসভার প্রগতিবাদীরা এবং বেশির ভাগ কংগ্রেস সদস্য বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা বিলোপের চিন্তাও করেছিল। তবে একমাত্র কৃষক প্রজা পার্টির বামপন্থী সদস্যরা এটাকে তাদের শক্তিশালী দাবী হিসেবে উপস্থাপন করে কিন্তু এ ব্যাপারে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় সদস্যরা অনিচ্ছুক ছিল। মূলত এ দুই দলের অভিজাত শ্রেণি জমিদারী প্রথা টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিল।

১৯৩৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে মন্ত্রীসভায় ফজলুল হকের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এসময় ফজলুল হক সম্পূর্নরূপে ইউরোপিয় গ্রুপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে তাঁর অবস্থান দুর্বল হয়ে যায় । ফলে কৃষক প্রজা পার্টি থেকেও তাঁর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় হক মন্ত্রীসভা শক্তিশালী কিন্তু মন্ত্রীসভায় তাঁর অবস্থান হুমকির মুখে পড়ে। তিনি প্রজা সমিতির বামপন্থী পক্ষের সাথে আলোচনার আহবান করেন।[৪৯] ১৯৩৮ সালের ১৭ই নভেম্বর ফজলুল হক শামসুদ্দিন আহমেদ এবং তমিজউদ্দিন খানকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভূক্ত করে নতুন সদস্য ভিত্তিক মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৫০] এখানে শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষি ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তমিজউদ্দিন খান। এসময় কংগ্রেস এবং প্রজাপার্টির মূল সমর্থনকারীরা সর্বাত্মকভাবে তাদেরকে যোগদানে বাঁধা প্রদান করে। এ সময় হক মন্ত্রীসভা এবং ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে কঠিন অবস্থায় ছিলেন যা তাদের জন্য সুবিধাজনক হয়েছিল। ফজলুল হক এবং বিরোধী শক্তির মধ্যে দীর্ঘ সময় ব্যাপী আলোচনা থেকে ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে মনে হয় যে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় তার অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সমঝোতা করেছিলেন। ফজলুল হকের অবস্থান দৃঢ় করার প্রচেষ্টা তাঁর মন্ত্রীসভার ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ করে। ফজলুল হকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন নীতির মাধ্যমে মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখা। শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষক প্রজা পার্টির শর্তে এই মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বারোটি শর্ত মানার জন্য ফজলুল হক প্রতিজ্ঞা করেও ব্যর্থ হন। কারণ

ইউরোপিয় গ্রুপ ও মুসলিম লীগের ডানপন্থী গ্রুপের সদস্যরা আদৌ মন্ত্রিসভায় নতুন দুই জনকে মেনে নেননি। তারা বিশেষ করে শামসুদ্দিন আহমেদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ১৯৩০ সালেই তমিজউদ্দিন খান মুসলিম লীগের সদস্য হন। তিনি সরকারের প্রতি সমর্থন শুরু করেন।[৫১] অন্যদিকে শামসুদ্দিন আহমেদ সরকার বিরোধী ছিলেন এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাছাড়া তিনি তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব সব সময় বজায় রাখতেন। তাঁর প্রতি সরকারের শত্রু ভাবাপন্ন আচরণের জন্য তিনি ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। [৫২] এরপর তিনি কৃষক প্রজা সমিতির বামপন্থী নেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। এ সময় কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরা শামসুদ্দিন আহমেদকে তাদের দলে রাখতে চায় কারণ তারা আশা করেছিল যে তিনি যদি দলে থাকেন তাহলে তাদের দাবী দাওয়া আস্তে আস্তে পূরণ হবে। [৫৩] অন্যদিকে ফজলুল হকও শামসুদ্দিন আহমেদকে তাঁর মন্ত্রিসভায় চাচ্ছিলেন যাতে করে তমিজউদ্দিনের সমর্থনে এবং শামসুদ্দিন আহমেদের সহযোগিতায় তিনি ভোটে জয়ী হতে পারেন। [৫৪] আদর্শগতভাবে ফজলুল হক কখনোও কৃষক প্রজা পার্টি থেকে ভিন্ন হননি। এ জন্য এসময় তিনি শামসুদ্দিন আহমেদের সাথে আতাঁত করার চেষ্টা করেন। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে ফজলুল হক এবং শামসুদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন জেলায় কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যদের নিয়ে মিটিং করেন। প্রতিটি জায়গা থেকেই তারা কৃষক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন লাভ করেন। [৫৫] ১৯৪০ সালের মধ্যে কৃষি সংস্কার বিলের অধিকাংশ পাশ হয়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভূমি রাজস্ব নীতি, গ্রাম পূনর্গঠন, খাল নিষ্কাশন, নদী-পুকুর খনন, জল এবং স্থল যোগাযোগের উন্নয়ন, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা, শিক্ষানীতি ইত্যাদি উলে- খযোগ্য নীতি মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। এসময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। তাছাড়া তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এসকল পদক্ষেপের ফলে বাংলায় মুসলিম লীগের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।[৫৬]

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শামসুদ্দিন আহমেদ কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত প্রচারণায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরোপিত শর্ত বিরাজ করছিল। সরকার পাট উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কারণ পাটের দাম কম ছিল, অন্যদিকে যুদ্ধকালীন সময়ে শর্তানুযায়ী বার্মা থেকে চাল আমদানী পর্যাপ্ত না থাকায় ধান উৎপাদনে উৎসাহী করা

হয়। শামসুদ্দিন আহমেদ এই বিষয়টাকে মূল ইস্যু করে হক মন্ত্রীসভার সমালোচনা করেন। পাটের দাম কমার বিষয়টিকে যথাযথভাবে তদারকি না করার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। কারণ গৃহীত ব্যবস্থায় কাঁচা পাটের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ ছিল না। এর জন্য কৃষকরা তাদের পাটের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় তাদের দুর্ভোগ ছিল সীমাহীন।

শামসুদ্দিন আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, হক মন্ত্রীসভা পাট বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ অথবা জুট মিল এ্যাসোসিয়েশনের সাথে নিজের ভোট ও মন্ত্রীসভা পতনের ভয়ে চুক্তি করতে পারেনি। শামসুদ্দিন আহমেদ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়ে ১৯৪০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাট দিবস পালন করে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য সমালোচনা করে। এই সময় তিনি কংগ্রেসপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।[৫৭] বাংলায় বিশেষ করে হাওড়া জেলার বিভিন্ন জুট মিলে ক্রমাগত আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করে। এসময় তিনি কমিউনিস্ট কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৫৮] শামসুদ্দিন আহমেদের রাজনৈতিক জীবনে ১৯৪১ সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ সময় তিনি পূণর্বার হক মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির ফরওয়ার্ড ব-কের সদস্য, হিন্দু মহাসভা এবং তফসিলি হিন্দু সদস্যের সমন্বয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৫৯] এই মন্ত্রীসভা গঠনের ফলে ফজলুল হক জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় নেতাদের কাছে অসন্তুষ্টির পাত্র হন। ফলে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ফজলুল হককে মুসলীম লীগ থেকে পদত্যাগের জন্য বলা হয় কিন্তু এসময় তিনি এই বিরোধটাকে মিটিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতারা অসহযোগিতা এবং নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বরে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা থেকে মুসলিম লীগ সদস্যরা পদত্যাগ করলে তিনি 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' গঠন করেন এবং নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে সক্ষম হন। কিন্তু মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় নেতারা এবং ব্রিটিশ সরকার হক মন্ত্রীসভাকে প্রবলভাবে বিরোধিতা করেন। যার ফলস্বরূপ ১৯৪১ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করেন।[৬০] শামসুদ্দিন আহমেদ 'কৃষক প্রজা পার্টি'র প্রতিনিধি হিসেবে হক মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত হক মন্ত্রীসভা পতনের আগ পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভায় ছিলেন।[৬১] ১৯৪৫ সালের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির বেশির ভাগ সদস্যরা মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে শামসুদ্দিন আহমেদ 'কৃষক প্রজা পার্টি'থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের পর থেকে কৃষক প্রজা পার্টির রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকেছিল মূলত শামসুদ্দিন আহমেদের

প্রচেষ্টাসহ কংগ্রেসের বামপন্থী এবং কমিউনিস্টদের সহযোগিতায়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমির যে প্রস্তাব করে তাতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। একই সময়ে শামসুদ্দিন আহমেদ কংগ্রেসের বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার কোন উপায় ছিল না। এছাড়াও এ সময় তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৬৩] মুসলিম লীগে যোগদানের পর ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেন। [৬৫] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁকে বার্মার রাষ্ট্রদূত পদে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উক্ত মনোনয়ন বাতিল করে দেন। এরপর শামসুদ্দিন আহমেদ ঢাকায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। [৬৬] ১৯৬৩ সালে তিনি 'পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে শামসুদ্দিন আহমেদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ততোটা সক্রিয় ছিলেন না। তিনি ১৯৬৯ সালে ইন্তেকাল করেন। [৬৭]

শামসুদ্দিন আহমেদের তিন দশকের রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। ১৯২০ এর দশক থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি উদার এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি কোন জমিদার বা জোতদারের সন্তান ছিলেন না। সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হয়ে তিনি কৃষকদের পক্ষে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কৃষকপ্রজা আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে কৃষকদের দাবী দাওয়া পূরণের আন্দোলনে নিয়োজিত করেন। তিনি সবসময় বাংলার কৃষকদের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাছাড়া কৃষকদের সুযোগ সুবিধা আদায়ে খুবই আন্তরিক ছিলেন। এজন্য তিনি ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনেও নিজেকে সংযুক্ত করেন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা এবং কংগ্রেসের বামপন্থীদের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে প্রায়ই তাঁকে মুসলিম বিরোধী হিসেবে সমালোচনার স্বীকার হতে হতো। শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন কিন্তু তখনও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না । সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি কৃষকদের স্বার্থে যতটুকু ভূমিকা রেখেছিলেন তা আজীবন স্মরণীয়।

প্রান্তটীকা

১। Humaira Momen, *A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937,* Dacca, 1972, P. 89

২। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২১১

৩। Humaira Momen, *Ibid*, P.89

৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৫। Humaira Momen, *Ibid*, P. 89, The Daily Star, Dhaka, November, 1995

৬। চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.২৪৬

৭। Rana Razzaque "*Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought 1918-1947*," P.hd Thesis,Unpublished, Dhaka University, 1997, P.205.

৮। Humaira Momen, *Ibid*, P. 89-90

৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫ পৃ. ২১১

১০। Rana Razzaque, *Ibid*, P.206

১১। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৫

১২। Rana Razzaque , *Ibid*, P. 206

১৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

১৪। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০১-২০২

১৫। Rana Razzaque, *Ibid*, P.207

১৬। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*,বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮ পৃ. ১০৯-১১০

১৭। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, (দশম সংস্করণ,পুনর্মুদ্রন) ২০১০ , পৃ. ৩১-৩৬, ৪১, ৪৫

১৮। Rana Razzaque, *Ibid*, P.209, Humaira Momen, *Ibid*, P. 89

১৯। Rana Razzaque, *Ibid*, P. 212

২০। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

২১। টাটা কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর গুলোর অন্যতম একটি বহুজাতিক কোম্পানী, যেটি ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ভারতের মুম্বাইয়ে অবস্থিত। উইকিপিডিয়া, *(https://en.wikipedia.org/wiki/**Tata_Group**)*

২২। *The Daily Star*, Dhaka, 3 November,1995, P. 5

২৩। Rangalal Sen, *Political Ethics in Bangladesh*, Dhaka, 1986, P.38

২৪। বাঘা যতীন (১৮৭৯–১৯১৫) বিপ-বী ও ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী তাঁর প্রকৃত নাম যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। তার মধ্যে আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। মূলত বঙ্গভেদ আন্দোলন পরবর্তী বিপ-বী রাজনীতিতে বাঘা যতীনের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। তিনি বিপ-বী সংগঠন ‘অনুশীলন সমিতি’র সাথে আমৃত্যু সংশি-ষ্ট ছিলেন। তিনি কোন অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই খালি হাতে বাঘ হত্যা করার পর তাঁকে বাঘা যতীন নামে অভিহিত করা হয়। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা পিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৮-৪৯৯)

২৫। Rana Razzaque, *Ibid*, P. 213

২৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

২৭। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

২৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

২৯। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৬৬

৩০। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

৩১। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২০৬

৩২। Kamruddin Ahmed, *A Socio-Political History of Bengal*, Dhaka, 1967, p. 33

৩৩। Humaira Momen, *Ibid*, P. 89-90

৩৪। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৩৫। Humaira Momen, *Ibid*, P. 66-90

৩৬। সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

৩৭। এনায়েতুর রহিম, *বাংলার স্ব-শাসন (১৯৩৭–১৯৪৩)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২৩, ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

৩৮। Rana Razzaque, *Ibid*, P.215

৩৯। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৪০। ড. মুহাম্মদ আবদুল-াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

৪১। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৫

কৃষক নামের পত্রিকাটি ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দৈনিক হিসেবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। *কৃষক* পত্রিকাটি প্রজা সমিতির মুখপত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। (Rana Razzaque, *Ibid*, P.105)

৪২। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

৪৩। *আজাদ* পত্রিকা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। এটি মূলত বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধার কথা এবং দাবী দাওয়া সম্পর্কে প্রকাশনা ছাপানোর কাজ করত। (Rana Razzaque, *Ibid*, P.110)

দি স্টার অব ইন্ডিয়া ১৯৩২ সালে বেঙ্গলী পত্রিকাটি *দি স্টার অব ইন্ডিয়া* নামে প্রকাশ করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। যাত্রার শুরু থেকেই পত্রিকাটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২০)

৪৪। এনায়েতুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩

৪৫। Rana Razzaque, *Ibid*, P.221-222

৪৬। *Ibid*, P.222

৪৭। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৭, ১৭৯-১৮০

৪৮। Rana Razzaque, *Ibid*, P.223-224

৪৯। Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947*, New Delhi, 1976, P.118

৫০। Rana Razzaque, *Ibid*, P.225

৫১। *Ibid*, P.225-226

৫২। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৫-১৮৭

৫৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৮৮

৫৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

৫৫। L/PSJ/5/142. Confidential: Report for the second half of December 1939, P.227 জাতীয় আরকাইভস,আগারগাঁও,ঢাকা

৫৬। Shila Sen, *Ibid*, P. 103-108

৫৭। Enayetur Rahim , *Ibid*, P.187-188

৫৮। The Indian Annual Register, Vol 1, January- June, Calcutta 1937 উদ্ধৃত Rana Razzaque, *Ibid*, P-228

৫৯। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৫-২২৬

৬০। Shila Sen, *Ibid*, P.133-134

৬১। Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka,1987, P. 141-142

৬২। Harun-or-Rashid, *Ibid*, P. 211-212

৬৩। *Ibid*, P. 243

৬৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল- াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

৬৫। Harun-or-Rashid, *Ibid*, P.243

৬৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল- াহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

৬৭। Humaira Momen, *Ibid*, P.90

উপসংহার

পূর্ববাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমায় (১৯০৬-১৯৪৭) সাল গুর“ত্বপূর্ণ সময়কাল। বিশেষ করে গবেষণার এই সময়কালে পূর্ববাংলা ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশেষ ক্ষেত্র । ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রদত্ত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ আলোচ্য সময়কালে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ব্যতিক্রমী ও গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণা কর্মটিতে বিংশ শতাব্দীর বিশেষ করে ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বিখ্যাত ও উলে- খযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূলত যারা কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন। অভিসন্দর্ভের সময়কালানুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণের সময় তাঁদের প্রাথমিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের বেশির ভাগই বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে তাঁদের সক্রিয় আত্মপ্রকাশ ঘটে। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য আঞ্চলিক নেতাগণ প্রায় প্রত্যেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন(১৯০৫), মুসলিম লীগ(১৯০৬) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তবে আবুল মনসুর আহমদ, হাতেম আলী খান, তমিজউদ্দিন খান সরাসরি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেনি তবে উল্লিখিত সকল আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে’র প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নির্বাচিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ সরাসরি যোগদান না করলেও প্রত্যেক নেতায় মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। বলা যায় ১৯০৬-১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় প্রদত্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রকৃতঅর্থে রাজনীতিতে প্রবেশ এবং এ রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় প্রত্যেকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে নিজের স্বতন্ত্র ভূমিকার মাধ্যমে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৪-

১৯৬৮) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে। কৃষক প্রজা পার্টির অন্যতম নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক(১৮৭৩-১৯৬২) বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩) রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ রদের সমর্থক হয়ে উঠেন। রাজনৈতিক দলের অনুসারীর পর্যায়ে প্রদত্ত নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসসহ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হন। বলতে গেলে তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস অনুসারী থেকেছেন আবার স্বীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। আবার কখনও কখনও রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদেরকে একাধিক রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। মওলানা আকরম খাঁ জীবনের শুরুতে কংগ্রেসের অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯১৪ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু ১৯১৫ সালে স্যার সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি কেন্দ্রিয় মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) কংগ্রেসে যোগদান করলেও জাতীয় প্রয়োজনে তিনি ক্ষণিকের জন্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মৌলবী তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩) মুসলিম লীগের সদস্য গ্রহণের মাধ্যমে জীবনের প্রথম পর্যায়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। তাছাড়া মুসলিম লীগের দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বামপন্থী কৃষক নেতা শামসুদ্দিন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯) রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কংগ্রেস আদর্শের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে বংগীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কৃষকনেতা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত আবুল মনসুর আহমদ(১৮৯৮-১৯৭৯) জীবনের প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেসে বিশ্বাসী হলেও রাজনৈতিক জীবনের বিকশিত পর্যায়ে মুসলিম লীগের সমর্থক হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হয়ে ভূমিকা পালন করেন। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) মুসলিম লীগের রাজনীতিতে কোন আস্থা ছিল না কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতিও তাকে আকর্ষণ করেনি। রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন তবে

পরবর্তীতে রাজনৈতিক মতদ্বৈততার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গভঙ্গ রাজনীতি পরবর্তী সক্রিয় নেতা হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭) কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন নেতা ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী চরমপন্থী রাজনীতির অঙ্গ সংগঠন 'অনুশীলন' সমিতিরও সদস্য ছিলেন।

সময়ের দাবী তথা রাজনৈতিক প্রয়োজনে পূর্ববাংলার রাজনীতির উলে- খযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ কৃষক-প্রজা শ্রেণির সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের অনুসারী হলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী থেকে ভূমিকা রেখেছেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে পূর্ববাংলা অঞ্চলের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ছিল। সমগ্র বাংলা অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব বাংলায় এই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। পূর্ববাংলার সকল আঞ্চলিক নেতা এই আন্দোলনে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। খেলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে (১৯১৯-১৯২২) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠা করে এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মওলানা আকরম খাঁ যিনি পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় অংশ পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ছিল। পূর্ববাংলা অঞ্চলে খেলাফত আন্দোলন বেগবান করার ক্ষেত্রে ফজলুল হক অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। ১৯১৯ সালের ২৩ ও ২৪ নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯১৯ সালে বাংলায় যে খেলাফত কমিটি গঠিত হয় সেখানে মওলানা মনির-জ্জামান ইসলামাবাদী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাসের (১৮৭০-১৯২৫) রাজনীতি দ্বারা। খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের সাথে সাথে ১৯২১ সালে সারা বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুর- হলে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। পূর্ববাংলা অঞ্চলের সফল একজন আঞ্চলিক নেতা তমিজউদ্দিন খান যিনি অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করে ফরিদপুর অঞ্চলের অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে

নিয়োজিত করেন। বামপন্থী কৃষক নেতা শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগাদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন। তিনি বঙ্গীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের অন্যতম কৃষক নেতা আবুল মনসুর আহমদ খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা ভাসানীর অনুসারী হিসেবে খ্যাত হাতেম আলী খান খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন বলে জানা যায়।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী নেতা চিত্তরঞ্জন দাস বাংলা তথা পূর্ববাংলা অঞ্চলের মানুষের কাছে একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত রাজনীতির পেক্ষাপটে তিনি ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল গঠন করলে বাংলা অঞ্চলের অধিকাংশ আঞ্চলিক নেতা এই দলের সমর্থক হয়ে উঠেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর নিজ এলাকা ময়মনসিংহে প্রচারণায় ভূমিকা পালন করেন। দেশবন্ধু ও সুভাষ চন্দ্র বসুর তেজোস্বিতায় অনুপ্রাণীত হয়ে মওলানা ভাসানী বাংলায় বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে গ্রাম-গ্রামান্তরে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের পক্ষে যুগপৎ কাজ করতে থাকেন। তাছাড়া আলোচ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মওলানা মনির্‌জ্জামান ইসলামাবাদী ও তমিজউদ্দিন খান স্বরাজ্য দলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। আবার দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) বা বাংলা চুক্তি সম্পাদন করেন যেখানে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

"পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (১৯০৬-১৯৪৭)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যারা পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে কেন্দ্রিয় পর্যায়ের নেতায় পরিণত হন। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আঞ্চলিক পর্যায়ের রাজনীতিতে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তৎকালীন সময়ে রাজনীতি ছিল অভিজাত ধনী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে যার কারণে আঞ্চলিক রাজনীতির কেন্দ্রে থাকত কৃষক প্রজার পক্ষে সংগ্রামকারী নেতৃবৃন্দ। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি বড় অংশ প্রজা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে কৃষক প্রজা সমিতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা অথবা সক্রিয় সদস্য হিসেবে

ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও ১৯২৯ সালে স্যার আব্দুর রহিমকে সভাপতি করে যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' (১৯২৯) গঠিত হয় সেখানে এ সকল আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের ভূমিকা ছিল। মওলানা আকরম খাঁ জীবনের শুর‍ু থেকে কৃষক প্রজার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে জামালপুর জেলার কামারিয়ার চরে যে কৃষক সম্মেলন হয় সেখানে তিনি প্রজার পক্ষে বক্তৃতা করেন। তাছাড়া তিনি 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র (১৯২৯) সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রজা আন্দোলনে আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফল নেতা ছিলেন ফজলুল হক। জামালপুরের কামারিয়ার চরের কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। আজীবন তিনি কৃষক প্রজার পক্ষে কাজ করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনসহ পরবর্তী সকল নির্বাচনে ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠিত 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' সফল প্রতিনিধিত্ব করে। কৃষক প্রজা কর্মী হিসেবে মওলানা মনির‍ুজ্জামান আজীবন সক্রিয় ছিলেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলের মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কৃষক প্রজার নেতা হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে কৃষক সমাজকে জমিদারের অত্যাচারের বির‍ুদ্ধে সোচ্চার একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেন। ১৯২৯ সালে গঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন তমিজউদ্দিন খান। তাছাড়া বামপন্থী কৃষক নেতা শামসুদ্দিন আহমেদও এই সমিতির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পান। আঞ্চলিক নেতা আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয় প্রজা সম্মিলনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির একজন মাঠ পর্যায়ের নেতা হয়েও সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে পেরেছিলেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হাতেম আলী খান পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার কৃষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে কৃষকদের দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। বলতে গেলে অভিসন্দর্ভের প্রায় প্রত্যেক নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক পর্যায়ে কৃষক প্রজা তথা সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা থেকেই রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, আলোচ্য নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে আঞ্চলিক প্রজা কর্মী বা কৃষকনেতা হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। তাই অভিসন্দর্ভে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে প্রজা আন্দোলনকে মূল প-াটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, কেননা

পূর্ববাংলার রাজনীতির বিস্তৃত পরিসরে উলে- খযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ যাচাই করা খুবই দূরুহ একটি কাজ। পূর্ববাংলার রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে টিকে থাকার সংগ্রামের মাধ্যমে। তাই এমন আট জন নেতৃবৃন্দকে নির্বাচন করা হয়েছে যারা জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় প্রজা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বলা যায় তাঁদের অবদান ছাড়া পূর্ববাংলায় প্রজা আন্দোলন বা কৃষক আন্দোলন সাফল্যের মুখ হয়ত দেখতে পেতো না।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের উলে- খ্য সময়কালে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রদত্ত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ পোষণ করেছেন। তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পর্যায়ে পূর্ববাংলার উল্লেখিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ কিছুটা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ যেমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্যান ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে প্যান ইসলামবাদে বিশ্বাসী হলেও মওলানা মনির ুজ্জামান ইসলামাবাদী 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান দাবীর বিরোধী ছিলেন। মওলানা ভাসানী লাহোর প্রস্তাব সমর্থনের সাথে সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রদান করেন। আবার অসাম্প্রদায়িক নেতা শামসুদ্দিন আহমেদও পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে কাজ করেন। কৃষক নেতা আবুল মনসুর আহমদ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে আস্তে আস্তে পাকিস্তানবাদী হয়ে পড়েন। অপর আঞ্চলিক নেতা হাতেম আলী খান পাকিস্তান আন্দোলনে গুর ুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামোর আলোকে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালের সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে আলোচ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা মূল্যায়নের সাথে সাথে তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তুতে শীর্ষস্থানীয় আটজন নেতৃবৃন্দকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাদের প্রায় প্রত্যেকে বিশের দশকের প্রারম্ভে রাজনৈতিক অঙ্গনে আগমন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যেকেরই সংশ্লিষ্টতা ছিল। অভিসন্দর্ভের নির্ধারিত সময়কালে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এমন অনেক

আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ আছে যারা পূর্ব বাংলার রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কয়েকজন সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্যায়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর (১৮৭১-১৯১৫) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯০৩-০৪ সালে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার ওপর মতামত দিতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গভঙ্গের পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে একত্রিত করার প্রধান ভূমিকা তিনিই পালন করেন। তাছাড়া নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বরিশাল অঞ্চল ছিল বিশেষ সক্রিয় এলাকা। এ অঞ্চলে অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন (১৮৬০-১৯৪১) আঞ্চলিক নেতৃত্বে ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী অন্যতম নেতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। তিনিই ছিলেন আধুনিক বরিশালের নির্মাতা। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমবায় আন্দোলনের অন্যতম দিশারী। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হওয়ার সময় তিনি বরিশালের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৯ সালে সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচন আইনের আওতায় ১৯১০ সালে ঢাকা বিভাগের মুসলমান এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল (১৮২৭-১৯১৭) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালে 'বেঙ্গল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং একই সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। কুমিল্লা অঞ্চলে আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬) প্রথম সারির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তিনি কুমিল্লা জেলা খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৪

সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের টিকেটে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া কৃষক আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন।

বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে সৈয়দ নওশের আলীর (১৮৯০-১৯৭২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্র অঞ্চলের কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আজীবন কৃষক রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৮ সালে সৈয়দ নওশের আলী যশোর জেলা বোর্ডের সভাপতি হন এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে যশোর অঞ্চলে বিজয়ী হন। ১৯৪৬ সালে শরৎ বসুর অখণ্ড বাংলার পক্ষেও তিনি কাজ করেছিলেন।

উপরে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বাংলার রাজনীতিতে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), নবাব হাবিবুল্লাহ (১৮৯৫-১৯৫৮), স্যার আবদুল করিম গজনবী (১৮৭২-১৯৩৯), মৌলবী মুজিবুর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০), সৈয়দ বদরুদ্দোজ্জা (১৮৯৮-১৯৭৪), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), আব্দুল হালিম গজনভী (১৮৭৬-১৯৫৩), রাজিব উদ্‌দীন তরফদার (১৮৯১-১৯৫৯), স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), পীর বাদশা মিয়া (১৮৮৪-১৯৫৯), আলিমুজ্জামান চৌধুরী (১৮৬৭-১৯৩৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১),মৌলবী আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬), খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৬–১৯৪৬), আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০-১৯৩৫), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), মওলানা আহমদ আলী (১৮৮১-১৯৭১) প্রমুখ ছিল উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ। যারা প্রতেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য আন্দোলন, অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ পাকিস্তান আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক ভূমিকা রেখেছেন।

১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলা অঞ্চলে অসংখ্য আঞ্চলিক নেতা সম্পর্কে জানা যায় যারা পূর্ববাংলার রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় ছিলেন। তবে ইচ্ছা থাকলেও গবেষণা অভিসন্দর্ভে সকলকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। মূলত শীর্ষ স্থানীয় আটজন নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক জীবন ও তাঁদের অবদান বিষদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক তথ্য সূত্র ঃ অপ্রকাশিত

সরকারী নথিপত্র (বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত) ঃ

A Socio-Political History Government of Bangladesh , Confidential Appointment Files, 1932

Bengal Municipal Act-1932

The Bengal Money- Lender's rules-1940

East Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1956, Vol. XIV, Dated 13th August, 1956, P.VI.

বঙ্গদেশের চাষী-খাতক বিষয়ক আইন-১৯৩৫

Government of East Bengal Legislative Assembly Debates, Dacca : Government of East Bengal Press,1948-52,Vols.1-8.

সংবাদপত্র

দৈনিক পত্রিকা ঃ বাংলা

দৈনিক আজাদ (কলকাতা ও ঢাকা, ১৯৪৭, ১৯৫৪, ১৯৫৯, ১৯৬৮, ১৯৮৯)

দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা, ১৯৬৮,১৯৬৯, ১৯৭৬,২০১০,২০১৪,২০১৬)

দৈনিক পাকিস্তান (ঢাকা, ১৯৬৩,১৯৭১)

দৈনিক সংগ্রাম (ঢাকা, ২০১৪)

দৈনিক আমার দেশ (ঢাকা, ২০১০)

দৈনিক যুগান্তর (ঢাকা, ২০১৫)

দৈনিক পত্রিকা ঃ ইংরেজি

The Morning News (Dhaka, 1963)

The Pakistan Observer (Pakistan, 1963)

The Daily Star (Dhaka, 1995)

The Daily Observer (Dhaka, 2016)

গবেষণা পত্রিকা

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

সাময়িকী

এ.কে.এম ইদ্রিস আলী	এ. কে. ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি-ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৯৮
Ujjal Kanti Das	The Bengal Pact of 1923 and Its Reactions...Bengal Past and Present, Vol. XCIX, Part,1 January-June, 1980

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার , জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি) , ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫,টাঙ্গাইল ।

সাক্ষাৎকার , জুলফিকার খান (হাতেম আলী খানের ভাতিজা), ০৫ এপ্রিল, ২০১৫, টাঙ্গাইল ।

সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) , ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, টাঙ্গাইল ।

সাক্ষাৎকার, ইরফানুল বারী, (মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক), ১৫ মে,২০১৫, টাঙ্গাইল ।

অপ্রকাশিত থিসিস

Rana Razzaque , *Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947*), Unpublished, Ph.D thesis, University of Dhaka, 1997

ইমতিয়াজ আহমেদ, বাংলার রাজনীতিতে উদারপন্থী মুসলিম রাজনৈতিকদের ভূমিকা (১৯০৫-১৯২৫) , অপ্রকাশিত এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০০।

মোহাম্মদ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী : বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৫৩-১৯৬৬, পিএইচ.ডি.থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, *বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনির ‍ জ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান: ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা- একটি তুলনামূলক বিশে- ষণ*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

ইয়াসমিন আহমেদ, *কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২০১১।

মোঃ চেঙ্গীশ খান, *আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য, সমাজ, জীবন ও রাজনীতি*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , ২০১৩

গ্রন্থাবলী ঃ ইংরেজি

Abul Monsur Ahmad — End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution (Dhaka,1975)

Abu Jafar — Maulana Akram Khan: A Versatile Genius, Dhaka, 1984

A.S.M Abdur Rab, — A.K. Fazlul Haq ; Life and Achievements,(Lahore: A Hameed Khan Feroz & Sons Ltd, 1966)

Abul Hashim — *In Retrospection, (Dacca, Subarn, 1974).*

Aminur Rahim — *Politics and National Formation in Bangladesh,* (Dhaka, UPL, 1997)

Bazlur Rahman Khan — *Politics in Bengal (1927-1936),* Asiatic Society of Bangladesh, (Dhaka, 198)

Chandiprasad Sarker	*The Bengali Muslims: A Study in Their Politicization (1912-1929),* (Calcutta, 1991)
Enayetur Rahim,	*Provincial Autonomy in Bengal : 1937-1947 (Rajshahi, N.P.D)*
Harun-or-Rashid	*The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947, Asiatic Society of Bangladesh,(Dhaka,1987)*
Hasan Zaheer	*The Separation of East Pakistan, the rise and realization of Bengali Muslim Nationalism*, (Dacca, UPL,2001).
Humaira Momen	Muslim Politics in Bengal : *A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937, Dacca, 1972.*
Humayun Kabir	*Muslim Politics 1906-1947,* (Calcutta, 1969).
Kamruddin Ahmed	*A Socio-Political History of Bengal;(Dhaka, 1967)*
Kamruddin Ahmed	*A Social -Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh,(* Dhaka, 1975)
Mohammad Siraj Mannan	*The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1946) (Dhaka, 1987)*
Mustafa Nurul Islam	Bengal Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press 1901-1930,(Dhaka, 1973).
Rangalal Sen	*Political Ethics in Bangladesh,(Dhaka, 1986)*
Rounaq Jahan	*Pakistan: Failure in National Integration,* (Dhaka,UPL, 2001)
S.A. Siddiqui	*The Forgotten History 1857-1947,* (Chittagong, November, 1974).
Shila Sen	*Muslim Politics in Bengal 1937-1947,(New Delhi, 1976)*
Talukder Maniruzzaman	*The Politics of Development: The Case of Pakistan* (1947-1958), (Dacca,Green Book House, 1971)

Tamijuddin Khan	The Test of Time : My Life and Days, (Dhaka,1993)

গ্রন্থাবলী ঃ বাংলা

অমলেশ ত্রিপাঠী	*ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (অনুবাদ নির্মল দত্ত),(* আনন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯১, কলিকাতা).
অতুল চন্দ্র রায়	*আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস,* , (কলিকাতা,১৯৮৯).
.... ,	ভারতের ইতিহাস, (কলকাতা, ২০০০).
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়	
অলি আহাদ	জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল) জুলাই, ২০০২).
অধ্যাপক সমর কুমার মলি- ক	*আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৭-১৯৪৭)*,(কলিকাতা, ১৯৯৮).
আবুল মনসুর আহমদ	*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দশম সংস্করণ,পুনর্মুদ্রন ২০১০).
....	আত্মকথা (আত্মজীবনী), ঢাকা, ১৯৭৮।
....	শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, জুন ১৯৯৯)
আবুল কালাম শামসুদ্দিন	*অতীত দিনের স্মৃতি* (*Reminiscence), (*ঢাকা, ১৯৮৫)
আবু আল সাঈদ	*মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু ১২০৬-১৯৭৫*,(আগামী প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৯৯).
....	সাতচল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৯৯).
আবুল হাশিম	আমার জীবন ও বিভাগপূর্ণ বাংলাদেশের রাজনীতি, (ঢাকা, ১৯৮৭)
আব্দুল হক	বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, (চট্টগ্রাম: বইঘর, শ্রাবণ, ১৩৮০)
আহমেদ কামাল	কালের কল্লোল, বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

আবদুল হাই শিকদার — *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, (ঢাকা , ২০০২).

আমজাদ হোসেন — *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*,(পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা , ২০১৩).

.... — *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, (ঢাকা, ১৯৯৬).

আশফাক হোসেন — *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, (জে কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ২০০৪).

আতাউর রহমান খান — স্বৈরাচারের দশ বছর (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০).

ইমরান মাহফুজ (সম্পাদিত) — *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, কালের ধ্বনি প্রকাশনী, (ঢাকা, ২০১৫).

এম এ রহিম — বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬–১৭৫৭) ,(ঢাকা,১৯৮২).

এম. আর. আখতার মুকুল — পাকিস্তানের চব্বিশ বছরঃ ভাসানী মুজিবের রাজনীতি, (ঢাকাঃ সাগর পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯৬)

.... — ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, (ঢাকাঃ শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯).

এম আর চৌধুরী — *আবশ্যকীয় শব্দ পরিচয়* , (ঢাকা, ২০১২).

এ টি এম আতিকুর রহমান — *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫).

এনায়েতুর রহিম — বাংলায় স্ব-শাসন, ১৯৩৭-৪৩, অনুবাদঃ জাকারিয়া সিরাজী (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ২০০১).

ওয়াকিল আহমদ — *বাংলার মুসলিম সভা-সমিতির ইতিহাস (১৮৫৫-১৯৪৭)*, (ঢাকা,১৯৯৩).

.... — উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, (১ম ও ২য় খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।

কামরুদ্দীন আহমদ — *বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ–দ্বিতীয় খন্ড*,(ঢাকা,১৩৮২ বঙ্গাব্দ)

কে এম রইছউদ্দিন খান — *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা* ,(১৯৯৭, ঢাকা).

খান মাহবুব — *টাঙ্গাইলের জেলা পরিচিত*, (ঢাকা, ২০০৯).

খোকা রায় — সংগ্রামের তিন দশক, (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬).

খোদেজা খাতুন	মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, (ঢাকা: সুবর্ণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)
খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস	ভাসানী যখন ইউরোপে, (ঢাকা: মুক্তধারা, নভেম্বর ১৯৭৮).
গোলাম মুস্তফা	*বঙ্গভঙ্গ ও তৎকাল*, (উৎস প্রকাশনী, ২০১০, ঢাকা).
জয়া চ্যাটার্জী	বাংলা ভাগ হল, অনুবাদ : আবু জাফর, (ঢাকা: UPL, ২০০২).
জুলফিকার হায়দার	*সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা কৃষকনেতা হাতেম আলী খান*, (প্রাঙ্গণ প্রকাশন, ময়মনসিংহ ২০০৩).
জ্ঞান চক্রবর্তী	ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬৮).
জীবনী গ্রন্থমালা	তমিজউদ্দিন খান ,(বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭).
ড. মুহম্মদ আবদুল-াহ	নওয়াব সলিমুল-াহ জীবন ও কর্ম, (ঢাকা, ১৯৮৬).
ড. মুহম্মদ আবদুল-াহ	*রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,(ঢাকা, ১৯৯৫).
ড. মুহম্মদ আবদুল-াহ	*বাংলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬).
ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন	*বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*,(বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮).
ড. সুনীল কান্তি দে	*আনজুমানে ওলামায়ে বাংলা ও মুসলিম সমাজ*, (কলিকাতা, ১৯৯২).
ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম,	*বাংলাদেশের ইতিহাস*, (নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা, ২০০৫).
ড. আবদুল মমিন চৌধুরী,	
ড. এ. বি. এম মাহমুদ,	
ড. সিরাজুল ইসলাম	
ড. মোঃ শাহজাহান	*বাংলার ইতিহাস (১৭৬৫-১৯৪৭), আধুনিক যুগ*,(চয়নিকা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৫).
ড. কিরন চন্দ্র রায়,	*আধুনিক ইউরোপ*, (কলিকাতা, ১৯৭৯).
ড. আজিজুর রহমান মল্লিক	বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২).

ড. ফজলুর রহমান — *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব*, (১৯৪৭-৭১), (ঢাকা), জুন, ১৯৯৮।

ড. মোহাম্মদ হান্নান — *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (*প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব*), (ঢাকা: গ্রন্থলোক প্রকাশন), ১৯৯১

তমিজউদ্দিন খান — *(The Test of Time: My Life and Days) কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি, অনুবাদ রাজিয়া খান*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩).

তাবেদার রসুল বকুল — *ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল: জীবন ও কর্ম*, (ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩).

তারিক আলী — পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ জান্তা না জনতা, অনুবাদ: মাহফুজউল্লাহ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৭).

দরজি আব্দুল ওয়াহাব — *ময়মনসিংহের চরিতাভিধান* , (ময়মনসিংহ, ১৯৮৯).

নুরুল আমিন — আবুল মনসুর আহমদ, *জীবনী গ্রন্থমালা*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ,১৯৮৭).

নুরুল ইসলাম — *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর*, (ঢাকা:জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী), ১৯৮৮।

বদরুদ্দীন উমর — *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশেল কৃষক*, (মওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, ১৯৭৩).

.... — *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (দ্বিতীয় খণ্ড) (ঢাকা:জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন), জানুয়ারী, ১৯৯৬

.... — *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, (ঢাকা: শ্রাবণ), ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।

.... — *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*,(ঢাকা, ১৯৮০).

বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পাদিত) — স্মারক গ্রন্থ *কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*,(অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩).

বশীর আল হেলাল — *বাংলা একাডেমীর ইতিহাস*,(বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬).

.... — *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), ১৯৮৫।

মওলানা ভাসানী — *মাও সে তুঙ এর দেশে*,(ঢাকা, ১৯৭২).

মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পাদিত) — স্মারক গ্রন্থ, *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০১৪

মাহমুদ কামাল — *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, (ঢাকা, ২০০৩).

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক — *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭৫৭-১৯৪৭*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩).

মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন — *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*,(ঢাকা, ১৯৬৬).

মুহম্মদ আবদুল-াহ — *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, (ঢাকা, ১৯৮০).

বাংলাদেশের দশ দিশারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর — *মওলানা আকরম খাঁ*, জীবনী গ্রন্থমালা, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭).

মুনতাসীর মামুন — *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া*,(মওলা ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা , ১৯৯৯).

.... — *উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ, ১৮৫৭-১৯০৫*, (ঢাকা:এম, আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

.... — *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা, (ঢাকা:সময়প্রকাশন),* ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।

.... — *বঙ্গভঙ্গ, (*ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),১৯৮২।

মুস্তফা নূর উল ইসলাম — সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭।

.... — *আবহমান বাংলা*, (ঢাকা: অন্য প্রকাশ), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান — *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল*,(ঢাকা, ১৯৮৮).

মুহম্মদ আবদুর রহিম — *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস: ১৭৫৭-১৯৪৭*, (ঢাকা, ১৯৭৬).

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী, প্রথম খন্ড*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪).

মোহাম্মদ ওয়ালী উল-াহ, — *যুগ বিচিত্রা*, (ঢাকা,১৯৬৭).

মোশাররফ হোসেন খান — *মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২).

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান *কিংবদন্তীর শেরে বাংলা*, (ঢাকা,২০১০).

মিজানুর রহমান *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা,(* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮).

রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত) *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), (*বাংলা একাডেমী, ঢাকা).

.... *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, *৩য় খন্ড*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১).

রফিকুল ইসলাম *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (ঢাকা, ১৯৯৬).

শওকত আরা হোসেন *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, ১৯২১-১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

শামসুজ্জামান খান *মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী*, (ঢাকা ,২০০৬).

শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত *মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা , ১৯৭৮).

শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শ্রী অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত) *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (সংযোজন খন্ড)*, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮১)।

সরদার ফজলুল করিম ও কিরণ শংকর সেনগুপ্ত চল্লিশের দশকের ঢাকা, (ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, মে, ২০০১)।

সাইফুল ইসলাম স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, (ঢাকাঃ বাংলা বাজার, ১৯৮৭)

.... আসাম ও মওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা-বাঙালখেদা, (ঢাকাঃ সময় প্রকাশ, ২০০২)

সুবল চন্দ্র মিত্র (সংকলিত) সরলা বাঙলা অভিধান, (কলকাতা, ১৯৭১).

সুমিত সরকার *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)*, (কলকাতা, ২০০৪).

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক,*(ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭).

.... *মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, (ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা ,২০০৩).

.... *বাংলাদেশ গড়লেন যারা*, (ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২).

.... *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*,(ঢাকা, ২০০৩).

সৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত *মওলানা ইসলামাবাদী*,(চট্টগ্রাম, ১৯৮০).

সৈয়দ আবুল মকসুদ *মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, (ঢাকা ,১৯৯৪).

সৈয়দ মকদুস আলী *রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২).

হোসেন উদ্দীন হোসেন বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭) (ঢাকা, ১৯৯৩).

হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদিত) , মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ), জানুয়ারি, ১৯৮৮ ।